

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন





ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০

সম্পাদনা

সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

২০০

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

২০০

সম্পাদনা

সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়



কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

Frankenstein 200

Selected stories, articles, interviews on Frankenstein & Reanimation
Edited by: Santu Bag & Sandipan Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর, ২০১৮
প্রচ্ছদ	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য ও সন্তু বাগ
বর্ণবিন্যাস	কল্পবিশ্ব
পরিবেশক	অরণ্যমন প্রকাশনী, ৩/সি যদুনাথ দে লেন, কলকাতা ১২ আলাপন: ৭২৭৮৯৯২৫৪০
ISBN	978-81-938947-2-9
প্রকাশক	কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস ৩৭২/৩ দমদম রোড, সুরের মাঠ, কলকাতা ৭০০০৭৪ ইমেল: kalpabiswa.publications@gmail.com ওয়েবসাইট: kalpabiswabooks.com আলাপন: ৯০৫১৩৭০১১৬
মূল্য	১৫০ টাকা

উৎসর্গ

প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের রচয়িতা

মেরি ওলস্টোনক্রাফট শেলির

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

"Did I request thee, Maker, from my clay
To mould me man? Did I solicit thee
From darkness to promote me?"

—Paradise Lost (Book X), John Milton

রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে উড়ে চলেছে ঈগল। পরের দিন আবার ফিরে আসতে হবে পুনরুজ্জীবিত বিদ্রোহীর যকৃৎ খুবলে খুবলে খাওয়ার জন্য। দেবতাদের কুক্ষিগত আগুন চুরি করার শাস্তি বড়ো কম না! এই আগুনই তো ছিল স্বর্গ আর মর্ত্যের ক্ষমতার সীমানা, জ্ঞান আর অজ্ঞানের প্রান্তরেখা... সময় সরণি বেয়ে মহাকাব্যের যুগের গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে আবার একটা আলোর যুগ। ফায়ার প্লেসে জ্বলছে সেই আদি বিদ্রোহী প্রমিথিউসের চুরি করা আগুন। এক অষ্টাদশীর চেতনায় তা জাগিয়ে তুলছে স্ফুলিঙ্গ, যেন জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের অস্তিত্বের আদি প্রশ্নগুলো এসে ধাক্কা মারছে ওই সদ্য সন্তানহারা মায়ের বুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের পাণ্ডুলিপিতে জেগে উঠবে একটা আকার, জেগে উঠবে সহস্রাব্দের ঘুম পেরিয়ে। যেমন হয়তো আদি মানব জেগে উঠেছিল একদিন, জেগে উঠে তাকিয়েছিল তাঁর নিয়ন্তার দিকে।

মেরি ওলস্টোনক্রাফট শেলি নামে আঠেরো বছর বয়সি রাগী যুবতীর কলম থেকে বেরিয়ে আসা একটা অবয়ব আমাদের দুঃস্বপ্নের রঙ্গমঞ্চকে শাসন করে গেছে গত দুই শতাব্দী। সাহিত্যের স্রোত থেকে বেরিয়ে তার তটরেখার বিস্তৃতি বেড়েছে শিল্পের অন্য মাধ্যমে, বিশেষত সিনেমা নামক অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে জনমানসে হয়তো আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রভাব। এই বছরটা 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর দ্য

মর্ডার্ন প্রমিথিউস' নামের সেই আশ্চর্য উপন্যাসের দ্বিশতবার্ষিকী। এই প্রাক্-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কল্পবিশ্ব ওয়েব ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে আমাদের মনে হয়েছিল, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যা প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান, সেই মহান উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের এই ইপকটা স্মরণীয় করে রাখা উচিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৮১৮ সালের ১ জানুয়ারি যখন লন্ডন শহরে ল্যাকিংটন, হিউজ, হার্ডিং, মেভর অ্যান্ড জোন্স নামের একটা ছোট্ট পাবলিশিং কোম্পানি থেকে তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ ছেপে বের হচ্ছে, তখনও লেখকের নাম ছিল উহ্য। শুধুমাত্র উৎসর্গপত্রে নাম ছিল সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনের এক অগ্রগণ্য নাম। উইলিয়াম গডউইন। বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন কবি পার্সি বিস শেলি যিনি একাধারে বিখ্যাত একজন কবি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমপরিমাণ কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাস্তিকতার একজন নব-উদ্গাতা হিসেবে। শেলির নাম প্রথম থেকেই জড়িত থাকার কারণে এই উপন্যাসকে ঘিরে একটা বিবাদের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। এমনকী, বিখ্যাত স্কটিশ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের মতো মানুষও 'ব্ল্যাকউড এডিনবার্গ ম্যাগাজিন'-এ বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেও বেশ কয়েকটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেছেন অথরশিপ নিয়ে। যাইহোক পরবর্তীকালে সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণ হয়েছে যে মেরির সৃষ্টিশীল সত্তাই জন্ম দিয়েছিল ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর তাঁর তৈরি দানবকে। ভিলা দিওদাতির সেই ঘরে লর্ড বায়রনের প্রস্তাবিত চ্যালেঞ্জ যা মেরির মর্মের গভীর থেকে উৎসারিত করল জায়মান অক্ষরমালার স্রোত। এর সুফল পেয়েছে বিশ্বসাহিত্য। সেই মহান গ্রন্থের দুশো বছরকে স্মরণ করে 'কল্পবিশ্ব' ওয়েবম্যাগ এই বছরেই অর্থাৎ ২০১৮ সালের এপ্রিলে আস্ত একটা সংখ্যা বের করেছিল। এদিকে গত বছরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতায় ঠিক হয় যে, এই উপলক্ষে যুগ্মভাবে একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সারা পৃথিবী থেকে গবেষকরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং রি-অ্যানিমেশন থিমকে নিয়ে তাঁদের গবেষণাপত্র পাঠ করবেন সেই সমাবেশে। যার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি নানা শাখায় এই থিম্যাটিক মোটিফটা যেভাবে ছড়িয়ে আছে তার একটা বর্ণালী হয়তো বিচ্ছুরিত হবে। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অভিজিৎ গুপ্ত এবং ওই বিভাগেরই অধ্যাপক রিমি বি চ্যাটার্জিকে। অধ্যাপক

চ্যাটার্জি ইংরেজীতে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সন্দর্ভ এই সংকলনের জন্য লিখেছেন যা ওই আগে বর্ণিত বর্ণালীরই একটা অনুরণন। তবে পণ্ডিতদের অন্বেষণের পরেও থেকে যায় আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের একটা অনন্ত খোঁজ। যে খোঁজ সার্থকতা পায় গল্পের শরীরে, প্লট-সাবপ্লটের বিনির্মাণে। সেই চিন্তারই ফসল এই সংকলন। আমরা খোঁজা শুরু করলাম যে বাংলা সাহিত্যে এই গল্পের চেতনা কীভাবে শাখা মেলেছে অন্য গল্পের আড়ালে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেভাবে খুঁজে পাওয়া গেল না এমন বিষয় বা আঙ্গিক নির্ভর বাংলা কাহিনি। এই সংকলনে বাংলা ধ্রুপদী কল্পবিজ্ঞানের ভাঁড়ার থেকে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের 'শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' ছাড়া আর দুটো মাত্র গল্প স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে এই বিষয়ের অনুনাদ খুঁজে পাওয়া যায়। শঙ্কুর গল্প পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী সন্দীপ রায় এবং আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষকে। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই শ্রী রণেন ঘোষকে যিনি প্রথম দিন থেকেই কল্পবিশ্বের এক আপনজন হিসেবে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এসেছেন আমাদের। আমরা আরও চেয়েছিলাম যে বিদেশি যেসব লেখালেখির মধ্যে এই থিমের শাখাপ্রশাখা ঢুকে গেছে তার কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় লেখাকে সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে তুলে আনার জন্য। এক্ষেত্রে কল্পবিশ্বের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ক্রিস্টি ফার্ন, রোবার্তা ল্যানেস, র‍্যামসে ক্যাম্পবেল এবং ব্রায়ান মুনি'কে যাঁরা ইমেলের মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁদের লেখার অনুবাদ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এরপরেও যা পড়ে থাকে সেটা হল এখনকার লেখকদের চিদাকাশে যেভাবে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সেই চেতনা যা প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করে মৃত্যু পেরিয়ে যেতে চায় সভ্যতার অমৃত কিংবা গরলের অন্বেষণে। কল্পবিশ্বের তরুণ ব্রিগেড হতাশ করেনি। আশা করব যে, পাঠকেরাও আমাদের এই ভালো লাগার অনুভূতি ভাগ করে নেবেন, লেখা ঝাড়াই বাছাই করার সময় আমাদের যেটা হয়েছিল। মৌলিক গল্প আর প্রবন্ধের একটা বিরাট ব্যান্ড উইডথের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গায়িত হতে চলেছে এই সংকলন। আমাদের বিশ্বাস যে এই সংকলনের মধ্যে দিয়ে আবার আমাদের বোধের অলিন্দের কোণ থেকে জেগে উঠবে সেই অবয়ব যাকে সভ্যতার মদগর্বে মানুষ বারে বারে দানব হিসেবে ভুল করে। আবার হয়তো পাঠকের মনে সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে, দানবের যে সংলাপ তাঁর নিয়ন্তার দিকে ধেয়ে গেছিল ... "I

ought to be thy Adam, but I am rather the fallen angel ...”

কলকাতা সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তু বাগ
১৫ নভেম্বর ২০১৮

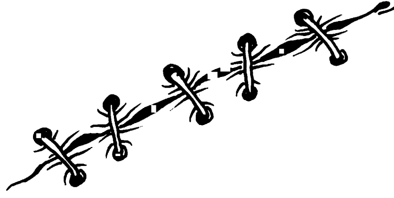
প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর সর্বপ্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান— মেরি শেলির ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস’-এর দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সাহিত্য উৎসব। শুধু কল্পবিজ্ঞান নয়, সামগ্রিক ভাবেই বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি এই কাহিনি। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তৈরি দানবের মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে সভ্যতার প্রেত। যে বিপন্নতার সঙ্কেত দুশো বছর আগে এক অষ্টাদশী প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা যেন আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

কল্পবিশ্ব পত্রিকা আগেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে নিয়ে একটি বিশেষ অন্তর্জাল সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে কল্পবিশ্ব আয়োজন করেছে এক সমাবেশের। এটি কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক কল্পবিজ্ঞান সম্মেলন যার বিষয় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। সেই উপলক্ষে আমরা এবার দুই মলাটের ভিতরে নিয়ে এলাম এই চিরকালীন সাহিত্যকে নিয়ে এক অনন্য সংগ্রহ। সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু কাহিনির চিরচেনা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের পাশাপাশি রয়েছে বহু তরুণ লেখকের নিজস্ব বীক্ষা।

গল্প, অনুবাদ, প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার— এক কথায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এমন বই এই প্রথম। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, উৎসাহী পাঠক বইটিকে সমাদরে বরণ করে নেবেন।

সূচিপত্র



কল্পবিশ্ব

ফ্রাঙ্কেস্টাইনের
দ্বিশতবর্ষ
জন্মদিন উপলক্ষ্যে



তৃতীয় বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

কল্পবিশ্ব পত্রিকার বিশেষ অন্তর্জাল সংখ্যা

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৮
প্রচ্ছদ: রুমেলা দাস

Frankenstein 200 : Childhood's End



Rimi B. Chatterjee

What happens when you neglect a child? Specifically, what happens to the child? This is a question which we can only answer indirectly, because when the experience of childhood neglect is upon us in real time, we are unable to understand or deal with it, and by the time we are capable of dealing with it, it has receded into the bedrock of our consciousness, unreachable by any but the most profound psychological inquiries, yet leaving traces of its presence in the quirks and neuroses of the adult personality. Indeed, the process of healing or restoring the victims of this neglect is is today the province of a whole branch of medicine and various terrains of academia, not to mention a vast market of goods and services.

It is arguable that Frankenstein the novel and its many mind-children both legitimate and not so legitimate, have played a role in the rise of this aspect of the modern world, not to mention the theory of self and of human development on which it rests. First published in 1818, the novel predates the enormous strides in every branch of science and technology that were just around the corner as the nineteenth century began to unfold. Mary Shelley,

through her father William Godwin, knew personally some of the figures of the day who were spearheading this intellectual revolution. She herself continued throughout adult life to share an interest in what we would today call science with her husband and friends. Yet her primary concern in this novel is to sound a warning, not against science itself, but what she astutely saw as the philosophy of science as it had been crystallised by the Enlightenment. Far from its self-trumpeted rhetoric of reason, fairness and the maximisation of good, we also know that the Enlightenment was also a time of rural impoverishment, burgeoning city slums, occasional famine, savage colonial expansion and a systematic exclusion of the non-male, non-white, non-upper class and non-hegemonic from the privilege of defining reason and its uses. It is no accident that the Age of Reason ended in a series of bloody revolutions. When your masters say that everything they say is reason and everything you say is unreason, then it's either time to go mad or burn things down.

Mary Shelley was uniquely qualified and positioned to see very clearly both the good and the bad of her times. Indeed, she often came into brutal contact with both. What she saw was that the very beauty of the Enlightenment vision was its pitfall, because like Victor's little science project, it sounds great on paper but leaves a somewhat bitter aftertaste in practice. To put it very simply, if all your interlocutors are white male wealthy sophisticates, it is very

easy to imagine things like a free and fair exchange of ideas, a disinterested pursuit of knowledge, an ideal way to govern the state, or design prisons, or manage urban poverty. The reason being, so long as these ideas make your kind happy, any design flaws that make other people unhappy can be ignored, because the objections of such people do not come from reasonable men. Thus throughout the nineteenth century, lying-in hospitals had maternal and infant mortality rates far in excess of home births even as men of science talked up the wonders of the advances in medicine that they were discovering from this ready supply of corpses.[1] It took quite a few revolutions before there could even be framed a discourse in which the mortality rates of maternity hospitals could be a matter of concern for the voting public, a category that now includes the women who would have been admitted to those hospitals. Mary Shelley knew the importance of such things, her own mother having been a victim of the 'new medicine', but the age was such that she could find no acceptable way to speak of it in public.

So, she did the next best thing: she wrote a story. A story about one such reasonable man who decides for reasons that bear very little close examination to create a child of his very own, except that, being in all important respects a child himself, he has no idea what a child is, what it needs and how it should be handled. Hence what he creates becomes a monster. Not out of choice, but through

dire necessity: because his creator pushes him away. When, as an eight-foot-tall cold-hardy two-year-old, the monster finally encounters his creator, almost the first thing he tells him is that Victor owes him a debt of care and protection for creating him.[2] This is the truth that every child knows, except no two-year-old can plead their case with any eloquence. This is where the monster surprises his creator. Parents rarely deal patiently with a kid who's demonstrably smarter than they are, and Victor is no exception. He refuses to acknowledge the monster's existence as if his ill-wishing can unmake the monster. Here his alchemical studies betray Victor: having taken recourse to technology to create the monster, he now falls back on the attitudes of magic to banish his creation like a demon. Needless to say, it doesn't work.

Alchemy is not the only factor to blame in Victor's downfall. There are two questions we must ask about his project. One, why did he undertake it in the first place, and two, why did he then fail at it? In his oral recounting to Robert Walton, Victor states his research question (so to speak) as follows: 'Whence … did the principle of life proceed?'[3] He labours to discover the answer, and he succeeds: so, step one is theoretical. Step two is proof of principle: the building of a prototype. He tells us he decides to build his new human a little over scale, as, 'the minuteness of the parts formed a great hindrance to my

speed' with blithe disregard for the inevitable consequences. He tells us that he collected his materials and began, and only after that does the thought come to him that 'a new species would bless me as its creator.... No father could claim the gratitude of his child so completely as I should deserve theirs.'[4]

This is the only time he applies the word 'child' to the monster, and it might as well be 'doll' for all the meaning it carries. Victor himself has good reason to know what a father claiming gratitude is like. His father has given him much to be grateful for: wealth, servants, an education, a made-to-order wife-in-waiting, protection, nurture and a terribly swelled head. Everything except Daddy's special toy: power. Poor Victor has no one to order around, and the moment Daddy's back is turned he gets to work on remedying that omission. We don't need to look far to see who's on his mind as he 'tortured the living animal to animate the lifeless clay': when he's not describing his methods, he's worrying about his father's prediction that if Victor neglected to write home he was probably up to no good. The mature Victor (on the point of death, speaking to Robert Walton) admits that his father was right to doubt him, but that knowledge is very dearly won.

Patriarchy, like all unjust systems, depends upon the indoctrination of both its victims and its future oppressors. Before they become oppressors, future patriarchs are given

a little taste of what victimhood is like: it’s called childhood. In childhood, they are taught how they should not be. Weaker boys learn from stronger boys that softness, weakness, innocence and trust are punished unless one defends oneself. They either learn this through practical demonstration on their person, or they are told this by the stronger boy or man as he defends them from other stronger boys and men. Once grown, a boy may reject that idea, but they can only do so by becoming aware of it and rooting it out of their mindset, a task which nobody trains them to do. Victor does not fall within that group. He is such a perfect product of patriarchy that he cannot see beyond his father’s defending shoulder. Like the crown prince of a benevolent but long lived king, he grows itchy for his turn at the sceptre, seeing only the pomp and ceremony and not noticing the tax dollars that pay for it. So he takes a shortcut, but like the greedy baby he is, he wants mother’s share of the kudos as well. So rather than follow the more usual make-a-person route, he decides he wants a designer baby. Or thinks he does, until the creature wakes up, Victor realises there is a in the room with him and no Daddy to make it behave, and suddenly Victor wants the genie put back in its bottle. But is his reaction really that illogical? In truth, Victor reacts to the monster exactly as if he had made a person by mistake with some unfortunate woman of Ingolstadt’s inns and markets and is now outraged at the suggestion that he take

responsibility. Gone is all thought of proving the miraculous principle of life. The monster stands before Victor as living proof that he is the greatest scientist in the world, but all Victor can say is 'Begone!' So much for 'the magnitude and complexity of my plan'.[5] Like a child attempting to impress her friends at hide and seek by locking herself in the deep freeze, Victor fails precisely because of his success.

Patriarchy is an oppression specifically geared towards controlling human reproduction by controlling women. Victor may have attempted to reconfigure it by removing the woman from the equation, but his solipsistically formed mind-child is just as much a patriarchal property as a natural child. The fact is, under patriarchy, all children start out slaves, constrained to follow orders and forbidden to exercise their will in all but the most trivial matters. All of the people surrounding Victor are there to serve and protect him, to give him what he needs and cushion him from the shocks of the world as securely as if he were a fetus in the womb, and he expects it to be that way. When he encounters two men who stand outside this system, namely Professors Krempe and Waldman, he picks the latter as his surrogate father, rejecting Krempe as 'uncouth'. This is partly due to Krempe's unprepossessing appearance, but also due to Krempe's willingness to needle the son of Alphonse Frankenstein.

Free will is precisely the quality that Victor lacks yet

craves. His only act of disobedience to his father is his secret monster-creation project, yet the disobedience remains incomplete, because Victor never lifts the veil on it, not even when his brother is murdered, and an innocent girl is condemned for the crime. Victor's failure to take responsibility for his actions is the litmus test that shows his adulthood to be fake, as the monster surmises. In truth, Victor's project to change humanity fails because what he really wished to do, what he desperately needed to do, was change himself. Yet when the moment of confrontation comes, when the monster stands before him daring him to admit to his obligations, pleading with him to redeem himself and rebuild the monster's world, Victor is blind. In this, Victor has misunderstood the nature of creation. It is only in play that we can knock down all our toy houses and rebuild them just as easily. In the adult world, such acts leave a mark.

Jo Murphy-Lawless,
, Indiana University Press, 1999.
Mary Shelley, ,
Norton Critical Edition, ed. J. Paul Hunter. Norton 1996, p. 66.
Ibid., p. 30.
Ibid., p. 32.
Ibid., p. 31.



শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

সত্যজিৎ রায়

৭ মে

কাল জার্মানি থেকে আমার ইংরেজবন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে একটা আশ্চর্য খবর রয়েছে। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রিয় শঙ্কু,

জার্মানিতে আউগ্‌সবুর্গে এসেছি ক্রোলের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। এখানে এসে ্রক আশ্চর্য খবর শুনলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যারন ভিক্টর ্যাঙ্কেনস্টাইনের কথা তুমি নিশ্চয়ই জান। মেরি শেলি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামে কটা উপন্যাস লিখেছিলেন, তাই লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ঙ্কেনস্টাইন বুঝি কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু কিছুকাল আগে জানা গেছে যে, ঙ্কেনস্টাইন নামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যিই একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন মেরি শেলির ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতোই মরা মানুষকে বাঁচয়ে তোলার আবিষ্কার করেছিলেন। অবিশ্যি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যে একটা সামান্য ভুলের ানবের জায়গায় দানবের সৃষ্টি করেছিলেন, সে খবরও নিশ্চয়ই তুমি যাই হোক, সেই ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের একজন বংশধর থকে কাছেই ইনগোলস্টাট নামে একটি শহরে নাকি এখনও আমরা ভেবেছি, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। যদি তাঁর পূর্বপুরুষ ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাগজপত্র এখনও কিছু , তা হলে অদ্ভুত ব্যাপার হবে। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা যে দের সঙ্গে চলো। আউগ্‌সবুর্গে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন হচ্ছে, তোমায় যাতে নেমন্তন্ন করা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দিতে তোমার যাতায়াতের খরচ বহন করবে। কী স্থির কর অবিলম্বে করি ভাল আছ।

আমি পত্রপাঠ ইচ্ছা প্রকাশ করে উত্তর দিয়ে দিয়েছি। প্রতি বছর আমি একবার করে ইউরোপ গিয়ে থাকি। এ বছর এখনও যাওয়া হয়নি। তা ছাড়া ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের আশ্চর্য গবেষণা আর তার শোচনীয় পরিণামের কথা কে না জানে। তিনি মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির মাথায় ভুল করে একটি খুনির মগজ পুরে দেওয়ার ফলে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত প্রাণীটি একটি অসম শক্তিশালী নৃশংস দানবের রূপ নেয়। শেষটায় আগুনে পুড়ে এই দানবের মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে না বললেই চলে। তাঁর কাগজপত্র দেখতে পেলে সত্যিই কাজের কাজ হবে। কিন্তু এতদিন পরে সে সব কাগজ আছে কি? সন্দেহ হয়।

২১ মে

আউগ্‌সবুর্গ থেকে নেমন্তন্ন এসে গেছে। আমি আগামী শনিবার পঁচিশে মে রওনা হচ্ছি। জানি না কপালে কী আছে। তবে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাগজপত্র না পেলেও, আমার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্রোল আর সন্ডার্সের সঙ্গে আবার দেখা হবে মনে হলেও ভাল লাগছে।

২৭ মে

কাল আউগ্‌সবুর্গে পৌঁছেছি। আমার দুই বন্ধুই আমি আসাতে যারপরনাই আনন্দিত। কাল এখানে বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে। তিন দিন চলবে। তারপর ৩১ তারিখে আমরা ইনগোলস্টাট যাব। ইতিমধ্যে ব্যারন জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ঠিকানা জোগাড় করা হয়েছে। শ্লস্ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কাস্‌ল হল তাঁর বাড়ির নাম। জুলিয়াস নাকি চিত্রশিল্পবিশারদ। তাঁর পেন্টিং-এর সংগ্রহ নাকি দেখবার মতো। তাঁর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে।

২ জুন

কাল ইনগোলস্টাট এসেছি আউগ্‌সবুর্গ থেকে মোটরে করে। সকালে ব্রেক- ফাস্ট খেয়ে রওনা হয়ে লাঞ্চের আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। প্রাচীন শহর, ছবির মতো সুন্দর। ড্যানিউব এবং শুটার নদীর সঙ্গমস্থলের

পাশেই এর অবস্থান। অনেকগুলো প্রাচীন কেল্লা রয়েছে শহরের মধ্যে। আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে।

আমরা একটা ছোট হোটেলে তিনটে ঘর নিলাম। লাঞ্চ খেয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নম্বর বার করলাম। ক্রোল তখনই ফোন করল। সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোককে ফোনে পাওয়াও গেল। তিনিও সবেমাত্র লাঞ্চ সেরে উঠেছেন। ক্রোল তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি এবং আমার দুই বন্ধু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সম্ভব হবে কি?'

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বললেন, বিকেল সাড়ে চারটেয় তাঁর
বাড়িতে গিয়ে চা খেতে।

আমরা যথাসময়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড ফটকের গায়ে বাড়ির নাম শ্বেতপাথরের ফলকে জার্মান ভাষায় লেখা। তারপর দীর্ঘ নুড়ি ঢালা প্যাঁচানো পথ দিয়ে আমরা আসল কাস্‌লের দরজার সামনে পৌঁছোলাম। কড়া নাড়তে একটি উর্দিপরা প্রবীণ ভৃত্য এসে দরজা খুলে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে ঢুকতে বলল। আমরা ঢুকে দেখি একটা প্রকাণ্ড হলে এসেছি। তার একপাশ দিয়ে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। আমরা মখমলে মোড়া সোফায় বসতে না বসতে একটি সৌম্যদর্শন মাঝবয়সি ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে বললেন, তিনিই জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। আমি ভারতীয় দেখে ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'আমার কাছে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক বই এবং ভারতীয় শিল্পের অনেক নিদর্শন রয়েছে। আশা করি সেগুলো তোমাকে দেখানোর সুযোগ হবে।'

এরপর ভদ্রলোক আমাদের ভিতরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। এটা সুসজ্জিত বিশ্রামঘর, দেয়ালে বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি টাঙানো, আর তার ফাঁকে ফাঁকে মনে হল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি।

আমরা সোফাতে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি ভৃত্য ট্রলিতে করে চা ও পেস্ট্রি নিয়ে এল।

ক্রোলই প্রথম কথা শুরু করল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দেখলাম ইংরিজি ভালই জানেন, তাই ইংরিজিতেই কথা হল। ক্রোল বলল, 'আমরা তিনজনেই বৈজ্ঞানিক। আমি ভূতাত্ত্বিক, সন্ডার্স নৃতত্ত্ববিদ আর শঙ্কু আবিষ্কারক বা

ইনভেনটার। আমরা তিনজনেই তোমার পূর্বপুরুষ ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কথা জানি। তাঁর বিষয় পড়েছি, এবং তাঁর গবেষণা ও তার ফলাফলের কথা জানি। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে— তাঁর কাগজপত্র, নোটস, ফরমুলা ইত্যাদি কি কিছু অবশিষ্ট আছে?'

জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে স্মিতহাস্য করে বললেন, 'তাঁর এক টুকরো কাগজও আমি নষ্ট হতে দিইনি। শুধু তাই না— তাঁর ল্যাবরেটরিও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর পুরো ডায়রিটা চামড়ায় বাঁধানো অবস্থায় অতি সযত্নে রক্ষিত আছে। অবিশ্যি বুঝতেই পারছ— দেড়শো বছরের উপর হয়ে গেল। সে ডায়রি খুব সাবধানে দেখতে হয়, না হলে পাতা ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছিলেন আমার প্রপিতামহ। আমার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই বৈজ্ঞানিক ছিলেন, একমাত্র আমিই বিজ্ঞানের দিকে যাইনি।'

সন্ডার্স বলল, 'সে ডায়রি কি দেখা যায়?'

'তোমরা চা খেয়ে নাও,' বললেন জুলিয়াস, 'তারপর আমি দেখাচ্ছি ডায়রিটা।'

কথাটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

চা খেতে খেতে আরও কথা হল। তার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ মনটাকে বিষিয়ে দিল। জুলিয়াস বললেন, 'গভীর আক্ষেপের বিষয় যে, জার্মানির অতীতের একটি ঘটনা এই ইনগোলস্টাটে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তোমরা হান্‌স রেডেলের নাম শুনেছ?'

ক্রোল বলল, 'শুনেছি, কিন্তু রেডেল কি এখানে থাকে?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকে', বললেন জুলিয়াস।

'সে তো হিটলারপন্থী বলে শুনেছি। হিটলারের চিন্তাধারা আবার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে চেষ্টা করছে। একটি দলও গড়েছে বলে শুনেছি।'

'সবই ঠিক', বললেন জুলিয়াস। 'সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় যে, সে আবার ইহুদি বিদ্বেষের বীজ বপন করার চেষ্টা করছে।'

হিটলার ও তার নেতাদের চক্রান্তে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে পুরে ফেলা হয়েছিল ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে হিটলারের পতন ও ইহুদি নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'তুমি তো ইহুদি?' সন্ডার্স বলল। নামের সঙ্গে 'স্টাইন' থাকলেই ইহুদি

বোঝায়, সেটা আমিও জানতাম।

'তা তো বটেই', বললেন জুলিয়াস। 'রেডেলের দলের লোকেরা নিয়মিত মারণাস্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাদের পার্টির জন্য টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। অবিশ্যি আমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নই, ইনগোলস্টাটের অনেক অবস্থাপন্ন ইহুদিরই এই অবস্থা। রেডেলের মতো হীন ব্যক্তি আর দুটি হয় না। সেই হল এই দলের পাণ্ডা। দলের বাকি লোকগুলো সব গুণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু রেডেল শিক্ষিত, এবং বুদ্ধি রাখে। ইহুদিবিদ্বেষ তার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।'

কথাটা শুনে আমাদের খুব খারাপ লাগল। জার্মানিতে আবার দুর্দিন আসবে ভাবতেও ভয় করে।

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জুলিয়াস বললেন, 'চলো, তোমাদের ডায়রিটা দেখাই।'

এবার আমরা এলাম লাইব্রেরিতে। চতুর্দিকে আলমারি বোঝাই নানান পুরনো বইয়ের মধ্যে নতুন বড় বড় আর্টের বইগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জুলিয়াস একটা দেরাজ থেকে চাবি বার করে একটা সিন্দুক খুললেন। তারপর তার ভিতর থেকে অতি সন্তর্পণে সিল্কে মোড়া একটি মোটা বই বার করলেন।

সিল্কের আবরণটা খুলতে দেখা গেল, চামড়ায় বাঁধানো মলাটে সোনার জলে নকশা করা একটা বই। বই মানে ডায়রি।

'এই হল আমার প্রপিতামহের নোটস। মরা মানুষ বাঁচাবার উপায় এতেই বর্ণনা করা আছে, এবং তাঁর প্রথম এক্সপেরিমেন্ট ও তার শোচনীয় পরিণামের
কথাও এতেই আছে।'

পাতাগুলো ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে গেলেও কালো কালিতে অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা নোটস এখনও পরিষ্কার পড়া যায়।

'এই ফরমুলা কি আপনার বাবা বা ঠাকুরদাদা আর কখনও ব্যবহার করেছিলেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না', বললেন, জুলিয়াস, 'সেই দুর্ঘটনার পর এই বইয়ে আর কেউ হাত দেয়নি।'

'আশ্চর্য!'

আমরা তিনজনেই মুগ্ধ, বিস্মিত। আমার মনের ভাব অদ্ভুত। এতকাল আগে একজন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা এই কীর্তি সম্ভব হয়েছিল। ভাবতেও অবাক লাগে।

‘এই খাতার কথা ক’জন জানে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘খাতার কথা আর কেউ জানে না,’ বললেন জুলিয়াস, ‘তবে আমার প্রপিতামহের গবেষণা আর তার ফলাফলের কথা তো বিশ্ববিদিত।’

আমাদের শুধু আরেকটা কাজ বাকি ছিল, সেটা হল ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ল্যাবরেটরিটা দেখা।

ভদ্রলোক একটা লম্বা ঘোরালো প্যাসেজ দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে তাতে ঢোকালেন।

তাজ্জব ব্যাপার। বিশাল গবেষণাগারে দেড়শো বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি সবই রয়েছে। কতরকম যন্ত্রই না বানিয়েছিলেন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সেই আদ্যিকালে।

আমরা আর জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সময় নষ্ট করলাম না। বড় ইচ্ছা করছিল ডায়রিটাকে পড়ে ফেলতে, কিন্তু তার কোনও উপায় নেই। আমরা তিনজনে জুলিয়াসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

১২ জুন

আমি কাল আউগ্‌সবুর্গ থেকে দেশে ফিরেছি। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়রির কথাটা এখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তবে একটা কথা ভুলতে পারছি না, আর সেটা মোটেই স্বপ্ন নয়, সেটা নির্মম বাস্তব। সেটা হল হিটলারপন্থী হান্‌স রেডেলের কথা। আশা করি, রেডেলকে শায়েস্তা করার একটা উপায় বার করা যাবে। না হলে চরম বিপদ। জার্মানির পক্ষেও, এবং সমস্ত সভ্য সমাজের পক্ষেও।

১৭ জুন

আজ সন্ডার্সের আরেকটা চিঠি। অত্যন্ত জরুরি খবর। চিঠিটা এই—

আমি সন্ডার্সকে ইনগোলস্টাট যাচ্ছি বলে জানিয়ে দিয়েছি। পরশুই রওনা। এবারে নিজের খরচেই যেতে হবে। কিন্তু কাজটা সফল হলে খরচের দিকটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলবে।

২০ জুন, ইনগোলস্টাট

জুলিয়াসকে রাজি করিয়েছি। তাঁর প্রপিতামহের নোটস এতকাল পরে আবার কাজে আসবে শুনে তিনি খুশিই হলেন। আমি বললাম, 'কিন্তু তার আগে আমি একবার খাতাটা আদ্যোপান্ত পড়ে দেখতে চাই। প্রক্রিয়াটা আমাকে ভাল করে বুঝতে হবে তো।'

জুলিয়াস খাতাটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি এটাকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবে, সেটা আমি জানি।'

আমি একাই এসেছি এখন ইনগোলস্টাট। আজ সন্ডার্স আর ক্রোলকে টেলিফোন করব। তারা কাল এসে পৌঁছোবে। সন্ডার্সকে অবশ্য গিলেটের মৃতদেহ
আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটা জিনিস আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলাতে মৃতদেহের মাথায় অন্যের মগজ পোরার প্রয়োজন হত। এটা একটা গোলমেলে ব্যাপার। গিলেটের মাথায় অন্যের মগজ পুরলে তাকে বাঁচালে আর সে গিলেট থাকবে না। সে কাজ করবে নতুন মগজ অনুযায়ী—

যে কারণে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মানুষ হয়ে গিয়েছিল নৃশংস হত্যাকারী। আমার মনে হয়, ফরমুলার কিছু রদবদল করতে হবে। সেটা সম্ভব কি না সেটা ডায়রিটা পড়ে দেখলে বুঝতে পারব।

২১ জুন

কাল রাত্রেই ডায়রিটা পড়ে ফেলেছি। শুধু তাই নয়— সারা রাত জেগে ফরমুলায় যা পরিবর্তন করার দরকার ছিল, তা করে ফেলেছি। এখন গিলেট বেঁচে উঠলে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, কারণ তার নিজের মগজই ব্যবহার করা হবে। ফরমুলায় আরও একটা পরিবর্তন করেছি; ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলায় প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হচ্ছিল। স্বাভাবিক বজ্রপাতের জন্য অপেক্ষা করতে হলে দেরি হয়ে যাবে। তাই কৃত্রিমভাবে মৃতদেহে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চারের উপায় আবিষ্কার করেছি। এখন ফরমুলাটাকে শুধু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফরমুলা না বলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-শঙ্কু ফরমুলা বলা চলে। দেখি এতে কাজ হয় কি না।

২৩ জুন

গিলেটের মৃতদেহ সমেত সন্ডার্স ও চারজন লোক লন্ডন থেকে এসেছে কাল রাত্রে। ক্রোল আজ সকালে এসেছে। আজই আমাদের কাজ হবে। ইতিমধ্যে জুলিয়াস ল্যাবরেটরি থেকে ধুলোর শেষ কণাটুকু পর্যন্ত সরিয়ে দিয়েছেন তাঁর লোক দিয়ে। যন্ত্রপাতিগুলোকে ঝকঝকে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

এবার এসে অবধি জুলিয়াসকে একটু মনমরা দেখছি। আজ কারণটা জিজ্ঞেস করাতে বললেন হান্‌স রেডেলের দল জুলিয়াসের এক বিশিষ্ট ইহুদি বন্ধু বোরিস অ্যারনসনকে হত্যা করেছে। অ্যারনসন ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক এবং অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। অ্যারনসনকে রেডেল নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। তাই আর না পেরে অ্যারনসন খবরের কাগজে রেডেল এবং তার হিটলারপন্থী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে। এর বদলা হিসেবে রেডেল অ্যারনসনের প্রাণ নেয়। ব্যাপারটা সে এমন কৌশলে করে যে, পুলিশে এ নিয়ে কিছু করতে পারেনি। অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে মৃত্যু— এই বলা হয় রিপোর্টে। অথচ জুলিয়াস

এবং ইনগোলস্টাটের সব ইহুদিই জানে এটা কার কীর্তি।

কিন্তু এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও জুলিয়াস আমাদের সব রকমে সাহায্য করে চলেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে, আজই সন্ধ্যায় গিলেটের মৃতদেহের উপর কাজ শুরু হবে। রাসায়নিক মালমশলা যা দরকার, সবই আজকের মধ্যে জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। দুষ্প্রাপ্য কোনও জিনিসই নেই। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলার সবচেয়ে বড় গুণই ছিল এর সরলতা। সন্ডার্স ও ক্রোল তো আমাকে সাহায্য করবেই, তা ছাড়া আরও দুজন স্থানীয় সহকর্মীকে কাজে বহাল করা হয়েছে। দশজন লোক অরাজি হবার পর দুজনকে পাওয়া গেল, যারা কাজটা করতে রাজি হল। সকলেই জানে ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের কথা, এবং তাদের ধারণা আমরা এবারও একটি দানব সৃষ্টি করতে চলেছি।

২৪ জুন

এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল।

কাল সাড়ে সাত ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ ভোর পাঁচটায় প্রথম গিলেটের দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। ডান হাতে মৃদু কম্পন, ঠোঁটের কোনায় কম্পন, চোখের পাতায় কম্পন। আমাদের সকলের উৎকণ্ঠায় প্রায় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম।

আধ ঘণ্টা পরে গিলেট চোখ খুলল। তারপর সে চোখের মণি এদিক ওদিক ঘোরাল। তারপর ঠোঁট খুলে প্রথম কথা বেরোল, 'হোয়্যার অ্যাম আই?'

আমি গিলেটের হাত থেকে স্ট্র্যাপ খুলে নিলাম। গিলেট ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর প্রশ্ন এল, 'আমি কত দিন ঘুমিয়েছি?'

সন্ডার্স বলল, 'সেভেন ডে'জ, টমাস।'

গিলেট বলল, 'আশ্চর্য! এদিকে আমার কাজ অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। আর দু দিন পেলেই ওষুধটা তৈরি হয়ে যায়।'

'তুমি কালই আবার কাজ শুরু করতে পারবে,' বলল সন্ডার্স। 'এখন তুমি রয়েছ জার্মানিতে। তোমার ঘুম ভাঙানো হয়েছে এখানকার গবেষণাগারে। এই জায়গার নাম ইনগোলস্টাট।'

আমি বললাম, 'আপাতত তুমি একটু বিশ্রাম করো বিছানায় শুয়ে, তারপর তোমাকে খেতে দেওয়া হবে।'

আমার যে কী আরাম লাগছিল তা বলতে পারি না। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জুলিয়াস, আমার ডান হাতটা তার দু' হাতে চেপে। আমি বললাম, 'তোমার প্রপিতামহ যে কত এগিয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিক হিসেবে, তা আজকে বুঝতে পারছি।'

২৬ জুন

আজ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

গিলেটকে কালই বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়। তার সঙ্গে যে চারজন লোক সন্ডার্সের সঙ্গে এসেছিল, তারাও ফিরে গেছে। আমাদের তিন জনকে জুলিয়াস আরও তিন-চার দিন থেকে যেতে বললেন। 'আমার আর্টের সংগ্রহ তোমাদের দেখানো হয়নি', বললেন জুলিয়াস। 'তোমরা হোটেল থেকে আমার বাড়িতে চলে এসো। এখানে ঘরের অভাব নেই।'

আমরা তাই করলাম। কাল জুলিয়াস তাঁর ভারতীর ছবি ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ আমাদের দেখালেন। আশ্চর্য সব মোগল ও রাজপুত ছবি সংগ্রহ করেছেন জুলিয়াস। বললেন, 'এগুলো আমার গত বাইশ বছরের সংগ্রহ।'

অতিথিসেবক হিসেবে জুলিয়াসের তুলনা নেই। আমরা সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছি, চমৎকার খাচ্ছি, কাস্‌লের তিন দিকে ঘেরা ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি।

ঘটনাটা ঘটল আজ সকাল সাড়ে দশটার সময়। আমরা চারজন জুলিয়াসের বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় জুলিয়াসের চাকর ফ্রিৎস ফ্যাকাশে মুখ করে মাথার উপর দুটো হাত তুলে আমাদের ঘরে ঢুকল। তার পিছন পিছন ঢুকল চারজন গুণ্ডা জাতীয় লোক, তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে মোক্ষম মারণাস্ত্র।

'হাত তোলো!' হুংকার দিয়ে আদেশ করলেন বোধ হয় দলের যিনি নেতা — তিনি। আমরা তিন জনেই অগত্যা হাত তুললাম।

'শোনো', বললেন নেতা, 'আমরা শুনেছি লন্ডনের একজন মৃত ডাক্তারকে এখানে পুনর্জীবন দান করা হয়েছে। ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কীর্তিকলাপের কথা আমরা জানি, কিন্তু তার যন্ত্রপাতি যে এখনও ব্যবহারযোগ্য রয়েছে, এবং এখনও যে ইচ্ছে করলে সেই কাস্‌লের গবেষণাগারে মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, তা আমাদের ধারণা ছিল না। সেটা আমরা সবে জানতে পেরেছি। আমরা যে কারণে আজ এসেছি, সেটা এবার বলি। আমাদের

দলের নেতা হান্‌স রেডেল আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় থ্রম্বোসিসে মারা গেছেন। আমরা চাই তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হোক। এটা আমাদের আদেশ। এটা না মানলে তোমাদের একজনকেও আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের যন্ত্রও আর তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে না, কারণ তোমাদের মৃতদেহের গলায় পাথর বেঁধে ড্যানিউবে ডোবানো হবে। এ বিষয়ে তোমাদের কী বলার আছে, বলো।'

'আমাদের ক্ষতি করলে তোমরাও পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে না এটা জেনে রেখো', রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন জুলিয়াস।

সাপের মতো ফোঁসফোসিয়ে উঠল সামনের গুণ্ডাটি, 'আর একটা কথা বলেছ কি গুলি চালাব আমরা। এখন বলো, হের রেডেলের মৃতদেহ কখন এনে দেব এখানে। জেনে রাখো— আমাদের এ অনুরোধ না রাখলে তোমাদের একজনকেও আর দেশে ফিরতে হবে না, ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকেও আর রক্ষা পেতে হবে না।'

কী আর করি। আমাদের হাত পা বাঁধা। আমি বললাম, 'রেডেলের মৃতদেহ আজ বিকেলে এখানে নিয়ে এসো। তার আগে আমাদের তৈরি হতে হবে। তবে পরশু সকালের আগে রেডেল বেঁচে উঠবে না, কারণ প্রক্রিয়াটা জটিল।'

গুণ্ডার দল আরেকবার আমাদের শাসিয়ে চলে গেল। জুলিয়াস বললেন, 'গিলেটের খবরটা সাংবাদিকদের দেওয়া যে কী ভুল হয়েছে। খবরটা প্রচার না হলে এরা জানতে পারত না। আর রেডেলের মৃত্যুতে হিটলারপন্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। ইনগোলস্টাটে ইহুদি বিদ্বেষের শেষ হত।'

২৬ জুন, রাত বারোটা

ঘুম আসছে না। এমনভাবে এই নৃশংস দলের কাছে আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে এটা ভাবতেও মনমেজাজ বিষিয়ে যাচ্ছে। অথচ কী করা যায়? একটা উপায় আমি ভেবে বার করেছি, কিন্তু তাতে কী ফল হবে সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ছাড়া বোধ হয় রাস্তা নেই। এতে জুলিয়াসের সাহায্য দরকার হবে। যদি এটা সফল হয় তা হলে সব দিক দিয়েই মঙ্গল হবে, এবং আমারও কপালে জয়তিলক আঁকা হবে। এর আগে নানান সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি; এবার হবে চরম পরীক্ষা।

২৮ জুন

আগে রেডেলের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির ঘটনাটা বলি।

আমাদের নির্দেশমতো রেডেলের দলের পাঁচ জন লোক তার মৃতদেহ গত পরশু বিকেলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কাস্‌লে নিয়ে আসে। লোকটার চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, সে এত নিষ্ঠুর। মোটামুটি সাধারণ চেহারা, বয়স চল্লিশের বেশি না। আমি রেডেলের লোকদের বললাম, মৃতদেহটা ল্যাবরেটরিতে ইস্পাতের খাটের উপর শুইয়ে দিতে। তারপর বললাম, 'খাটে শুইয়ে দিয়ে তোমরা এখন চলে যাও, পরশু ভোরে এসো। রেডেল যে বেঁচে যাবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু তোমরা যদি রিভলভার নিয়ে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা ঘিরে থাক, তা হলে আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। আমাদের উপর তোমাদের কিছুটা বিশ্বাস রাখতে হবে। পরশু সকালে এসে যদি দেখ রেডেল তখনও মৃত, তা হলে তোমাদের যা করবার কোরো। একটা মৃতদেহ যখন বেঁচে উঠেছে, তখন এটাও না বাঁচার কোনও কারণ নেই।'

সৌভাগ্যক্রমে রেডেলের দলের লোকেরা আমাদের কথার উপর ভরসা করে চলে গেল। এখানে বলে রাখি যে, আমার মারাত্মক অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা আমি সঙ্গে আনিনি, কারণ আমার কোনও ধারণা ছিল না যে আমাদের এমন বিপদে পড়তে হতে পারে। অ্যানাইহিলিন থাকলে রেডেলের পুরো দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছিল এক মুহূর্তের কাজ।

রেডেলের লোকেরা চলে গেলে পর আমি জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে একটা প্রশ্ন করলাম।

'এখানে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে পারে এমন সার্জন আছে? খুব ভালো লোক হওয়া চাই।'

জুলিয়াস বললেন, 'আছে বই কী। হাইনরিখ কুমেল জার্মানির একজন বিখ্যাত ব্রেন সার্জন। তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে।'

এবার আমি বললাম, কেন আমি এই প্রশ্নটা করছি।

'রেডেলের মৃতদেহকে আমি ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন যে পদ্ধতিতে মরা মানুষ বাঁচিয়ে ছিলেন, সেই পদ্ধতিতে বাঁচাতে চাই। অর্থাৎ, এতে আমার একটি মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে, যা রেডেলের মস্তিষ্কের জায়গায় তার মাথায় পুরতে হবে। এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় আলোচনা

আছে।'

আমি ক্রোল আর সন্ডার্সকে ব্যাপারটা জানতে দিতে চাচ্ছিলাম না, তাই জুলিয়াসকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে আমার পরিকল্পনাটা বললাম। জুলিয়াস বলল আমাকে সবরকমে সাহায্য করবে। জুলিয়াসের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল, কারণ আমরা তো এখানে বিশেষ কাউকেই চিনি না। আর প্রাচীন পরিবারের বংশধর হিসেবে জুলিয়াসের এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

আমাদের আর রাত্রে ডিনার খাওয়া হল না। সন্ডার্স আর ক্রোল দুজনেই ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত। বলছে, 'তুমি কী উপায় স্থির করেছ, সেটা আমাদের বলছ না কেন?'

আমি বললাম, 'আমি নিজেই জানি না আমার পরীক্ষার ফলাফল কী হবে। কিছুটা অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছি। তবে যা হবার সে তো তোমরা পরশু সকালেই দেখতে পাবে।'

পরদিন দশটার সময় ডাঃ কুমেল এলেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে, একটা কাচের বয়ামে স্পিরিটে চোবানো একটা মস্তিষ্ক নিয়ে। সাড়ে এগারোটার মধ্যে রেডেলের মস্তিষ্ক বার করে নিয়ে তার জায়গায় নতুন মস্তিষ্কটা ঢোকানো হল। এত নিপুণ ও দ্রুত অস্ত্রোপচার আমি কমই দেখেছি। কুমেল শুধু বললেন যে, তাঁর কাজের বিনিময়ে তিনি আমাদের পুরো এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে চান,

পয়সায় তাঁর দরকার নেই। আমরা অবশ্য এককথায় রাজি হয়ে গেলাম।

বারোটার সময় ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গবেষণাগারে আমাদের কাজ শুরু হল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছি। যদি মানবের জায়গায় দানবের সৃষ্টি হয়, তা হলে যে কী হবে জানি না।

সারারাত কাজ করার পর সকাল সাতটায় রেডেলের দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। গিলেটের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, এর বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। এবং প্রথম যে প্রশ্ন করল রেডেল জার্মান ভাষায়— তা-ও ঠিক গিলেটেরই প্রশ্ন, 'আমি কোথায় রয়েছি?'

আমি এগিয়ে গিয়ে জার্মান ভাষায় বললাম, 'তুমি চারদিন ঘুমিয়েছিলে। আজ তোমার ঘুম ভেঙেছে। তুমি রয়েছ ব্যারন জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ল্যাবরেটরিতে।'

'জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?'

‘হ্যাঁ।’

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার হঠাৎ দেখলাম ঘরে আরও লোক রয়েছে। আমাদের পিছনেই হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেডেলের দলের দুজন গুণ্ডা। রেডেলকে জীবিত দেখে তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত।

এবার রেডেলের চোখ গেল এই গুণ্ডাদের দিকে। সে বলল, ‘এ কী, এরা কী করছে এখানে?’

এর ফল হল অদ্ভুত। গুণ্ডাদের একজন বোকার মতো মুখ করে বলল, ‘আমি এমিল, হের রেডেল— তোমার দলের লোক!’

অন্য লোকটিও তার দেখাদেখি বলল, ‘আমি পিটার, হের রেডেল— তোমার অনুচর!’

পুনর্জীবনপ্রাপ্ত রেডেল গর্জিয়ে উঠল, ‘দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে! তোমরা সব শয়তানের দল। তোমাদের জন্যই জার্মানি আবার জাহান্নামে যেতে চলেছে। এক্ষুনি চলে যাও আমার সামনে থেকে!’

পিটার ও এমিল নামক দুই গুণ্ডা হতভম্বের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সন্ডার্স ও ক্রোল আমাকে এসে চেপে ধরল, ‘কী ব্যাপার, আমাদের খুলে বলো।’

আমি বললাম, ‘আগে রেডেলের বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা করে নিই।’

আমি রেডেলকে কমলালেবুর রস খাইয়ে আবার শুইয়ে দিলাম। তারপর ক্রোল আর সন্ডার্সের দিকে ফিরে বললাম, ‘জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সাহায্য না করলে আমার এই এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হত না।’

‘কিন্তু কার মগজ পোরা হয়েছিল রেডেলের মাথায়?’ প্রশ্ন করল ক্রোল।

আমি বললাম, ‘বোরিস অ্যারনসন, যাঁকে রেডেলের দল হত্যা করেছিল। জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অ্যারনসনের ছেলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পুলিশকে জানিয়ে অ্যারনসনের কবর খুঁড়ে তাঁর মৃতদেহ বার করে ডাঃ কুমেলকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়ে তাঁর মগজ বার করেন। সেই মগজই রেডেলকে নতুন মানুষে পরিণত করেছে। সে আর আগের রেডেল নেই। যতদূর মনে হয়, হিটলারপন্থী দল এবার নিশ্চিহ্ন হবে।’

জুলিয়াসের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখে জল। তিনি আবার এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, ‘জার্মানি তোমার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।’

আমি বললাম, ‘সবই তোমার পূর্বপুরুষের কীর্তি। এর জন্যে যদি কারও ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়ে থাকে, তা হলে তিনি হলেন ব্যারন ভিক্টর

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।’

১৩ জুলাই

দেশে ফিরে এসে কালই জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি জানিয়েছেন, রেডেল এখন নিজেকে ইহুদি বলে পরিচয় দেয়। তার দল ভেঙে গেছে, ইনগোলস্টাটের ইহুদিরা এখন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বাস করছে।

চন্দিরা



ব্রায়ান মুনি

অনুবাদ : প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

(১)

'...কী ভাবছ সাহেব?' গাঢ় স্বরে বললেন আদিত্যনাথ। তারপর মন্দ্র স্বরে সম্মোহনী সুরে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন-

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্র স্তনাভ্যাং...

'কুসুম ছিল তেমন। চোখে হরিণের দৃষ্টি, ছোট ছোট নিখুঁত দাঁত। সরু কোমর, স্তনযুগলের ভারে একটু ঝুঁকে হাঁটত। গুরু নিতম্বিনী কুসুমের চলন ছিল মদমত্ত হস্তীর মতো। আবার পারুল ছিল মরাল গামিনী। লম্বা লম্বা পা দিয়ে রতিক্রীড়ার সময়ে আমাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরত, যেন নাগপাশ! হা হা হা!'

অট্টহাসির শব্দেই মনে হয় ঘুম ভেঙে কোনওরকমে উঠে বসলাম। এখনও কানে বাজছে অট্টহাসি আর চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাচ্ছি আদিত্যনাথের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বেলফাস্টের এই প্রবল শীতেও দরদর করে ঘামছি।

কতদিন হয়ে গেল? তা প্রায় পঞ্চাশ বছর তো হবেই। এখন আমার বয়স পঁচাত্তর। ইন্ডিয়া থেকে চলে এসেছি তা তো প্রায় দুই দশক আগে! তবু এখনও স্বপ্নে আসেন আদিত্যনাথ! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই তো সেদিন...

বিছানা থেকে উঠে জানলার পাশে রাখা আরামকেদারায় বসলাম। আজ রাত্রে হয়তো আর ঘুম আসবে না। জানলার পর্দা সরিয়ে দিলাম। ভারি মনোরম দৃশ্য। তুষারপাত হচ্ছে। আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদে তুষারের সাদা আস্তরণ। রাস্তাটাও ঢেকে গেছে সাদা চাদরে। চাঁদের নীলচে আলো পুরো চরাচরে ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন একটু একটু ঠান্ডা লাগছে। মনটা শান্ত হতেই প্রকৃতিদেবীর উপস্থিতি টের পেলাম। ফায়ারপ্লেসের আগুনটা একটু উস্কে দিয়ে সেলার থেকে মল্ট হুইস্কির বোতলটা নিয়ে বসলাম। এই বৃদ্ধ বয়সে ফায়ারপ্লেসের

আগুন আর হুইস্কির মধ্যে উষ্ণতা খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ে যায় যৌবনের দিনগুলোর কথা। সেই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানখেত, নীল আকাশ। নদীর পাড়ে কত নাম না জানা ফুল ফুটে আছে। আমি আর আমার দেহরক্ষী মুস্তাক খাঁ ঘোড়ায় চড়ে প্রশাসনিক কাজ করতে বেরিয়েছি। খাজনা এবং অন্যান্য কর আদায় করা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি ছিল আমার কাজ। রোজকার একঘেয়ে কাজ সেরে কোনও কোনও দিন বিকেলে শহরে ইউরোপিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাবে যেতাম। নেটিভদের সেইসব ক্লাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

ক্লাবের রোজনামচাও অবশ্য অল্পবিস্তর একঘেয়েই ছিল। নেটিভদের কীর্তিকলাপ, কার ডিসট্রিক্টে বিপ্লবীদের আনাগোনা বাড়ছে, কিংবা কে জীবনের বাকি ক'টা দিন এই দেশেই কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন, এইসব নিয়ে আলাপ আলোচনা হত। সদ্য সদ্য যারা দেশ থেকে প্রথমবার ভারতে এসেছেন তাঁরা আবার ইন্ডিয়ান ফকিরদের জাদুবিদ্যা, দড়ির জাদু এইসব নিয়ে খোঁজখবর নিতেন।

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক্স! তখন ইউরোপে খুব সাড়া ফেলেছিল। তবে আমার মনে হয় এটা শুধুই মিথ। আমি বহু গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছি, অনেক রকম খেলা দেখেছি। কিন্তু এই খেলা কোথাও দেখিনি। গ্রাম্য ফকির কিংবা সাধুদের অনেক রকম জাদুর খেলা দেখেছি বটে, কিন্তু অলৌকিক বলে মনে হয়নি কোনওটাকেই।

তবে একজন... একজন ঋষির দেখা পেয়েছিলাম। উচ্চমার্গের সাধক। তাঁর ক্ষমতা সামান্য জাদুবিদ্যা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিল এক পরাবাস্তব জগতে। বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা মেলে না। আদিত্যনাথ। তাঁর কথা মনে পড়লেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত আজও বয়ে যায়!

আদিত্যনাথের ঘটনা কেউ জানে না। আমিই বলিনি, কারণ কেউ হয়তো আমার বিশ্বাস করত না। কিন্তু আজ আমি এইসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কী যায় আসে! আর ক'টা দিনই বা বাঁচব?

তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি। তখন আমার বয়স ২৩-২৪। আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা পুনে শহরে। বাবা ছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের জজ। পুনে থেকে সাব-ডিসট্রিক্ট অফিসারের চাকরি নিয়ে এলাম ঢাকা শহরে। ঢাকা থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে চট্টগ্রাম নামের এক জায়গায় আমাকে

পাঠানো হল। চট্টগ্রামের আনুমানিক দুই কী তিনশো বর্গমাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে সেই সমস্ত গ্রামের শাসনভার আমার ওপরে ন্যস্ত হল। আমার উপরওয়ালা হলেন ব্রায়ার্ন টেলর। দুই-তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর তিনি আমার কাজের খতিয়ান নিতেন, পরামর্শ দিতেন। মাঝে মাঝে একসঙ্গে আমরা বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনেও যেতাম। তবে বেশির ভাগ সময়ই আমি একাই যেতাম, আর আমার ছায়াসঙ্গী ছিল বছর পঞ্চাশের বেলুচি পাঠান মুস্তাক খান। আমার দেহরক্ষী।

ব্রায়ার্ন টেলরের সঙ্গে একদিন পরিদর্শনে বেরিয়েই আমি প্রথম ঋষি আদিত্যনাথের কথা শুনি। সারাদিনের কাজের শেষে আমরা বাংলোয় ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ব্রায়ার্ন একটা চুরুট ধরিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'তারপর বলো রওয়ান, তোমার তো এখানে প্রায় ছয়-সাত মাস হয়ে গেল। তা তুমি কাঁটাচারি গিয়েছ একবারও?'

আমি ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলাম। কাঁটাচারি! নামটা একটু শোনা শোনা লাগছে বটে। আমার এই বাংলো থেকে মাইল চারেক দূরের একটা ছোট্ট গ্রাম।

'না! কাঁটাচারি এখনও যাইনি। আমি সাধারণত একটু দূরের গ্রামগুলো আগে ভিজিট করছি! কিন্তু কাঁটাচারিতে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে নাকি? যতদূর জানি, গ্রামটা ছোট্ট। তা ছাড়া গ্রামের আশপাশে বেশির ভাগই জঙ্গল, নীলচাষের পর্যাপ্ত জমিও নেই। তাই আর ওদিকে যাওয়া হয়নি।'

ব্রায়ার্ন আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর আধখাওয়া চুরুটটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি একবার ঘুরেই এসো কাঁটাচারি। ওখানের জমিদার গোকুল আমার পূর্বপরিচিত। তাকে আমার কথা বোলো। তবে শুধু গোকুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি তোমাকে যেতে বলছি না। গ্রামে এক হিন্দু সাধু বছর পাঁচেক আগে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর নাম আদিত্যনাথ। লোকে বলে তাঁর বয়স নাকি প্রায় ২৫০ বছর।'

আমি খুব অবাক হয়ে ব্রায়ারনের দিকে তাকালাম। ব্রায়ার্ন একজন অভিজ্ঞ এবং শিক্ষিত অফিসার। অন্তত ৩০ বছর তিনি এই দেশে আছেন। গ্রাম্য লোকজনের মধ্যে অনেক অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রচলিত থাকে। কিন্তু ব্রায়ার্ন তো সেইসব মেনে নেওয়ার মানুষ নন!'

ব্রায়ার্ন আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি

জানি তুমি কী ভাবছ! ইন্ডিয়াতে সাধু, ঋষিদের তো অভাব নেই। আর সাধারণ লোকে বিশ্বাসও করে যে, সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু, আদিত্যনাথ... আদিত্য সত্যিই আলাদা। জানি না সত্যিই ওঁর বয়স ২৫০ বছর কি না... সত্যি বলতে কী আমি সেটা বিশ্বাসও করি না... কিন্তু তবু আদিত্যের সামনে দাঁড়ালেই কীভাবে যেন ওঁকে অবিশ্বাস করার সাহসটা আমি হারিয়ে ফেলি... আদিত্য যেন সেই নদীর মতো, দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় না কতটা গভীর— আবার গভীরতা মাপতে গিয়ে ঝাঁপও দেওয়া যায় না ডুবে যাওয়ার ভয়ে...'

ব্রায়ার্ন টেইলর আর কিছু বললেন না। আরেকটা চুরুট ধরিয়ে জিন খেতে লাগলেন। আমিও মুস্তাক খানকে ডিনার সার্ভ করতে বললাম।

(২)

অপূর্ব দৃশ্য! ঘন জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো যেন গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মতো এসে মাটিতে বিঁধছে। গাছে গাছে বুনো টিয়ার হুটোপাটি আর মৌমাছির একটানা গুনগুন শব্দ। ব্রায়ার্ন টেলরের সঙ্গে সেদিনের কথাবার্তার পর খুবই কৌতূহল হচ্ছিল। তাই দিন তিনেক পরে আজ রওনা দিয়েছি কাঁটাচারির দিকে। গ্রামটার আধ মাইল আগে বেশ একটা গভীর জঙ্গল মতো আছে।

'কী হে মুস্তাক? গ্রাম আর কতদূর?'

'প্রায় চলেই এসেছি হুজুর। এই জঙ্গলের সীমানা পেরোলেই গ্রাম।' মুস্তাক লোকটা বড়ো ভালো। বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স হবে, যদিও দেখলে বোঝা যায় না! প্রায় সওয়া ছ'ফুট লম্বা। চওড়া কাঁধ, বুকটা জমিদারবাড়ির সিংহ দরজার মতোই বিশাল। আমার সঙ্গে সঙ্গে যখন আরবি ঘোড়ায় চেপে যায়, ঝকঝকে ইউনিফর্ম—কোমরে রবার্ট মোল অ্যান্ড সন্স-এর তরোয়াল আর কাঁধে মার্টিনি হেনরি রাইফেল, সাধারণ লোকজনের মনে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় বইকি। অবশ্য দেখতে যেমনই হোক, লোকটা খুব সহজ-সরল আর ভীষণ ধার্মিক।

আস্তে আস্তে জঙ্গল পাতলা হয়ে গেল। আমরাও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। শীতের সকাল, সুন্দর রোদ উঠেছে। বাচ্চারা ঘরের উঠোনের সামনে খেলছে। বাড়ি-ঘরগুলো বেশ ফাঁকা ফাঁকা, মাঝে লাল-হলুদ বুনো ফুল ফুটে আছে। দু'একটা প্রাচীন বটগাছ, বাঁশঝাড় চোখে পড়ল। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ দেখতে পেলাম, তাতে মনে হয় শালিখ বাসা করেছে। একটু

দূরে উঁচু শিমুল গাছের ডালে একটা চিল বসে আছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রামের মাঝখানে একটা বাঁধানো জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। সাধারণত বাংলার প্রায় সব গ্রামেই এরকম মন্দিরসংলগ্ন জায়গা থাকে, যেখানে গণ্যমান্য লোকেরা এসে আড্ডা জমান এবং আলাপ আলোচনা করেন।

আমাদের আগমন সংবাদ ততক্ষণে চাউর হয়ে গেছে। চণ্ডীমণ্ডপে একটা ছোটখাটো জটলা। ভিড়ের মধ্যে থেকে শৌখিন দেশীয় পোশাক পরিহিত গৌরবর্ণ এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন।

'নমস্কার রওয়ান সাহেব! কাঁটাচারি গ্রামে আপনাকে স্বাগত। আমি গোকুল, এখানকার জমিদার।' ভদ্রলোক হাতজোড় করে ভারতীয় কায়দায় আপ্যায়ন করলেন। 'আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম কবে আপনার সঙ্গে আলাপ হবে! ব্রায়ার্ন সাহেব কেমন আছেন?'

'আরে গোকুল, সাহেব এতটা পথ ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, ওঁকে আগে বসতে দাও।' এক পক্ককেশ বৃদ্ধ বলে উঠলেন।

আমি সৌজন্যমূলক হাসি হাসলাম। খুব আন্তরিক এখানকার গ্রাম বাংলার মানুষরা। গোকুল আমাকে এক এক করে গ্রামের বাকি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল। শুধু কয়েকজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা বিধর্মীদের ছায়াস্পর্শ করেন না।

'গোকুল, উনি মনে হয় এইসব একঘেয়ে আলোচনায় বিরক্ত হচ্ছেন!'

চণ্ডীমণ্ডপের হালকা গুঞ্জন এক লহমায় থেমে গেল। শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদা ধুতি। এবং এই শীতেও গায়ে একটা পাতলা চাদর। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লম্বা সাদা চুল। দাড়ি প্রায় বুক স্পর্শ করেছে। মোটা এবং জোড়া ভ্রু। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বলে দিতে হয় না ইনিই আদিত্যনাথ।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের চাতাল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। গোকুল শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'ইনি আদিত্যনাথ। আমাদের গ্রামে কিছুদিন...'

'উনি জানেন আমি কে। এবং উনি আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন। তাই তো রওয়ান সাহেব?' আদিত্যনাথ মৃদু হেসে আমার চোখের দিকে তাকালেন।

চোখাচোখি হতেই আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। হঠাৎ বরফ গলা জলে ঝাঁপ দিলে যেমন হয়। প্রত্যুত্তরে আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। সাধারণত যেটা করি না। কিন্তু ভদ্রলোকের

চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখের মণিটা একটু বড় আর প্রায় গোটা চোখে ছড়িয়ে পড়েছে বলে ভ্রম হয়। অসমান ব্লটিং পেপারে একফোঁটা কালি ফেললে যেমন সেটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়, পুরো গোলাকার থাকে না, অনেকটা সেইরকম।

'রওয়ান সাহেব, এখানে বড্ড ভিড়। চলুন এই গরিবের কুটিরে বসে একটু আলাপটা সেরে নেওয়া যাক। কি গোকুল, আপত্তি নেই তো?'

আদিত্যনাথ মৃদু গলায় কথা বললেও কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট।

'না না, আপত্তির কী আছে!' গোকুল কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম। ততক্ষণে আমি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছি। 'চলুন আপনার বাড়িতে বসা যাক। মুস্তাক তুমি এখানেই অপেক্ষা করো।' মুস্তাক মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। গ্রামের বাকিরাও আর কিছু বললেন না। বোঝাই যায় আদিত্যনাথ একটু বেশিই সম্মান পেয়ে থাকেন, সেটা কতটা ভয়ে আর কতটা শ্রদ্ধায় তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

গ্রামের একপ্রান্তে আদিত্যনাথের কুঁড়ে ঘর। একদম জঙ্গলের সীমানায় বলা যায়। ঘরটা একটু অদ্ভুত। সাধারণত গ্রামের বাড়িগুলোর ভিত একটু উঁচু করে বানানো হয়। দু'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা মতো থাকে। সেটা ঘিরেই একটা বা দুটো ঘর। কিন্তু আদিত্যনাথের বাড়ি একদম উলটো পদ্ধতিতে বানানো। একটা বৃত্তাকার জমির মাটি খুঁড়ে ফেলে বাকি রাস্তা থেকে সেটাকে নিচু করে ফেলা হয়েছে। এবং সেই নিচু জমিতেই ঘরটা বানানো। আর পাঁচটা গ্রামের বাড়ির থেকে আকারে বড়ো, কিন্তু দরজা খুব ছোট! আন্দাজ সাড়ে চার ফুট উচ্চতা হবে।

দরজার সামনে এসে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন আদিত্যনাথ। তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও পিছু পিছু মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

ঘরটা খুবই সাধারণ। দেওয়াল কুলুঙ্গিতে মৃৎপাত্রে রাখা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। জানলায় সরু এবং লম্বা করে কাটা কাপড়ের ফালি ঝোলানো। খুব সম্ভব ওগুলোতে সুগন্ধী দেওয়া আছে, জানালা দিয়ে আসা বাতাস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। ঘরে একটা নিচু কাঠের চৌকি আর বাঁশ কেটে বানানো একটা উঁচু টুলের মতো বসার জায়গা।

কোথায় বসব ভেবে আমি ইতস্তত করছিলাম। আদিত্যনাথ টুলের ওপরে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে চৌকির ওপরে পদ্মাসনে বসলেন।

তারপর গলা তুলে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকলেন। 'চন্দিরা! চন্দিরা!'

রান্নাঘর থেকে এক তরুণী দ্রুতপায়ে ঘরে প্রবেশ করল। সাদা বোরখা পরা। মুখও অর্ধেকটা ঢাকা। আমি একটু অবাক হলাম। তরুণী কি মুসলিম? হিন্দু মুসলিম বিবাহ একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই বিরল তো বটেই।

'আমার সহধর্মিণী, চন্দিরা।' আদিত্যনাথ আলাপ করিয়ে দিলেন। 'যাও, অতিথির জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।' তরুণী দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিত্যনাথ পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করলেন। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। খাবার না আসা পর্যন্ত উনি কথা বলতে চান না। লোকটার ব্যবহার খুবই অদ্ভুত! যাই হোক, আমিও একটু সময় পেলাম ওঁকে আরেকটু খুঁটিয়ে স্টাডি করার। নাকি এটাই উনি চাইছিলেন?

যদিও ওঁকে দেখে কিছুতেই আমার ২৫০ বছর বয়স বলে মনে হচ্ছিল না। খুব বেশি হলে ৫৫-৬০ হবে হয়তো। এবং ওঁর স্ত্রীয়ের মুখ ঢাকা থাকলেও ২৪-২৫ এর বেশি বয়স হবে বলে আমার মনে হয়নি। ভারতবর্ষে অবশ্য স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বয়সের এইরকম ফারাক তখনকার দিনে বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

অল্পক্ষণ পরেই চন্দিরা এসে কলাপাতায় কিছু মরসুমি ফল আর দুধ এবং নারকেল দিয়ে তৈরি মিষ্টিজাতীয় জিনিস পরিবেশন করল। তারপর ঘরের এক কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মাটিতে বসল। চন্দিরার মুখ এখন আর ঢাকা ছিলনা। মেয়েটি বেশ রূপবতী। বড় বড় চোখ। ধনুকের মতো ভ্রু।

'আপনার স্ত্রী কি মুসলিম?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস না করে আর পারলাম না।

আদিত্যনাথ হেসে উঠলেন। 'না না, মুসলিম কেন হবে। চন্দিরা হিন্দু। তা রওয়ান সাহেব, আপনি কি বিবাহ করেছেন?'

'না।' আমি উত্তর দিলাম। 'আমাদের মধ্যে খুব কম বয়সে সাধারণত বিয়ে হয় না। আগে চাকরিতে উন্নতি করি, তারপর না হয় ওসব নিয়ে ভাবা যাবে।'

'খুবই অদ্ভুত।' আদিত্যনাথ একটা ফলের টুকরো মুখে দিয়ে বললেন। 'রওয়ান সাহেব, আপনাদের মতো গোরা যুবকরা আমাদের এই দেশটা চালাচ্ছে। কত গুরুদায়িত্ব সামলান আপনারা। অথচ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি, কাম! তাকেই উপেক্ষা করেন? বলুন রওয়ান সাহেব, সারাদিনের কাজের শেষে রাত গভীর হলে কোনও নগ্ন নারীদেহের স্পর্শ পেতে কি ইচ্ছা

করে না আপনার?

আদিত্যনাথের বলার ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। ক্ষণিকের জন্য কোনও কোনও হিন্দু মন্দিরের গায়ে খোদাই করা সঙ্গমরত নরনারীর মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

'ক্ষমা করবেন, বাবু আদিত্যনাথ।' আমি গলায় যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে উত্তর দিলাম। 'এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে আমি ঠিক প্রস্তুত নই।'

'তাই?' আদিত্যনাথ হেসে উঠলেন। নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলেন। 'তোমরা শাসক জাতি, তোমাদের রাজত্বে নাকি সূর্য কখনও অস্ত যায় না? প্রায় গোটা পৃথিবীর মানুষের প্রভু তোমরা, কিন্তু মানুষ মাত্রেই যার দাস সেই রিপু নিয়ে আলোচনাতেই তোমাদের এত অনীহা? আচ্ছা তোমার কথা থাক, আমি আমার কথা বলি।

জীবনে বহুবার বিবাহ করেছি আমি। এক-একটি নারী যেন এক-একটি আধার, ইন্দ্রিয়সুখ সঞ্চয় করার।

কী ভাবছ সাহেব?' গাঢ় স্বরে বললেন আদিত্যনাথ। তারপর কেমন যেন একটা মন্দ্র স্বরে সম্মোহনী সুরে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন-

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং...

'কুসুম ছিল তেমন। চোখে হরিণের দৃষ্টি, ছোট ছোট নিখুঁত দাঁত। সরু কোমর, স্তন যুগলের ভারে একটু ঝুঁকে হাঁটতো। গুরুনিতম্বিনী কুসুমের চলন ছিল মদমত্ত হস্তীর মতন। আবার পারুল ছিল মরালগামিনী। লম্বা লম্বা পা দিয়ে রতিক্রিয়ার সময়ে আমাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরত, যেন নাগপাশ!

রাধিকা ছিল এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের মেয়ে। গায়ের রং শঙ্খের মতো সাদা। চোখ পদ্মের মতো। স্তন গভীর, কোঁকড়ানো চুল। নাসারন্ধ্র ছোট, গীতবাদ্যে পারদর্শিনী।

কুমুদকে যখন বিবাহ করি তখন সে সদ্য কুমারী থেকে যুবতী হয়েছে। সে ছিল দীর্ঘাঙ্গী। দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন, দীঘল চরণ, দীঘল পাণি! কুমুদের সারা গায়ে একটুও রোম ছিল না। শুধু নাভির নীচে নবরোমরাজির আভাস। যেন স্বর্গের প্রবেশপথে পারিজাত ছড়ানো, রওয়ান সাহেব,

পারিজাত!'

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আদিত্যনাথ যে এইভাবে খোলাখুলি নিজের অতীত যৌনজীবন নিয়ে অক্লেশে কথা বলবেন, তা-ও নিজের বর্তমান স্ত্রীর উপস্থিতিতে, সেটা আমি ভাবতেই পারিনি! আমি অপ্রস্তুত হয়ে চন্দিরার দিকে তাকালাম।

আদিত্যনাথের বুঝতে অসুবিধা হল না আমি কী বলতে চাইছি। হেসে বললেন, 'চন্দিরা আছে বলে সঙ্কোচ করবেন না। ও আমার সাধনসঙ্গিনী। আর সাধনমার্গে শরীর ও কামকে আমরা অবহেলা করি না।

তারপর যা বলছিলাম। ফুলন আর শামীমের হাত আর পা ছিল বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত। ওদের ভূমি ছিল উর্বর। আমার সবথেকে বেশি সন্তান ওঁদের গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়। হরপাল ছিল অন্ধ এবং বধির। কিন্তু ওর বাকি ইন্দ্রিয়গুলো সাধারণ মানুষের থেকে অন্তত দশগুণ বেশি প্রখর ছিল।'

আদিত্যনাথ থামলেন। একটা ফলের টুকরো মুখে দিয়ে বললেন, 'এরাই ছিল বাকি স্ত্রীদের মধ্যে আমার সবথেকে বেশি পছন্দের।'

আমার অপ্রস্তুত ভাব তখনও কাটেনি। সেটা লুকোনোর জন্য আমি বললাম, 'কিন্তু একজন মানুষ নিজের জীবদ্দশায় কতবার বিয়ে করতে পারে? আপনি কি বহুবিবাহ করতেন?'

আদিত্যনাথ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানলেন। 'তুমি নিশ্চয় আমার বয়স জানতে চাইছ, রওয়ান সাহেব? টেলর সাহেবের কথা নিশ্চয় তোমার বিশ্বাস হয়নি। তোমারই বাংলোয় বসে তামাক সেবন করতে করতেই তো তিনি তোমায় জানিয়েছিলেন যে, আমার বয়স প্রায় ২৫০ বছর! না না, চমকে ওঠার প্রয়োজন নেই। সাধনার পথে কিছু বিশেষ স্তর অতিক্রম করলেই অতি দূরদৃষ্টি জন্মায়। তখন যে ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটছে না তাও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।'

আদিত্যনাথ কখন আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন তা আর খেয়াল করিনি। তবে আমার মনে হচ্ছিল আমার সঙ্গে শুধু গল্প করার জন্যই তিনি আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেননি। এসবই গৌরচন্দ্রিকা। নিশ্চিত তাঁর অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমি খাবারে মনোনিবেশ করলাম। আদিত্যনাথ বলে চললেন-

'...হ্যাঁ, আমার বয়স প্রায় আড়াইশো বছর। সাধনার যে পথ আমি বেছে

নিয়েছিলাম তাতে মৃত্যু এবং বার্ধক্যকে বিলম্বিত করা সম্ভব। বলতে বাধা নেই এই কাজে আমি সফল হয়েছি। কিন্তু মৃত্যুকে বিলম্বিত করা সম্ভব হলেও, তা অবশ্যম্ভাবী। এবং আমার গণনা অনুযায়ী আমার মৃত্যু অতি নিকটে। তাই জীবনের শেষ দিনগুলো শান্তিতে কাটানোর জন্য আমি এই গ্রামে চলে আসি। রওয়ান সাহেব, আমার মৃত্যুর পরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে, এবং সেই অনুরোধ করবার জন্যই আমি তোমাকে আজ নিমন্ত্রণ করেছি।'

'আমি? আমাকে কোনও কাজের ভার দিতে চান? এবং সেটাও আপনার মৃত্যুর পরে করতে হবে? কী সেটা?'

'আমি এখনই তা বলতে অপারগ। আমার মৃত্যুর পরে তুমি নিজেই জেনে যাবে কাজটি কী। এখন এসো, আমার সাধনার সামান্য কিছু নিদর্শন দেখাই তোমাকে।'

আদিত্যনাথ খাট থেকে নেমে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। ঘর থেকে বেরোবার আগে চন্দিরাকে খাবারের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। সে-ও মিষ্টি হেসে ঘাড় নাড়ল।

আদিত্যনাথের সঙ্গে বাড়ির পেছনের দিকে এসে উপস্থিত হলাম। ঘন বাঁশঝাড়ের জঙ্গল বলে ভেতরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার। কিছুটা এগোতেই তীব্র পচা গন্ধ এসে নাকে ধাক্কা মারল।

একটা কুকুরের আধপচা গলা মৃতদেহ। চোখ দুটো নিশ্চয় কাকে ঠুকরে খেয়েছে। সেই স্থানে কালো গর্ত। মুখ হাঁ করা। জিভ অর্ধেকটা নেই। সারা গায়ে পিঁপড়ে থিকথিক করছে। মুখ দিয়ে পিঁপড়ের সারি কুকুরটার দেহের ভিতরে চলে গেছে। বড় বড় নীল মাছি ভনভন করে উড়ছে। চোখের গর্তগুলোর মধ্যে ম্যাগট কিলবিল করছে।

নোংরা দৃশ্য। আমি মুখে রুমাল চাপা দিলাম। আদিত্যনাথ বললেন, 'কুকুরটা যে মৃত সেই বিষয়ে তোমার কোনও সন্দেহ আছে?'

'না! এতে আবার সন্দেহের কী আছে?' আমি অবাক হলাম। 'অন্তত দিন চারেক আগে মরেছে নিশ্চয়।'

'বেশ।' আদিত্যনাথ কুকুরের মৃতদেহটাকে ঘিরে পায়ের নখ দিয়ে একটা বৃত্তাকার দাগ কাটলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের অনামিকা মুঠো করে ধরে আকাশের দিকে কোনাকুনি তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় অতি দ্রুত কোনও মন্ত্রচ্চারণ করতে শুরু করলেন।

নিমেষে দিনের ঝকঝকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনটা যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আকাশে মেঘ করে এল, সূর্যের রংটা সামান্য ঘোলাটে হয়ে উঠল। কয়েকটা দাঁড়কাক কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

পরিবেশটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে আমার মনে হচ্ছিল এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী হয় জানার তীব্র কৌতূহলেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরের মৃতদেহে একটা অদ্ভুত কম্পন শুরু হল। আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলাম। এও কি সম্ভব? কিন্তু আমার সমস্ত যুক্তিতর্কের চিন্তাভাবনাকে ধূলিসাৎ করে কুকুরটা কিংবা বলা ভালো কুকুরের মৃতদেহটা আধখানা জিভ এবং ম্যাগটভরতি চোখের অতলস্পর্শী গহ্বর নিয়ে ঘাড় উঁচু করে আমার দিকে তাকাল।

এখানে আর এক মুহূর্তও নয়! আমি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে জঙ্গল ভেঙে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

(৩)

'সাহেব! আপনি সকালে কী দেখে এত ভয় পেয়েছিলেন?' মুস্তাক খান টেবিলে রাতের খাবার পরিবেশন করতে করতে জিজ্ঞেস করল।

আদিত্যনাথের বাড়ি থেকে আমাকে অমন উদভ্রান্তের মতো ফিরতে দেখে মুস্তাক সত্যিই খুব অবাক হয়েছিল। আমার মুখে ভয়ের ছাপ নিশ্চয়ই ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। আমিও বিশেষ সময় নষ্ট না করে একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম। গোকুল কিছু একটা বলতে এসেছিল বটে, কিন্তু 'দরকারি কাজ আছে তাই ফিরে যাচ্ছি, আবার কিছুদিন বাদে আসব' ইত্যাদি বলে দ্রুত কাঁটাচারি থেকে বেরিয়ে আসি। রাস্তাতেও মুস্তাকের সঙ্গে বিশেষ কথা বলিনি।

এখনও কোনও জবাব দিলাম না। রাতে ভালো ঘুম হল না। সারারাত স্বপ্নে পচাগলা জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখে চমকে চমকে ঘুম ভেঙে গেল।

অন্তত এক সপ্তাহ লাগল নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিতে। ব্রায়ার্নকে কাঁটাচারি গ্রাম ভিজিট নিয়ে রিপোর্টও পাঠিয়ে দিলাম। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই কুকুরটার কথা রিপোর্টে লিখিনি। তারপর বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাঁটাচারি গ্রামের স্মৃতিও ফিকে হয়ে উঠতে লাগল। নিজের মনকে নিজেই বোঝালাম যে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি, নিশ্চয়ই আদিত্যনাথ খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেজন্যেই সম্ভবত আমার দৃষ্টিভ্রম হয়ে

থাকবে।

আরও মাস চারেক পরের কথা। সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যায় বাংলোয় ফিরেছি। কড়া করে একটা পানীয় বানিয়ে চেয়ারে বসতেই ধূপ-ধুনোর সঙ্গে অপরিচিত কোনও ফুলের গন্ধ পেলাম। কিন্তু এই গন্ধটা আমার খুব চেনা! এই গন্ধের সঙ্গে কোনও স্মৃতি জড়িত, যেটা আমি কিছুতেই মনে করতে চাই না। হঠাৎ মনে হল ঘরের কোণে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চমকে তাকিয়ে দেখি আদিত্যনাথ দু-হাত জোড় করে আমার নমস্কার জানাচ্ছেন। পরনে সেই সেদিনের মতো সাদা চাদর আর ধুতি।

দৃশ্যটা এতই অসম্ভব যে, চিৎকার করে উঠতেই ঘুমটা ভেঙে গেল! কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতেই পারিনি। তাহলে স্বপ্নই দেখছিলাম হয়তো। কিন্তু স্বপ্ন কী এত বাস্তব হয়? এমনকি সেই গন্ধটাও এখনও নাকে লেগে আছে। এখন মনে পড়েছে, আদিত্যনাথের ঘরেও এই গন্ধটাই ছিল।

'সাহেব এইমাত্র একটা খবর এসেছে।' মুস্তাক ঘরে এসে লম্বা স্যালুট ঠুকল। 'কাঁটাচারি গ্রামে আদিত্যনাথ দেহত্যাগ করেছেন। শোনা যাচ্ছে ওঁর স্ত্রী নাকি সতী হবে!'

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। এইমাত্র আমি আদিত্যনাথকে স্বপ্নে দেখলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মৃত্যু সংবাদ এল! এটা কি নিছকই কাকতালীয় নাকি সত্যিই ওঁর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে? কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, চন্দিরা সতী হবে!

সতী মানে সতীদাহ প্রথার কথা কে না শুনেছে। ভারতবর্ষের অন্যতম বর্বর এবং অমানবিক ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল এই সতীদাহ প্রথা। কিন্তু বছর কুড়ি আগেই তো আইন করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে! ব্রিটিশ সরকার এই আইন পালনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। আর কাঁটাচারি যেহেতু আমার ডিভিশনেই পড়ছে...

'আমরা কাল সকালে কাঁটাচারি যাব মুস্তাক।'

'জি, হুজুর!'

(৪)

পরদিন সকালে কাঁটাচারি পৌঁছতে আগের বারের মতো আন্তরিক অভ্যর্থনা আর পেলাম না। ধর্মপালনের ব্যাপারে গ্রামের লোকেরা খুবই গোঁড়া। ভণিতা না করে সরাসরি গোকুলকে বললাম চন্দিরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

‘কিন্তু চন্দিরা শোকাতুর, আর ওর শরীরও ভালো নেই। তা ছাড়া আপনার... ওর সঙ্গে কী প্রয়োজন থাকতে পারে!’

‘গোকুল।’ আমি সৌজন্যের খোলস ছেড়ে প্রশাসকের মুখোশ পরে নিলাম। ‘আমি জানি তোমরা আমাকে কী লুকোচ্ছ। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট অফিসার হিসেবে কোনও রকম বেআইনি কাজ আটকানো আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আমি চন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। মুস্তাক, দেখো আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে!’

মুস্তাক উত্তরে নিজের গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে নিল। আমি আদিত্যনাথের বাড়ির দিকে এগোলাম।

ঘরের সামনেই চন্দিরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ‘আসুন সাহেব।’ ম্লান হেসে বলল চন্দিরা। দ্বিতীয়বারের জন্য আদিত্যনাথের ঘরে প্রবেশ করলাম।

কিছুই বদলায়নি। শুধু সেই চেনা গন্ধটার সঙ্গে একটা হালকা পচা গন্ধও যেন পাচ্ছিলাম। কালই আদিত্যনাথের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর গন্ধ কি? কিন্তু ওঁর মৃতদেহই বা কোথায়? আমি ঘরের চারদিকে তাকালাম।

‘ওঁর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনি বসুন।’ চন্দিরা বাঁশের টুলে বসতে ইঙ্গিত করল। তারপর নিজে খাটে হেলান দিয়ে মাটিতে বসল।

‘চন্দিরা!’ আমি দ্রুত প্রসঙ্গে এলাম। ‘তুমি যা হারিয়েছ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার ক্ষমতা আমার নেই ঠিকই, কিন্তু তবুও তোমায় সতী হতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

চন্দিরা হাসল। বড়ই দুঃখের সে হাসি। ‘কিন্তু এ ছাড়া তো আমার কাছে আর কোনও রাস্তা নেই সাহেব। তবে আপনাকে সত্যিটা বললে আপনি নিশ্চয়
আর আপত্তি করবেন না।’

চন্দিরা উঠে দাঁড়াল। তারপর পরনের কাপড় খুলতে শুরু করল!

‘থামো! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তুমি আমাকে তোমার শরীরের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের সতী হওয়ার মনস্কামনা পূর্ণ করতে চাও! কিন্তু আমার ওসবে উৎসাহ নেই। আমি ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। কোনওরকম প্রলোভনেই বেআইনি কাজ করব না।’ আমি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম। আশ্চর্য এদের ধর্মীয় উন্মাদনা।

‘ভুল করছেন সাহেব। আপনাকে আমি কোনও লোভ দেখাচ্ছি না। আমার দিকে তাকান!’ চন্দিরা আদেশের স্বরে বলল। তারপর সম্পূর্ন নগ্ন হয়ে

আমার সামনে দাঁড়াল। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম।

চন্দিরার স্তন সুডৌল, শঙ্খের মতো। কটিদেশ সরু, চওড়া জঙ্ঘা। হাত ও পা লম্বা এবং সুগঠিত। গায়ের রং হাতির দাঁতের মতো সাদা। যেন গ্রীক দেবী অ্যাফ্রদিতি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু কবজি, হাঁটু, কাঁধ ইত্যাদি স্থানে জটিল নকশার মতো করে উল্কি আঁকা। পায়ে পায়ে চন্দিরা এগিয়ে এল, একদম আমার সামনে এসে দাঁড়াল। শরীরে কোথাও রোম নেই, শুধু নাভির সামান্য নীচে...

'ভালো করে দেখুন।' চন্দিরা নিজের হাতটা আমার চোখের সামনে এনে কবজির উল্কির দিকে ইঙ্গিত করল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম দূর থেকে যেটা দেখে উল্কি বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে সূক্ষ্ম সেলাইয়ের দাগ। নিপুণ দক্ষতায় কেউ যেন পশমের সুতো দিয়ে কব্জিতে দুরুহ কোনও অস্ত্রোপচার করেছে। একইরকম দাগ কাঁধ, হাঁটু প্রভৃতি স্থানে। বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা সম্ভাবনা আমার মনে ঝলসে উঠল। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব!

'এই দাগ... এই দাগগুলো কীভাবে...!'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ভাবছেন।' চন্দিরা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ালো। তাঁর প্রশস্ত সাদা পিঠে জাফরি দিয়ে আসা আলোর আল্পনা। 'আদিত্যনাথ যদিও উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন এবং নিজের জীবনে জরা ও মৃত্যুকে বিলম্বিত করেছিলেন, তবুও অন্য কোনও মানুষকে দীর্ঘায়ু করার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। কিন্তু তিনি মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারতেন। তাই নিজের দীর্ঘ জীবনে তিনি তাঁর পছন্দের নারীদের দেহাংশ বিশেষ ক্ষমতাবলে সংরক্ষণ করে রাখতেন। কারও হাত, কারও পা, কারওর বুক, কারওর উদর। তারপর সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে একটি পূর্ণ নারীদেহ তৈরি করেন এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করেন। নামকরণ করেন, চন্দিরা!'

চন্দিরা থামল। আবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'রওয়ান সাহেব, উনি চেয়েছিলেন আমায় দীর্ঘায়ু করতে। তাঁর সৃষ্টি তাঁর মৃত্যুর পরও যেন আরও বহু দিন পৃথিবীতে থাকে সেটাই কামনা করতেন। কিন্তু মানুষ তো ভগবান নয়, তাই তাদের সব মনস্কামনা পূর্ণও হয় না। জীবনের শেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভের আগেই তাঁকে চলে যেতে হল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমিও আর বেশিদিন নেই। আমার শরীরে পচন শুরু হয়েছে ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই! যাদের অঙ্গ নিয়ে আমায় সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের আত্মারাও শান্তি পায়নি এতদিন! বারবার তারা আমার কাছে আসছে। বিদেহী হয়েও নিজের

দেহের অধিকার ছাড়তে তারা রাজি নয়! আমি বেঁচে থাকলে তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে রওয়ান সাহেব! দয়া করে আমায় অনুমতি দিন। আদিত্যনাথ অগ্নির উপাসক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেই আমার আত্মাও শান্তি পাবে!'

চন্দিরার আকুতি আমার কানে বাজতে লাগল। আমি আমার করণীয় স্থির করে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ দূর থেকে ঢাক, ঢোল, খোল-করতালের শব্দ ভেসে এল।

'ওঁর সৎকারের সময় উপস্থিত। চলুন আমরা শ্মশানে যাই। বেশি দূর নয়, এখান থেকে হাঁটাপথ।'

চন্দিরা ততক্ষণে একটা সাদা শাড়ি পরে নিয়েছে। সে ঢাক-ঢোলের শব্দ যেখান থেকে ভেসে আসছে সেদিকে অগ্রসর হল। আমার যুক্তিবুদ্ধি তখন আর বিশেষ কাজ করছিল না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে আমি একবস্ত্রা নারীটিকে অনুসরণ করলাম।

শ্মশানে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। বিশাল করে চিতা সাজানো হয়েছে। সেখানে আদিত্যনাথের মৃতদেহ শোয়ানো। গোকুল হাতে একটা মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি চলে যান, রওয়ান সাহেব! আমাকে আমাদের কাজ করতে দিন।' গোকুল হিসহিস করে বলল।

ততক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আমি কোনও উত্তর না দিয়ে গোকুলের হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে চিতার দিকে এগিয়ে গেলাম। চিতার মাঝখানে চন্দিরা পদ্মাসনে বসে ছিল।

দাহ্যপদার্থে ভেজানো কাঠ আগুনের সংস্পর্শে দ্রুত জ্বলে উঠল। সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা যখন একটি মৃত এবং আরেকটি জীবিত শরীরকে অধিকার করে নিচ্ছিল তখনও চন্দিরার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির চিহ্ন লেগে ছিল। মুক্তির হাসি।



মেরি শেলি : সৃষ্টির ছায়ায় স্রষ্টা

অঙ্কিতা

আজ থেকে দুশো বছর আগে ইউরোপের জেনেভা লেকের ধারে এক বাড়িতে বসে এক উনিশ বছরের মেয়ে লিখে ফেলেছিল পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন নভেল। দুশো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন কোনায় মানুষ চর্চা করে এসেছে তাঁর রচনা নিয়ে। কত থিসিস পেপার, কত সিনেমা, কত ফ্যান ফিকশ! আজও সেই গথিক সায়েন্স ফিকশনের কালো দুনিয়া আমাদের পিছু ছাড়েনি। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানব আজও সমানভাবে বর্তমান আমাদের মনের মধ্যে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই এই বিশ্বনন্দিত চরিত্রটিকে নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র হয়ে গেছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলতেই আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে এক অতিকায় দানব। মৃত্যু পরপার থেকে ফিরে আসা বিভীষিকা। তার চেহারায় সেলাইয়ের দাগ। সারা পৃথিবীর প্রতি প্রবল আক্রোশে জ্বলন্ত দুই চোখ। সে নিষ্ঠুর, অমানবিক। কিন্তু আসলে সে তো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নয়। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নাম ছিল সেই ডক্টরের, যিনি বানাতে চেয়েছিলেন এক শ্রেষ্ঠ মানুষ, অথচ ভুল করে বানিয়ে ফেলেন এক দানব। তবু তাঁর নাম নিয়েই দানবটা বেঁচে থাকে আমাদের কল্পনায়।

কী অদ্ভুতভাবে স্রষ্টাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় সৃষ্টি! ডঃ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গড়া দানবই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামে পরিচিত হয়ে যায় পৃথিবীতে। ঠিক একই ভবিতব্য হয়তো ছিল এই যুগোত্তীর্ণ উপন্যাসের রচয়িতারও। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাস নিয়ে পৃথিবীর জুড়ে যত মাতামাতি, যত উল্লাস, তার এক অংশও হয়তো হয়নি লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্রাফট শেলির জীবন নিয়ে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তাঁর দর্শন নিয়ে। বেঁচে থাকতে বহু শিল্পী তাঁদের শিল্পকর্মের দাম পাননি। মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাঁদের শিল্পকর্মের চাহিদা আকাশ ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু এ যেন ঠিক উলটো ঘটনা। শিল্পকর্ম ছুঁয়ে গেল আপামর জনতাকে। কিন্তু শিল্পীর জীবন দাম পেল না।

মেরি ওলস্টোনক্রাফট শেলি (বিবাহ পূর্ববর্তী পদবি গডউইন)। জন্ম—৩০

অগাস্ট ১৭৯৭, মৃত্যু—১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১। তাঁর বাবা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত রাজনৈতিক সাংবাদিক ও দার্শনিক উইলিয়াম গডউইন। দার্শনিক নারীবাদী মহিলা মেরি ওলস্টোনক্রাফট ছিলেন তাঁর মা। জন্মের সময় মেরি শেলির মা মারা যান।

মেরির চার বছর বয়সে তার বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। গডউইনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী'র সন্তানদ্বয়ের প্রতি তাদের সৎ মায়ের ব্যবহার খুব একটা ভালো ছিল না। ছোট্ট মেরি সেই বয়স থেকেই সম্পর্কের জটিলতার অন্ধকার দিকটা দেখতে থাকে। নিজের আবেগ সে লিপিবদ্ধ করে রাখত জার্নালে।

ছোটবেলায় সেই সময়ের অন্যান্য ইউরোপীয় মেয়েদের মতো মেরি পড়াশোনা করেননি কোনও বড় স্কুলে। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু বাবা গডউইন বিভিন্ন পার্থিব বিষয়ের বিস্তৃত পরিসরে নিজের হাতে ধরে তাঁকে ঘোরাতেন। বাইরের স্কুলে গিয়ে শিক্ষা না পেলেও মেরি শেলি তাঁর জ্ঞান আহরণ করতেন বাবা-মায়ের তৈরি বিশাল লাইব্রেরি ঘর থেকেই। বাবার কাছে আসা বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আড্ডা বা আলোচনা শোনার ক্ষেত্রেও গডউইন কখনও বাধা দিতেন না। প্রথাগত না হলেও সেই অসামান্য এবং পরিণত শিক্ষা মেরিকে অবশ্যই তৎকালীন সমাজনীতির প্রতি তাঁর নিজস্ব দর্শন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তী কালে যে মস্তিষ্কের কন্দরে স্ফূরিত হবে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' উপন্যাসের ধূসর চরিত্ররা, তার বীজ বপন হয়ে যাচ্ছিল শৈশবেই।

পনেরো বছরের মেরি সম্পর্কে তাঁর বাবা বলেছিলেন, 'singularly bold, somewhat imperious, and active of mind. Her desire of knowledge is great, and her perseverance in everything she undertakes almost invincible.'

১৮১৪ সালে পার্সি বি শেলির সঙ্গে আলাপ হয় মেরি গডউইনের। মাত্র সতেরো বছর বয়সে মেরি প্রেমে পড়েন তাঁর। বাইশ বছরের শেলি ছিলেন উইলিয়াম গডউইনের রাজনৈতিক দর্শনের একজন অনুগামী। মেরি গডউইনের সঙ্গে আলাপ কালে শেলি ছিলেন বিবাহিত। তৎসত্ত্বেও তাঁরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। মেরির মায়ের কবরখানায় তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে যেতেন। ১৮১৪ সালেই এক জুন মাসের গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যায় তাঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েন। সতেরো বছরের এক অনভিজ্ঞা কুমারী মেয়ে ভেসে গেল বাইশ বছরের ধীসম্পন্ন যুবকের বন্য অপার্থিব

ভালোবাসায়।

মেরি গডউইন ভেবেছিলেন তাঁর বাবা তাঁদের এই সম্পর্ক মেনে নেবেন। কিন্তু উইলিয়াম গডউইন কিছুতেই মেয়ের অন্যপূর্ব প্রেমাস্পদকে মেনে নিলেন না। যদিও পার্সি শেলি প্রকৃতই মেরির বাবা-মায়ের মতোই সংস্কারমুক্ত সমাজদর্শনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, যেখানে উইলিয়াম গডউইন ভাবতেন বিবাহটা একধরনের একচেটিয়া একাধিপত্যের রাস্তা মাত্র। মেরি অত্যন্ত হতবাক এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাবার এইরকম ব্যবহারে। ওই বছরেই তাঁরা দুজনে গোপনে পালিয়ে যান ফ্রান্সের উদ্দেশে। একা পড়ে থাকেন পার্সি শেলির প্রথম পক্ষের গর্ভবতী স্ত্রী।

কখনও গাধা, কখনও অশ্বেতর, অথবা ঘোড়ায় টানা গাড়ি, আবার কখনও শুধুই পদব্রজে প্যারিস থেকে সুইৎজারল্যান্ডের দিকে যাত্রাকালীন মেরি দেখতে পান, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের অবস্থা। দগ্ধ বাড়িঘর, মৃত গবাদি পশু, লুণ্ঠিত সর্বহারা সাধারণ মানুষের দলিত, ধর্ষিত জীবনের কন্টকময়তা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে মেরিকে। আধুনিক অস্ত্রের অত্যাচার হয়তো তাঁর মননকে নাড়া দিয়ে যায় তখনই। আশীর্বাদ স্বরূপ যার আসার কথা, তা অভিশাপ হিসেবে নেমে এলে মানুষ কোন অন্ধকারে তলিয়ে যায় তা নিজের চোখে দেখেছিলেন মেরি। এই দোটানাই এক অভূতপূর্ব চিন্তার বীজ পুঁতে দেয় তাঁর মনে।

এই ভ্রমণে তাঁরা যেমন মেরির মা, মেরি ওলস্টোনক্রাফটের বিভিন্ন লেখা পড়েছিলেন, তেমনই নিজস্ব লেখালিখি নিয়েও চর্চা চালিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই ভ্রমণের উপরে নিজস্ব জার্নাল রাখতেন।

হাতে টাকা না থাকার কারণে পথ-মধ্যবর্তী লুক্রেন থেকে তাঁদের ফিরে আসতে হয়। তাঁরা সেপ্টেম্বরের ইউরোপিয়ান আবহাওয়ার হিমপ্রবাহের মধ্যে রাইন হয়ে কেন্টের দিকে যাত্রা করেন। বাড়ি ছাড়ার বেশ কয়েক মাস পরে যখন তাঁরা ইংল্যান্ডে পৌঁছন, তখন তাঁদের অবস্থা কপর্দকশূন্য। এমতাবস্থায় মেরি বুঝতে পারেন যে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন। তিনি অর্থসাহায্যের আশায় বাবার কাছে চিঠি লেখেন, কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হন না। তাঁরা নেলসন স্কোয়ারের একটা ছোট্ট ঘরেই নিজেদের পড়াশোনা আর লেখালিখির কাজ চালিয়ে যান। আশৈশব উচ্চবিত্ত পরিবারে মানুষ মেরি দারিদ্রকেও আলিঙ্গন করে দেখে নেন তার কঠোরতা।

এই দারিদ্র্যর মধ্যে মেরির শরীর ক্রমশ ভাঙতে থাকে। ১৮১৫ সালের

শুরুর দিকে এক প্রিম্যাচিওর মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় মেরি। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই সবার ভয়ানক আশঙ্কা সত্য করে সেই সন্তান মেরিকে ছেড়ে চলে যায়। গভীর মানসিক অবসাদে ডুবে যান মেরি। এই সময়ে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। কিন্তু শেলির প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেন।

১৮১৬ সালে যখন তাঁরা সপরিবারে জেনেভায় লর্ড বায়রনের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে যান, তখন মেরি নিজেকে মিসেস শেলি বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। এই বায়রনের বাড়িতেই এক সান্ধ্য আড্ডায় ওঠে ভূতের গল্প লেখার কথা। তখনই জীবনের বহু উত্থান-পতন দেখে ফেলা এক উনিশ বছরের মেয়ের মনে ভেসে ওঠে এক অপার্থিব দানব। তৎকালীন বিজ্ঞান নিয়েও শেলি দম্পতি চর্চা করতেন। সেই মধ্যযুগীয় দর্শন, অ্যালকেমি আর বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছিল এক অনবদ্য সৃষ্টি, যা তার আজ দুশো বছর পরেও ভয়স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় মানুষের অবচেতনে।

প্রথমে এটিকে একটি ছোটগল্প হিসেবেই লিখবেন ভেবেছিলেন মেরি শেলি, কিন্তু পার্সি শেলির অকুণ্ঠ উৎসাহে তিনি এক উপন্যাস রচনা করেন। 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, অর দ্য মর্ডান প্রমিথিউস'। নিজের জীবনের দর্শন, সমাজচেতনা, একাকিত্ব, পালিয়ে বেড়ানোর ভয়, মানুষের যুদ্ধলিপ্সা, সমাজের চোখে খারাপ মেয়ে হিসেবে চর্চিত হওয়ার কষ্ট, সর্বোপরি মৃত্যুর নিষ্ঠুরতায় নেমে আসা এক গভীর মানসিক অবসাদ— এসবই তিনি তুলে ধরেন তাঁর উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্রের মধ্যে। তিনি ছুঁয়ে দেখেছিলেন সেই অন্ধকার সময়টাকে, তাই তিনি লিখতে সাহস পেয়েছিলেন এক 'শিব গড়তে বাঁদর গড়ে ফেলা'-র ভয়ঙ্কর ভুলের গল্প। কখনও কখনও মানুষ চায় এক আর তার জীবনে ঘটে যায় অন্য কিছু। ভালো আর মন্দ, নিন্দা আর প্রশংসা— একই মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ। পার্সি শেলির উন্মুক্ত প্রেমের জালে জড়িয়ে সেই তরুণী এইভাবেই অনুভব করেছিলেন জীবনকে।

মেরি শেলির জীবন কখনওই উত্থানপতন রহিত ছিল না। তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের একমাত্র ভালোবাসা বিদগ্ধ প্রেমের কবি পার্সি বি শেলি মারা গেলেন নৌকাডুবিতে। বৈধব্য পরবর্তী জীবনে মেরিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত তাঁর এবং তাঁদের দু'জনের একমাত্র জীবিত সন্তানের ভরণপোষণের জন্যে। নিজের সৃষ্টির কথা না ভেবে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন পার্সি শেলির বিভিন্ন কবিতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজে।

পার্সি শেলিকে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্থান দেওয়ার জন্যে মেরি শেলির অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তীকালে মানুষ মেরি শেলিকে বারংবার বিচার করে এসেছেন পার্সি শেলির পত্নী হিসেবে। অথচ তাঁর নিজস্ব সাহিত্যকীর্তিও কিছু কম ছিল না।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো সাড়া জাগানো উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখে গিয়েছিলেন আরও ছ'টি উপন্যাস, তিনটি শিশুসাহিত্য, অজস্র ছোটগল্প ও কবিতা, তাঁদের ছ'সপ্তাহের যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপ যাত্রা সংক্রান্ত এক ভ্রমণবিষয়ক লেখা, এ ছাড়াও বিভিন্ন আর্টিকেল এবং রিভিউ। তদুপরি প্রায় সাত বছর ধরে, Dionysius Lardner's Lives of the Most Eminent Literary and Scientific Men – এর জন্যে তিনি বিখ্যাত স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইটালিয়ান মানুষদের জীবনী লেখেন। অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে প্রায় বাষট্টি জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনকাহিনি তিনি লিখেছিলেন। এর মধ্যে মেকিয়াভেল্লি, ব্রুনো, পাস্কালের মতো ব্যক্তিবর্গের জীবনীও আছে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের পর থেকে তিনি কোনওদিনও কেবলমাত্র সাহিত্যিক হিসেবেই মর্যাদা পাননি, সমাজ এবং সাধারণের চোখে তিনি বারংবার বিবেচিত হয়েছিলেন একজন কৃতি নারী।

মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে ব্রেন ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর বাৎসরিকের সময় তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ তাঁর ডেস্ক থেকে আবিষ্কার করে মেরি শেলির মৃত সন্তানদের চুলের গুচ্ছ, পার্সি বি শেলির সঙ্গে ভাগাভাগি করে লেখা একটি নোটবুক, আর যত্ন করে সিল্ক কাপড়ে মুড়ে রাখা পার্সি বি শেলির দেহভস্ম।

মেরি শেলির লেখা সেই অভিশপ্ত দানব চরিত্র যেমন মেরে ফেলেছিল নিজের প্রাণদাতা ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের পরিবারকে, তেমনই এই চরিত্রের অতি জনপ্রিয়তার ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল স্রষ্টা মেরি শেলির অন্যান্য রচনা।

১৮১৭ সালের বসন্তে মেরি উপন্যাসটা লেখা শেষ করেন। লন্ডনের এক ক্ষুদ্র প্রকাশনা থেকে বইটার প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল মাত্র ৫০০ কপি। মেরি শেলি 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' উপন্যাসটি প্রকাশ পেয়েছিল একজন অজ্ঞাত লেখকের কাহিনি হিসেবে। যদিও প্রথম সংস্করণটি উৎসর্গ করা হয়েছিল উইলিয়াম গডউইনকে এবং বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন পার্সি বি শেলি।

আর দশটা কালোত্তীর্ণ লেখার মতোই এই উপন্যাসও প্রথমেই সমাদৃত

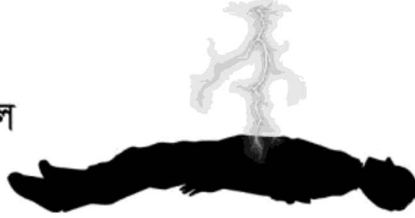
হয়নি জনমানসে। এত ভয়ঙ্কর এবং ক্রূর বিষয়বস্তুর জন্যে তৎকালীন পাঠকসমাজ বইটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। উপরন্তু যখন জানাজানি হল, এই বর্বর মানসিকতার লেখা এক মহিলার, তখন মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মেরি শেলির চিন্তাভাবনা স্পষ্টতই তাঁর বাবা গডউইন এবং মা ওলস্টোনক্রাফটের মতো আশাবাদী ছিল না। মেরির বাবার দর্শন, মানুষ ক্রমশই ভালো থেকে ভালোতর হয়ে উঠবে; এই চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়বস্তুই ছিল মেরি শেলির বিশ্বচর্চিত গ্রন্থ 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।'

মানুষের রক্ষণশীল মানসিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেরি শেলি ১৮৩১ সালে তাঁর লেখাটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেটাই আজ পর্যন্ত সর্বাধিক পঠিত সংস্করণ। বিগত দুশো বছরে এই বইটির সংস্করণ হয়েছে প্রায় তিনশোরও বেশি। বিভিন্ন দেশে অজস্র ভাষায় অনূদিত হয়েছে বইটি। জীবনমৃত্যু, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির তীব্র দোলাচলে আবদ্ধ ধীসম্পন্ন তরুণীর মননের নির্যাসে নির্মিত এই মহাগ্রন্থ নিজেও বারংবার দোলাচল তৈরি করেছে মানুষের হৃদয়ে।

পুনর্জ্জন্ম

র‍্যামসে ক্যাম্পবেল

অনুবাদ : দীপ ঘোষ



অন্ধকার! উঃ! আবার সেই শ্বাসরোধী অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরছে! তবুও আমি নিশ্চিত, কেউ আমার দিকে নজর রাখছিল! আচ্ছা, আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি? তবে যে মনে হচ্ছিল কেউ আমার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে? তা কি তবে স্বপ্ন? যেন অনেকগুলো স্বচ্ছ পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা এক মানবমূর্তি, যার মুখটা তৈরি শুধু জমাট অন্ধকার দিয়ে।

ঘন পলির মতো অন্ধকার আমার চোখের উপরে জমে আছে। যেন কত জন্মের ঘুম আমায় বলছে, আর একটু বিশ্রাম নাও, এখনই কি দরকার জেগে ওঠার? না না! মনকে সংহত করতে হবে, আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না! খুব ভয় করছে!

শান্ত হও, এখন ভয় পাওয়ার সময় নয়, যুক্তি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করো। দৃষ্টি তোমার সঙ্গে বিদ্রোহ করলে বাকি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নাও, তারা নিশ্চয়ই তোমায় সাহায্য করবে।

নাহ! কিছু ভাবতে পারছি না। আমার চিন্তা যেন এই অন্ধকারের অতল ঘূর্ণির মধ্যে পলকে ডুবে যাচ্ছে। সমস্ত অস্তিত্ব যেন হারিয়ে যাচ্ছে বুভুক্ষু শূন্যতার কাছে। কিছু বোঝার আগেই একটা জান্তব কান্না মেশানো ঘড়ঘড়ানি বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

ওহ, তাহলে আমার একটা শরীর অন্তত আছে। কিন্তু, এখনও নিজের শরীর আমি অনুভব করতে পারছি না। আমার কান্নার চাপা প্রতিধ্বনি থেকে বুঝতে পারছি, দেওয়াল কাছেই আছে। তবে এরকম গলার স্বর তো আমার ছিল না!

ছাড়ো, গলার স্বর নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এটা নয়। ভাবো, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সাড় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, এখন আমি নিজের শরীরটা অনুভব করতে পারছি, কিন্তু অসম্ভব দুর্বল লাগছে। হাত-পা নাড়ানোর কোনও ক্ষমতাই আমার নেই। আমি নিশ্চয়ই খুবই অসুস্থ।

এই যন্ত্রণার কি শেষ নেই? আর যন্ত্রণার কথা মনে পড়তেই বিদ্যুৎচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল— ভেসে চলেছি নদীতে, উথাল-পাথাল স্রোতে প্রাণপণ চেষ্টা করছি সাঁতার কাটতে। জোয়ারের গর্জন আর জলের চাপে কানে তালা ধরে যাচ্ছে, আর শেষে নদীর গভীরে একটু বাতাসের জন্যে আমার ফুসফুস যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অসহনীয় যন্ত্রণা, আর তারপর সব অন্ধকার। তবে
কি নদীতে ভেসে আমি এখানে এসে পৌঁছলাম?

এতটা দৈব ঘটনা আমার জীবনে মেনে নিতে পারছি না। কেউ নিশ্চয়ই আমায় উদ্ধার করে এখানে এনেছে। কিন্তু আমার সেই উদ্ধারকর্তা কোথায়? আমার কান্না শুনেও সে এগিয়ে আসছে না কেন?

আবার ভয় আমায় গ্রাস করতে আসছে। এই সময় বুদ্ধি হারালে চলবে না। আমাকে যুক্তি দিয়ে ভাবতে হবে। হাজার হোক আমি একজন দার্শনিক। যাক, স্মৃতি তাহলে আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। যতক্ষণ শরীরে বল না ফিরে আসে, এইভাবেই আমার অবস্থার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দর্শনে পাওয়া যায় কিনা দেখি। তাতে কিছুটা সময়ও হয়তো কাটবে। নাহ, এই সময়ে যে ব্যাখ্যাটা মনের কোণে বাসা বাঁধছে তাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব এখন বিপন্ন, আশা হারালে চলবে না। তাও অনুভব করলাম কপালে বিন্দু বিন্দু ঠান্ডা ঘাম জমছে।

আমার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার আগে কোনও অশুভ চিন্তার বশবর্তী হলে চলবে না। শরীরের সাড় ফিরে আসছে সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনও সময় লাগবে অনেকক্ষণ। যেন মনে হচ্ছে এক নতুন শরীরে আমার পুনর্জন্ম হচ্ছে। নাহ, এসব অসম্ভব কথা ভাবলে এখন চলবে না!

এর থেকে হাতটা নাড়ানোর চেষ্টা করি, মনকে একাগ্র করি এই কাজে। উফ! মনে হচ্ছে হাতের জায়গায় একটা ভারী ঠান্ডা বরফের টুকরো পড়ে আছে। শরীরের সঙ্গে তার যেন কোনও যোগাযোগই নেই। এমনকী বুঝতেও পারছি না, এ কোনও অসুস্থতার ফলাফল কিনা। ঠিক যেমন আমার দৃষ্টিশক্তির

ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত নই। যেন মনে হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া স্নায়ুবিন্দুগুলো এই অন্ধকারের গহ্বরে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু জলে ডুবলে কেউ অন্ধ হয়ে যায় কি করে? আর আমি তো মনে করতে পারছি, এই অন্ধকারে কাউকে দেখেছিলাম! যদিও তার মুখটা কিছুতেই মনে আসছে না। না না, আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি না। এই অচেনা জায়গায় দৃষ্টিহীন আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকার অসহায়তা আমায় উন্মাদ করে তুলছে। ফুলে ভারী হয়ে যাওয়া ঠোঁটগুলো কাঁপিয়ে আমি আবার গুঙিয়ে উঠলাম। নাহ! ভুল করছি, কাউকে জানতে দেওয়া চলবে না যে আমি অসহায়। আমি জানি না এখন কোথায় আছি, কারা আমার উপর নজর রেখেছে, তারা বন্ধু না শত্রু!

কোনওক্রমে ঠোঁটদুটো নিজের ইচ্ছের বশবর্তী করে কান্নাটা চেপে নিলাম। অন্ধকারের মধ্যে এখন শুধু শব্দ আমার নিজের হৃদয়ের কষ্টকর প্রশ্বাসের। সেই ধ্বনি যেন নিজের প্রতিধ্বনির ভয়ে নিজেই কেঁপে উঠছে, আরও বেতাল হয়ে পড়ছে। উফ! কোনওরকমে যদি এই অসহ্য শব্দটাকে চিরকালের জন্যে বন্ধ করা যেত। আর তখনই শুনতে পেলাম আরেকটা ক্ষীণ খসখসানি। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কেউ যেন এদিকেই আসছে।

অবশ চোখের পাতাদুটো যতটা পারি চেপে বন্ধ করে রাখলাম, শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছে উত্তেজনায়। ছোটবেলার রাতগুলোয় ঘুম ভেঙে গেলে এইভাবেই ঠান্ডা বিছানায় শুয়ে থাকতাম। মনে হতো অন্ধকার নরকের প্রহরীরা আমায় ঘিরে ধরেছে, এখনই নিয়ে যাবে চিরঘুমের দেশে। আরও স্মৃতি ফিরে আসছে তবে। কিন্তু এখন এসব ভাবার সময় নেই, পায়ের শব্দ আরও এগিয়ে আসছে।

কোথাও একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ আমার নিস্তরঙ্গ অস্তিত্বটাকে যেন চুরমার করে দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে হলদেটে একটা আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার চোখের পাতায়। আমি চোখদুটো আরও শক্ত করে বন্ধ করে রাখলাম। কিন্তু আলোটা এগিয়ে এসে যেন আমার সব অন্ধকারকে খুঁটে খুঁটে খেতে চাইছিল। নাহ, ওকে বুঝতে দিলে হবে না যে, আমি এখনও জীবিত। দম বন্ধ করে পড়ে থাকলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম আমার শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ে সে আমায় পরীক্ষা করছে। একসময় পায়ের শব্দ আর আলোটা কাঁপতে কাঁপতে দূরে চলে গেল। ওটা মশালের আলো, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আবার দূরে সেই ধাতব ঘসটানির শব্দের সঙ্গে অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরল।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আবার ভাবা শুরু করলাম। এটা পরিষ্কার যে, আমি একটা জেলখানার কুঠুরিতে আছি। পাথরের দেওয়াল আর চাবি দেওয়া ধাতব দরজার শব্দ সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু একটা জীবন বাঁচানোর জন্যে এমন শাস্তি কী করে হয়? হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, মেয়েটি নদীতে ভেসে যাচ্ছিল, আমিই ওকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তবে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকেরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল? শহরের চার্চের ওই বিশপ? আমার অখৃস্টান-সুলভ দর্শনের জন্যে এরা অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত, তা বলে কারারুদ্ধ? নাহ, এ অসম্ভব। আমার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে আমার বিশ্বাস আর দর্শনের কোনও সম্পর্ক নেই।

চিন্তার গতিকে রুদ্ধ করা অসম্ভব। ঢেউয়ের মতো একের পর এক স্মৃতির দরজা খোলা শুরু হয়েছে। অনেক কিছুই মনে পড়ছে, ছেঁড়া মাকড়সার জালের মতো। কিন্তু নিজের নাম? সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না! আবার সেই অজানা ভয়টা গ্রাস করছে আমাকে। নাহ, অন্যদিকে মন দিতে হবে। আবার চেষ্টা করি হাতটা নাড়ানোর।

এই নিস্তরঙ্গ অন্ধকারে সময় মূল্যহীন। তাই কতক্ষণ যে নিজের সঙ্গে নিজেই যুক্তিজাল বুনছিলাম তা জানি না। যে করেই হোক আমাকে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতেই হবে। আর তার জন্য সবার আগে নিজের দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা দরকার। তারপর যে করেই হোক, ওই পাহারাদারকে কাবু করে এখান থেকে পালাতে হবে।

সমস্ত মনকে একাগ্র করে নিজের অঙ্গগুলি আবার খুঁজতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছে আমার শরীরটা যেন মন থেকে একেবারে আলাদা, শক্ত আর ভারী হয়ে আছে। ঠিক যেন অনেকদিন জলে ডুবে থাকা ফুলে ওঠা লাশ। না না, আবার কেন এসব ভাবছি, এসব অশুভ কথা ভেবো না, মনকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখো! যতই চেষ্টা করি না কেন, চিন্তাটা মনের কোণে হিংস্র শ্বাপদের মতো গুঁড়ি মেরে সুযোগ খুঁজছে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

আরও কতক্ষণ পরে যে হতাশ হয়ে চেষ্টা থামালাম জানি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা আবার লাফিয়ে বেরিয়ে এল— এই সমস্ত ঘটনা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, আমি আসলে মারা গিয়েছি। এই ভয়ঙ্কর চিন্তাটা আমার শেষ ইচ্ছাশক্তিটুকুও শুষে নিল। চারদিকের অন্ধকার যেন পাথরের দেওয়ালের মতো আমার পিষে ফেলতে চাইছিল। এই অন্ধকার মহাবিশ্বে আমি একমাত্র চিন্তাশীল আত্মা।

নদীর কথাটা এখন খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে। বিকেলে দানিয়ুবের তীরে হাঁটছিলাম। তীব্র চীৎকার শুনে দেখলাম, একটি মেয়ে জলে পড়ে গেছে। আমি ও আরেকজন তরুণ জলে লাফিয়েছিলাম মেয়েটিকে বাঁচাতে। তরুণটি মেয়েটির কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু আমি পড়ে গেলাম এক চোরা স্রোতের কবলে। সেই স্রোত আমায় টেনে নিয়ে গেল নদীর অতলে, যেখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

আমি হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামীকালের পঠনশৈলীর কথা ভাবছিলাম— প্লেটো, পিথাগোরাস আর ক্যান্ট। আমার প্রিয় ছাত্রদের কেউ কি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল তবে? না না, তা-ও হতে পারে না। এমন চিন্তা মনে স্থান দিতে নেই। শুধু যদি জানা যেত আমি কোথায়। যুক্তি দিয়ে ভাবো, যদি তোমার অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে আজ না হোক কাল, তুমি জানতেই পারবে এর উত্তর। অহেতুক উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। কিন্তু এই অসহায় দশা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যদি একটা আঙুলও নাড়াতে পারতাম। আবার চোখ বন্ধ করে হাতের আঙুলগুলো অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই আগের মতোই তারা শুধু তাদের ঠান্ডা অস্তিত্ব জানান দিল। পিঠের নীচের পাথরের চাতালের সঙ্গে তাদের যেন কোনও তফাৎই নেই।

আবার ডান হাতের দিকে নজর দিলাম। ভেঙে পড়লে চলবে না। আলাদা করে প্রত্যেকটা আঙুলকে অনুভব করো আগে। মনে হচ্ছে অন্ধকার যেন আঙুলগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে একটা দস্তানার মতো করে আটকে রেখেছে। কসাইয়ের টেবিলে পড়ে থাকা ঠান্ডা মাংসের টুকরোর মতো পড়ে ছিল হাতটা।

আবার অন্ধকারের মধ্যে একা আমি, না ভুল হল, এবার সময়ও আমায় ছেড়ে গেছে। সেই ছোটবেলার এরকম অন্ধকারে শুয়ে প্রার্থনা করতাম, যেন আমার মৃত্যুর সময়েও আমার বিশ্বাস অটুট থাকে। অবিশ্বাসীর কখনও মুক্তি হয়
না, এই কথা সত্যি হলে আমার মৃত্যুর পরে অসীম যন্ত্রণা অপেক্ষা করে আছে।

না, হাল ছাড়লে চলবে না। এইভাবে অচেনা কারাগারে নিজের মৃতদেহের সঙ্গে এইভাবে পড়ে থাকব না। বাম হাতের দিকে মনঃসংযোগ করলাম।

মিশরীয় মমির হাতও বোধহয় এমনই হয়। মৃত চামড়া আর মাংসের আস্তরণের নিচে থাকে স্নায়ু আর পেশির জাল, কিন্তু তারাও সংবেদনহীন। মনের সমস্ত চিন্তা একাগ্র করে আবার অনুভব করতে চাইলাম হাতটাকে। দাঁতে ঘষা লেগে অদ্ভুত একটা শব্দ বের হচ্ছে মুখ থেকে। হাঁপিয়ে উঠেছি, কিন্তু পারতেই হবে, আর একটু। তারপরেই মুক্তি। একটা মাত্র আঙুল যদি নড়ানো যেত। কিন্তু আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন অন্ধকার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিল। বেলুনের মতো ফোলা হাতে আমার সমস্ত চেষ্টা অবয়বহীন গ্যাসের মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। আবার সেই চিন্তাটা ফিরে আসছে! পিথাগোরাস, প্লেটো, ভন হার্ডার, গ্যোটে— সবাই বিশ্বাস করেছিলেন! আর আমি অস্তিত্বের শেষ প্রান্তে এসে বিশ্বাস হারাচ্ছি! নিজের উপর রাগে আর নৈরাশ্যে হাতটা মুঠো করে ধরলাম।

প্রথমে মনে হয়েছিল, পুরোটাই মনের ভুল। তারপর বুঝলাম এখনও আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে, কোনও অদৃশ্য দস্তানার আবরণ থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে নিজেদের। প্রাথমিক বিস্ময় ও উল্লাসের ধাক্কা কাটিয়ে আস্তে আস্তে হাতটা তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাশের ঠান্ডা দেওয়ালে ঘষটে হাতটা অন্ধকারে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। আর একটু, তারপরেই আমি এই বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব। আর কয়েক ইঞ্চি উপরে তোলার পরেই হাতটা এক টুকরো পাথরের মতো আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ঠিক আছে, তুমি এখনও ক্লান্ত, সময় লাগবে। চেষ্টা করে যাও, আমি বুঝিয়ে চললাম নিজেকে। আরও বেশ কয়েকবার প্রাণান্তকর চেষ্টার পরে বুঝলাম হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনও প্রত্যঙ্গের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আর হাতটাও ওই কয়েক ইঞ্চির বেশি তোলা বা নাড়ানো অথবা বাঁকানো সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছিল, হাতটা যেন একটা অচেনা মাংসপিণ্ড, যার উপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই।

আমার জন্য এই কারাগার আর শাস্তি খুব যত্ন করেই বেছে নেওয়া হয়েছে। আশা আর নিরাশার মাঝে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। আমার ছোটবেলার বিশ্বাসই ঠিক ছিল। আমায় বলা হয়েছিল সেই বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা চরম অপরাধ। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে বিধর্মীরা, আর সেই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল, নদীর নীচে জ্ঞান হারানোর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আজ আমি তার ফল ভুগছি। সেই মহাশক্তি আমার

আত্মাকে প্রবেশ করিয়েছেন কোনও অচেনা শরীরে, আর এখানেই আমায় সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা সইতে হবে।

হ্যাঁ, আমায় অনন্তকাল এই নরকে অপেক্ষা করতে হবে, আর তারপরে আরও অনন্ত সময় ধরে আমার এই মৃতদেহের উপর চালানো হবে অকথ্য অত্যাচার। নরকের সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কথা ভেবে আমায় মন আতঙ্কে ভরে উঠল। মাথার দু-পাশের রক্তনালীগুলি প্রচণ্ড চাপে দপদপ করতে লাগল। কানের মধ্যে রক্ত চলাচল এত দ্রুত হচ্ছিল, যেন আমি কোনও সমুদ্রের পাশে বসে আছি, তবু আমি শরীরটা নাড়াতে পারলাম না।

জানি না আরও কত সময় চলে গেছে, হঠাৎ বাইরে আবার সেই হোঁচট খেতে খেতে আসা পায়ের শব্দ পেলাম। তার সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছে সুঠাম পদচারণার অধিকারী কেউ। আমি তখন আবার চোখ বুজে, ঠোঁট চেপে কাঠের মতো শুয়ে আছি। নিশ্বাস চেপে আছি, আমার এই হতভাগ্য শরীরটাকে অত্যাচারে ভরিয়ে তোলার আনন্দ আমি ওদের পেতে দেব না কিছুতেই। দরজার ওপার থেকে কথাবার্তার মতো কিছু শব্দ ভেসে এল, মানুষের গলার মতোই লাগছে। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে নিয়েই আলোচনা করছে। আমাকে শান্ত থাকতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার উপরে একটা অংশ ঝনাৎ করে সরে গেল, উঁকি দিল দুরুদুরু মশালের আলো। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম চোখের পাতা না কুঁচকে একই ভাবে শুয়ে থাকতে। কিছুক্ষণ পরে মশালটি দরজার ওপারে আবার সরে গেল। আর তখনই আমার মনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার বুক চিড়ে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। ওরা নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি! আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমার নিজের উপর থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সরে গেল। চোখ খুলে গেল, মুখটা ভয়ে বেঁকে গিয়ে একপাশ থেকে লালা ঝড়তে শুরু করল। কর্কশ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছায়ামূর্তি।

নিয়ন্ত্রণ হারালে চলবে না, ওরা নিশ্চয়ই চিরকাল এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। এখনও সময় আছে ওদের বোকা বানানোর। কিন্তু আমার মুখটা তখন একটা অচেনা মুখোশের মতো বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে। একজন আগন্তুকের থেকে বিজয়সূচক উচ্ছ্বাসধ্বনি ছিটকে এল।

আর আশা নেই, এই অচেনা শরীরটাই আমার কাল হল। মরিয়া হয়ে চোখটা খুলেই ফেললাম, আর হারানোর কিছু নেই। মশালের আলোয় দেখা

যাচ্ছে একটা বামনাকৃতি বিকট চেহারা আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, লোকটার দুটো মাথার একটায় সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ জড়ানো। তার পাশে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রোগা কমবয়সি চশমা-পরা আরেকটি লোক। তার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, একদৃষ্টে সে খুঁটিয়ে দেখছে আমার শরীর। শেষ পর্যন্ত সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার মুখে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট।

এরা কি নরকের দূত? তাহলে তো এদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তা মিলছে না? আলোয় চোখটা সয়ে এলে বুঝলাম প্রথম লোকটার দ্বিতীয় মাথা যেটা ভাবছিলাম সেটা একটা বড় কুঁজ। লোকটার সারা গায়ে সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

তার মানে এরা আমাকে উদ্ধার করেছে! আমি সত্যি বেঁচে আছি! কোনও অসুস্থতার কারণে শুধু হাত-পা নাড়াতে পারছি না। আমি হাতটা যতটা সম্ভব তুলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমি বেঁচে আছি। তরুণটি একবার সেদিকে তাকাল, কিন্তু তারপরে আবার আমার বাকি অঙ্গগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। পাশের বামনটি জড়িয়ে জড়িয়ে তরুণটিকে কিছু বলল।

'ভুল! সব ভুল! আবার অসফল হলাম!' তরুণটি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল। 'আমি আস্ত বোকা একটা, এমন উজ্জ্বল ধীসম্পন্ন মস্তিষ্ক! ভেবেছিলাম আবার তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে পারব! আর তার জায়গায় তৈরি হল এই জড়বোধসম্পন্ন প্রাণীটি!'

বামনটি জিজ্ঞাসা করল আমায় নিয়ে কী করা উচিত। তরুণ হেলায় ভরে উত্তর দিল যে, সে আমায় নিয়ে কোনওভাবেই উৎসাহী নয়। এরপর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে সে ঘরটা ছেড়ে চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম আমার জিভটাকে নাড়াতে। কেউ ফিরে আসলে আমার বুদ্ধিমত্তা আর চিন্তাশক্তির প্রমাণ দিতেই হবে। আমি শুনতে পেয়েছি বামনটি তার মালিককে কী নামে ডাকছিল। আমার অসাড় জিভটা প্রাণপণে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে চাইছিল – 'ফ্রানক-এন-স্টিন'।

‘It is a subject also of additional interest to the author that this story was begun in the majestic region where the scene is principally laid, and in society which cannot cease to be regretted. I passed the summer of 1816 in the environs of Geneva. The season was cold and rainy, and in the evenings, we crowded around a blazing wood fire, and occasionally amused ourselves with some German stories of ghosts, which happened to fall into our hands. These tales excited in us a playful desire of imitation. Two other friends (a tale from the pen of one of whom would be far more acceptable to the public than anything I can ever hope to produce) and myself agreed to write each a story founded on some supernatural occurrence.

The weather, however, suddenly became serene; and my two friends left me on a journey among the Alps, and lost, in the magnificent scenes which they present, all memory

of their ghostly visions. The following tale is the only one which has been completed.'

—Mary Shelly (The Preface from Frankenstein Or The Modern Prometheus)

'মেরি[১], এভাবে একেবারে একা কেন বসে আছ বাইরে? এদিকে বাড়ির মধ্যে সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে তোমাকে। আড্ডার ফাঁকে আমিও খেয়াল করিনি যে, কখন তুমি বেরিয়ে এসেছ ঘর থেকে। কনকনে হাওয়া বইছে, ভেতরে চলো, ঠান্ডা লেগে যাবে। এই কয়েক মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যেন পুরো জমে গেছি।'

লেক জেনিভার দিক থেকে বয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের শব্দ আকাশ জুড়ে

একটা অপসৃয়মাণ হাহাকারের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। ভারী হয়ে আসছে বাতাস। কী এক অজানা পাখি ডাক দিয়ে চলে গেল পথহারার মতো। সে ডাক গম্ভীর, তার স্বরে কন্ট্রাল্টো গায়িকার চাপা অনুনাদ লুকিয়ে আছে। কোরিন্থিয়ান কলামের গায়ে কালচে সবুজ গুল্মরাজি মেডুসার চুলের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে রয়েছে। আর তার নীচে একা বসে মেরি, আবছায়া একটা সিল্যুয়েটের মতো। ওঁর দৃষ্টি উদাস, বিমনা। দূর দিগন্তরেখায় অস্তরাগের শেষ চালচিত্রকে তখন ঘিরে ধরেছে প্রায় জান্তব আকৃতির মেঘের দল। আলতামিরার খ্যাপা বাইসনের মতো তারা ফুঁসছে, তাদের সম্মিলিত বিন্যাস ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ক্রন্দসীর ছায়াঘেরা পথে। মেরির অধীর দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ। সাঁঝবেলায় প্রায় অলৌকিক রহস্যের অভিসারে আচ্ছন্ন পরিবেশ।

'আকাশের কোণে ওই মেঘটাকে দেখেছ পার্সি? মনে হয় যেন কেমন অস্থির হয়ে খুঁজে চলেছে সাথীকে!'[২] মেরির মুখর নীরবতা ভেঙে গেল আচম্বিতে। পার্সি মুখ তুলে তাকায় অভীষ্ট মেঘটার দিকে। 'বাতাসের গহনে লুকিয়ে থাকা সেই অতৃপ্ত আত্মাদের কথা মনে পড়ছে আমার। তাদের হাহাকার ঝড়ের শব্দের মতো। মাঝে মাঝে এমন ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাবার সময় আমার মনে হয়, যেন কত চাপা কান্না, কত নিস্ফল আক্রোশ লড়াই করে যাচ্ছে ওই হাওয়ার ভেতরে। এখনও তাই মনে হচ্ছে। আজ সাঁঝবেলায়

সোঁদা বাতাসের এই ছোঁয়াগুলো অতীতের সেই জিনদের মতোই ঘিরে ধরছে আমাকে। তোমার কবিতায় যেমন শব্দের আভাসের মধ্যে দিয়ে তাদের এঁকেছ তুমি। এই অন্ধকারে তোমার কবিতা কেবলই মনে পড়ছে আমার।’(৩)

‘বাড়ির ভেতরে চলো মেরি। এমন আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই আসে। তবে সবসময় তাকে বেশি প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। আর বায়রন(৪) অনেকক্ষণ ধরে ওয়াইনের বোতলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ভিন্টেজ কালেকশন! সে বলল, প্রায় ষাট বছর আগেকার। এই লটের প্রথমটা নাকি অভিনেতা গ্যারিক(৫) কিনেছিলেন। ভাবা যায়! হয়তো হ্যামলেটের স্বগতোক্তিগুলো বলার সময় ওই ওয়াইনে চুমুক দিয়েই মঞ্চে ঢুকতেন গ্যারিক।’ পার্সি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয় মেরির দিকে।

‘সেই ওয়াইনের রং বোধ করি তীব্র লাল হবে। প্রায় অনর্থক রক্তপাতের মতো! মনে আছে, আমার মরা মেয়েকে তোমরা সাদা স্যাটিনে মুড়ে নিয়ে চলে গেছিলে একদিন। আমিও তখন শুয়ে ছিলাম অমন গাঢ় লাল একদলা রক্তের মধ্যে। গলার কাছে যেন ভারী হয়ে আছে সেই ছবিটা, আমাকে দমবন্ধ করে দেয় মাঝে মাঝে। সেটা অবশ্য বছরখানেক আগেকারই কথা। বায়রনের ওয়াইনের মতো ভিন্টেজ নয়। আমার সেই মেয়ে এখনও আসে আমার কাছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে, কখনও আবার ভোরের দিকে। আবার এখন ওই কালো মেঘের মধ্যে যেন ছোট ছোট আঙুলগুলো নেড়ে ডেকে যাচ্ছে আমাকে।
আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি...’

পার্সি এসে মেরির দুই ঠোঁটের ওপর আড়াআড়িভাবে ওর তর্জনীটা রেখে উদ্যত শব্দগুলোকে আটকে দেয়। ‘চলো ভেতরে। লেকের দিক থেকে কনকনে হাওয়া আসছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে এখুনি। আর... (একটু থেমে) ওই কষ্টটা তোমার মতো আমিও বয়ে বেড়াচ্ছি মেরি।’ দু’জনে দু’জনের চোখের দিকে তাকিয়ে, ব্যথার নিস্তরঙ্গ সাগরে আনতপ্রায় ঢেউ ওঠার অপেক্ষা যেন করে আছে পৃথিবী।

ভিলা দিওদাতির দোতলায় লেকের দিক বরাবর বড় ঘরটায় তখন ফায়ারপ্লেসের আগুনের লেলিহান শিখাগুলো সাড়া পেয়েছে কোনও এক ধূসর অতীতের। এক অদ্ভুত বিচ্ছুরণ তাদের মধ্যে, কীসের এক চাঞ্চল্য! সেই গনগনে আগুন ঘিরে পাত্রপাত্রীরা বসে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে লর্ড

বায়রনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বন্ধু জন[৬] একটা নতুন গল্পের খসড়া পড়ে শোনাচ্ছিল। তার একপাশে ক্লারা[৭] আর উলটোদিকে লর্ড জর্জ বায়রন। শুনতে শুনতে জর্জের দৃষ্টি মাঝে মাঝেই ক্লারার দেহের সুডৌল বর্ণিকাভঙ্গ মেপে নিচ্ছে উদ্ধত দৃষ্টিতে। আর সেই ফাঁকে দৃষ্টিবিনিময় হলেই একটা লালচে আভা এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে ক্লারার দু'গালে।

'অব্রে জানে না এই প্রহেলিকার রহস্য। তার স্বাভাবিক বোধগুলো এখন কাজ করছে না আর। রোমের অলিগলির মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে সেই রহস্যময় ছায়া। সে কি মানুষ না বিদেহী এক ভ্যাম্পায়ার! লর্ড উটভেন (রুথভেন) কোন সেই ভয়ঙ্কর কথাটা লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন ওর কাছ থেকে!'

'আরে মেরি, এসো এসো। তোমার জন্যই সবাই মিলে বসে আছি।' জর্জ উঠে দাঁড়াল এক আদর্শ হোস্টের মতো। মেরি আর পার্সি তখন সেই ফায়ারপ্লেসের উলটোদিকে বড় আরামকেদারায় বসে পড়ে। মেরির কাঁধের চাদর টেনে দেয় পার্সি।

'আমাদের ডাক্তার জন এক দারুণ ভূতের গল্প লেখা শুরু করেছে। আমি তো বলছি, এটা গুছিয়ে বড় করে লিখে ফেলো ডাক্তার। বেশ ছমছমে একটা ভাব এসেছে লেখাটার মধ্যে।'

'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ডাক্তার পলিডোরি?' মেরি কিছুটা উদ্যতভাবেই বলে ওঠে।

'দেখুন, চিকিৎসক হিসেবে আমার দায় বিজ্ঞানের কাছে। তাই আষাঢ়ে, প্রমাণ-অযোগ্য কোনওকিছু বিশ্বাস করতে পারি না আমি। কিন্তু, তা বলে তো গথিক সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই আমার। আর আজকের পরিবেশটাই যখন আদর্শ এই ধরনের গল্পের জন্য।'

'আরে রাখো তোমার আষাঢ়ে!' জর্জের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিল।

'এই গ্রীষ্মকালে আমরা পাঁচজনে মিলে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসেও প্রবল ঠান্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছি। এ-ও কি কম আষাঢ়ে? এদিকে মনে হচ্ছে বৃষ্টিও আসতে চলেছে প্রবলভাবে। আমি তো ভাবছি পার্সির মতো করে গ্রীষ্মের একটা গীতিকাব্য লিখব। যেখানে গ্রীষ্ম হবে মায়াবী, কুহকিনী একটা মেয়ে। বলো ডাক্তার, অসময়ে এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডার কী ব্যাখ্যা!'

'ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। বিজ্ঞানীরা ঠিকই ধরতে পারবেন ভবিষ্যতে। অনেক সময় সমকালে বোঝা না গেলেও বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে

আগামী দিনে ঠিক বেরিয়ে আসে সত্যিটা। যেমন ধরুন, এখন আর বোধ করি কোনও বাচ্চাকেই ভোলাতে পারবেন না পৃথিবীর আকৃতি চৌকো বলে। কিন্তু ভাবুন তো এক সময় এটাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। বোলোনার সেই ডাক্তার গ্যালভানির[৮] কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সবার। প্রাণীবিদ্যুৎ নিয়ে কত পরীক্ষা করেছিলেন। ওর পরীক্ষায় সেই মরা ব্যাঙের পা-টা যখন কেঁপে উঠছিল, তখন সেখানে উপস্থিত জনেরা চমকে উঠতেন ভয়ে। গ্যালভানি প্রাণীবিদ্যুৎ নিয়ে তার ব্যাখ্যায় প্রাথমিকভাবে হতবাক করে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের। প্রফেসর ভোল্টা[৯] যদিও অন্য মত দিয়েছিলেন ওই ব্যাপারে। সত্যি বলতে কি, আমরা এখনও সঠিকভাবে জানি না রহস্যটা। সত্যিই কি ওই ব্যাঙের পাগুলো নড়ে উঠছিল ওর শরীরের নিজস্ব বিদ্যুতের প্রভাবে, নাকি অন্য কিছু? আজ না জানলেও আগামী দিনে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন ওই রহস্য।' পলিডোরির গলায় প্রত্যয়ের সুর।

'থাক। আমাদের আড্ডায় তোমাদের জটিল বিজ্ঞান থাক এখন। সময়টা যখন ভূতের গল্পের জন্য আদর্শ তখন আমার প্রস্তাব যে, সবাই মিলে একটা মজার খেলা খেলা যাক। জন যেমন তার লেখা শুরু করে দিয়েছে তেমনি আমরাও সবাই মিলে এমন গথিক গল্প লিখি না কেন। গল্পগুলো হতে হবে মৌলিক।' ফায়ারপ্লেসের আগুনে আরও কাঠ গুঁজে দিতে দিতে বলে উঠল জর্জ।

'পার্সি, তোমার মনে আছে ওডেনভাল্ডের ছমছমে দূর্গটার কথা? সেই জনৈক অ্যালকেমিস্ট ইওহান ডিপেল[১০] যেখানে মৃতদেহগুলোকে কবর থেকে খুঁড়ে বের করে তাঁর সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষাগুলো করতেন!' মেরির গলায় মন্দ্রসপ্তকের একটা লুকনো কিন্তু অস্থির আন্দোলন। যেন কুয়াশার ভেতর থেকে সেই শব্দগুলো ভেসে আসছে। ওই ঘরের সবাই টের পেল ওর গলার স্বরে কুহকের স্পষ্ট ছোঁয়া।

'ও বুঝেছি! যে বার তুমি, ক্লারা আর আমি মিলে বেড়াতে বেড়াতে ডার্মস্ট্যাটের দিকে চলে গেছিলাম। সেই দূর্গটা সত্যি যেন অতীত থেকে আসা একটা প্রেতের মতো পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে ছিল।' পার্সি সেই ভ্রমণের স্মৃতি রোমন্থন করে।

'প্রেতই বটে! আমরা কিন্তু চারজন ছিলাম সেবার! আরেকজন ঘুমের মধ্যে অস্ফুট হয়ে ছিল আমার ভেতরে। জন্মদাত্রী মায়ের কোনও স্মৃতি নেই আমার কাছে। ওই একজনকে নিজের শরীরে, নিজের সত্তায় বয়ে বেড়ানোর প্রতিটা

দিনের স্মৃতি এখনও স্পষ্ট আমার কাছে।' কিছুটা মৃদু স্বরে বলে ওঠে মেরি, প্রায় ঘোরের মধ্যে। তারপর ওই ঘরের মধ্যে বাকি সবার উপস্থিতি অনুভব করে, সংবিৎ পেয়ে ডাক্তার পলিডোরির দিকে ফিরে চায় সে।

'আচ্ছা সেই মরা ব্যাঙটাকে পুরো বাঁচিয়ে তোলা যেত না ডাক্তার! যদি আরও বেশি বিদ্যুতের জোগান দেওয়া যেত বাইরে থেকে।' মেরির দৃষ্টিতে সজাগ প্রশ্ন।

'ডক্টর গ্যালভানি তো পরীক্ষাটা করেছিলেন শুধু ব্যাঙের দুটো কাটা পা নিয়ে। সে দুটো বাকি দেহ ছাড়া বেঁচে উঠলেও বোধ করি কোনও সুরাহা হতো না। মানে ধড় ছাড়া শুধু পা...'

'তোমরা দু'জনে সেই ব্যাঙের পা নিয়ে পড়লে আবার। ওসব ছাড়ো এখন। তার চেয়ে এই প্রবল ঠান্ডায় আমরা চলো লালচে মদিরায় গলা ভিজিয়ে নিই। এই সন্ধ্যায় প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোদেতিকে আহ্বান জানাতে পারি আমরা, কথা বলতে পারি মধ্যপ্রাচ্যের কাব্যসঙ্গীত নিয়ে। কিংবা আমার কাব্যে জোলেখা সেলিমের(১১) প্রেমের গভীর আখ্যান পড়ে শোনাতে পারি তোমাদের। আবার চাইলে হ্যান্ডেলের(১২) অর্গান কনচার্টোর অমর সুরলহরী ভেসে আসতে পারে ওই পিয়ানোর মধ্যে দিয়ে। মেরি, ক্লারা, জন তোমরা যে কেউ গিয়ে ওই পড়ে থাকা অর্গানটার সদ্ব্যবহার করতে পারো। সেসব কিছু না করে ব্যাঙের কাটা পা! ক্লারা তোমার এই বোনকে নিয়ে আর পারা গেল না!' ওয়াইন গ্লাসে রক্তিম সুরা ঢালতে ঢালতে বলে উঠল জর্জি বায়রন।

'মাননীয় বায়রন, ওই ওয়াইন গ্লাসের মধ্যে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বেশ অদ্ভুত লাগছে, তাই না! ঠিক যেন মানুষেরই নয়! অথচ, এটা কিন্তু আপনার চেনা মুখ। ঠিক তেমনিভাবে আমিও আমার বাবার(১৩) কাছে সত্যির আপাত ভাষ্যকে পারিপার্শ্বিকের আলোয় মেপে নিতে শিখেছি। কাব্যের মধ্যে জীবনের নানা রঙের বর্ণালী আমাকেও স্পর্শ করে। আপনার কাব্যের আমি এক গুণমুগ্ধ পাঠক। কিন্তু ওইসব নানা রঙের বানিয়ে তোলা শব্দ যেন একটা গভীর সত্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। সেটাও কি কবির কাম্য নয়? যে সত্যির অনেকগুলো মুখ থাকে। যাইহোক, এই সন্ধেবেলায় সেসব কথা আর বাড়াব না।'

ঘরের উত্তাপ আরও কমে গেছে হঠাৎ এই কথার প্রতিধ্বনিতে।

'আচ্ছা, এত কথার মধ্যে আমার কিন্তু প্রবল খিদে পেয়ে গেছে। ডিনারে আমাদের জন্য আজ কী বরাদ্দ বায়রন? এই শীতে যেটা চাই, সেটা হল সুইস

চিকেন বেকড্ ব্রেস্ট, আর তার সঙ্গে কনিয়াক।' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য পার্সি এগিয়ে আসে।

'কবিতা না লিখে নাটক লেখা উচিত ছিল তোমার পার্সি! কী দ্রুত নতুন দৃশ্যে চলে যেতে পারো! হ্যারিয়েটের(১৪) সঙ্গে ঝগড়ার সময়েও তুমি কি এমনভাবেই সামাল দাও? নাকি আমাকেই তোমার ভয় বেশি!'

মেরির দৃষ্টি ওই ফায়ারপ্লেসের শিখাগুলোর মতোই গনগনে লাল হয়ে গেছে। তার সামনে কিছুটা অসহায় পার্সি।

'আমি রাজি মাননীয় বায়রন। আপনার আগের প্রস্তাবটা আমার ভালো লেগেছে। গথিক ভয়ের গল্পই লিখতে চেষ্টা করব আমি।' মেরির মুখমণ্ডলের গনগনে আঁচের দীপ্তি তার গলার স্বরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'দারুণ হবে মেরি। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধারণামতো সেই প্রেতের কাহিনি লিখছি তাহলে। এই রাতে তোমরাও আর মেজঁ সাপ্যুইতে ফেরার কথা ভেবো না। ডিনার এল বলে আর আমার প্যান্ট্রিতে অঢেল জোগান রয়েছে সবার জন্য।'

জর্জ বায়রনের গলায় প্রবল উৎসাহ। এর ঠিক আগের মুহূর্তের হঠাৎ জেগে ওঠা শৈত্য যেন মিলিয়ে যাচ্ছে ওই ঘর থেকে। গনগনে আগুনের হোমশিখা গরম করে দিচ্ছে ওই গোধূলির হিম ধূসরতাকে। মেরির মনের গভীরেও কেউ আহ্বান জানিয়েছে অতীতের চোরাকুঠুরি থেকে। সৃষ্টির অসীম রহস্যের এপারে যে পর্দা আছে, যার নিঃসীম ধোঁয়াটে কিনারাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠলে দুর্লঙ্ঘ্য সেই জগতের খবর আসে আলোর মারফত, মেরি সেই আলোর ছোঁয়া দেখতে পেল আকাশে। দোতলার সেই বড়ো ঘরের বিরাট জানলা, ভিলা দিওদাতির কোরিন্থিয়ান কলামের বারোক স্থাপত্যের আড়াল আবডাল এসব পেরিয়ে তখন অতীতের অজস্র প্রেতের কান্না ভেসে আসছে ছায়াপথে। সেই কান্না শুনছে শুধু মেরি। সেই আলোছায়া, বাতাসের সেই গভীর নিশ্বাসের ভেতরে পুনর্জন্ম নিচ্ছে এক ছায়াশরীর। যার ব্যথাভরা স্বগতোক্তি শোনা যাবে আগামীদিনে আমাদের সবার অযুত নিযুত দুঃস্বপ্নের রঙ্গমঞ্চে। স্বপ্নের যে যবনিকার কোণে লেগে থাকা রং ওই ভিন্টেজ ওয়াইনের মতো গাঢ় লাল।

পরিচিতি:

(১) মেরি ওলস্টোনক্রাফট শেলি।

(২) পার্সি বিস্ শেলি (ব্রিটিশ রোম্যান্টিক কাব্য অধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি)।

(৩) Oh! there are spirits of the air,
And genii of the evening breeze,
And gentle ghosts, with eyes as fair
As star-beams among twilight trees ...
P.B. Shelly, Alastor or The Spirit of Solitude (1816)

(৪) লর্ড জর্জ গর্ডন বায়রন (ষষ্ঠ ব্যারন বায়রন, এফআরএস, বিখ্যাত রোম্যান্টিক কবি এবং রাজনীতিবিদ)।

(৫) ডেভিড গ্যারিক (বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা)।

(৬) জন পলিডোরি (চিকিৎসক এবং প্রখ্যাত লেখক, ওঁর বিখ্যাত রচনা 'ভ্যাম্পায়ার')।

(৭) ক্লারা মেরি জেন ক্লেরমঁ (সম্পর্কে মেরির বৈমাত্রেয় বোন, একসময়ে লর্ড বায়রনের প্রেমিকা। ওঁদের মেয়ের নাম অ্যালেগ্রা)।

(৮) লুইজি অ্যালোসিয়ো গ্যালভানি (ইটালির চিকিৎসক এবং পদার্থবিদ)।

(৯) আলেসান্দ্রো ভোল্টা (ইটালির প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, তড়িৎ বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা। ওঁর আবিষ্কৃত 'ভোল্টেইক পাইল'-ই ব্যাটারির আদি রূপ)।

(১০) ইওহান কনরাড ডিপেল (বিতর্কিত থিয়োলজিয়ান এবং অ্যালকেমিস্ট যার আবাস ছিল 'ক্যাসল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন')।

(১১) দ্য ব্রাইড অফ অ্যাবিডস।

(১২) জর্জ ফ্রিডরিক হ্যান্ডেল (বারোক যুগের প্রখ্যাত জার্মান সুরস্রষ্টা, যদিও জীবনের বেশির ভাগটাই কাটে ইংল্যান্ডে)।

(১৩) উইলিয়াম গডউইন (প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)।

(১৪) হ্যারিয়েট শেলি ওয়েস্টব্রুক (পার্সি বিস্ শেলির প্রথমা স্ত্রী। এই গল্পে উল্লিখিত সময়ের কয়েকদিনের মধ্যেই হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পার্সি ও মেরি সামাজিকভাবে বিয়ে করেন)।

আয়নার ঠান্ডা কাচ ও অষ্টাদশীর স্বপ্ন



বিশ্বদীপ দে

রাতের এই সব জনহীন রাস্তা আর আধো-অন্ধকার বাড়ির রহস্যময় জানলার দিকে তাকালে আমার মনে হয়, আজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এই সব বাড়ির নির্জন কোনও কোণ কিংবা রাস্তার ধারেকাছের কোনও ঝোপ— কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছ তুমি। আছ কি?

নাকি তুমি আমাদের রক্তমাংসের দুনিয়া ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে স্বপ্নেই ফিরে গেছ? যে স্বপ্নের ভিতরে তোমার জন্ম। মনে আছে, কেমন তীব্র শীত পড়েছিল সেবার? সময়টা 'সামার' হলেও হাড় কাঁপানো শীতে সেবার জবুথবু ইউরোপ। সেবারের গ্রীষ্ম বিখ্যাত হয়ে আছে 'দ্য ইয়ার উইদাউট আ সামার' নামে।

সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে চারজনের জমায়েত। উইলিয়াম গডউইন ও মেরি ওলস্টোনক্রাফটের কন্যা ষোড়শী মেরিকে নিয়ে পালিয়েছেন পার্সি শেলি। পকেটের অবস্থা শোচনীয়! এদিকে ব্যভিচারের ফলে সিফিলিসের মতো জঘন্য অসুখ বাসা বেঁধেছে শরীরে। বারেবারে গর্ভপাতে কাহিল মেরিও। ঘুরতে ঘুরতে দু'জনে হাজির বায়রনের ভাড়া বাড়িতে। বায়রন সেখানে রয়েছেন এক তুতো বোনের সঙ্গে। কনকনে ঠান্ডায় মধ্যে ভূতের গল্প লেখার চ্যালেঞ্জ। আর তারপরই স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠলে তুমি...

তোমাকে কি কখনও ভালোবেসেছিলেন তোমার স্রষ্টা? না হলে কেন তোমার রেখে দেবেন নামহীন! এই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' নামটাই লোকের কাছে তোমার নাম। অথচ সে তো সেই বিজ্ঞানীর! তুমি কে? কেবলই নামহীন এক দানব? অন্ধকার থেকে অন্ধকার... তারপর আরও ঘন অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে যাওয়াই যার নিয়তি! মেরিই তো লিখে গিয়েছেন, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়লে তুমি, নিজেকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি আত্মহত্যা করেছিলে তুমি?

উঁহু। আমি জানি তুমি আসলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। তুমি আছ, আজও। না

হলে আমি কেন খুঁজব তোমায়, বলো?

(২)

মাঝে মাঝে এমন সংলাপ মাথার মধ্যে চলকে ওঠে। আর বাড়ি ফিরে লাভক্র্যাফট
খুলে বসি। এইচ পি লাভক্র্যাফট। কেননা মেরি শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর কথা মনে হলে আমার 'আউটসাইডার' নামের সেই অসামান্য কাহিনির কথাও মনে পড়ে। লাভক্র্যাফটের গল্পের সেই উত্তমপুরুষ চরিত্রও তো চূড়ান্ত একলা একজন মানুষ। মানুষ! লিখতে গিয়ে থমকাতেই হয়। কে বলল মানুষ! মানুষ হলে তাকে দেখে ভয়ে কেন পালাবে সবাই! তা ছাড়া সে তো নিজেই বলেছে, ''আমি সব সময়েই জানতাম আমি একজন বহিরাগত। যারা এখনও মানুষ, তাদের মধ্যে আমি একজন আগন্তুক।''

একটা হাসিখুশি পার্টির মধ্যে সেই আগন্তুক এসে দাঁড়াতেই সমস্ত আলোময় আনন্দের মধ্যে কে যেন কালির স্রোত ঢেলে দিয়েছিল। আতঙ্কে হলদে হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে সবাই পড়িমরি করে পালিয়েছিল। আর অত বড় হলঘরে একেবারে একলা হয়ে বিস্মিত সেই আগন্তুক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। সামান্য এগোতেই সে এসে দাঁড়িয়েছিল আর এক ভয়ঙ্করের সামনে! কে সে! বিস্ময়ে তার দিকে আঙুল সামান্য বাড়াতেই সে স্পর্শ করেছিল... না, কোনও শরীর নয়। আয়নার হিমশীতল কাচ! বুঝতে পেরেছিল এই তার নিয়তি। নিজের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কেউ নেই তার সঙ্গে। আর সেই প্রতিবিম্বও এমনই ভয়ঙ্কর, যার সঙ্গে থাকতে গেলে গা শিউরে ওঠে।

সেই আগন্তুকের সঙ্গে আমি 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর দানবের কোনও তফাত দেখি না। দু'জনেই তারা ভয়ঙ্কর। দু'জনেই অসম্ভব একা।

বারবার 'ভয়ঙ্কর' কথাটা লিখতে লিখতে থমকাতে হল। কেন ভয়ঙ্কর? কীসের ভয়ঙ্কর? আসলে বলা উচিত 'ভয়ঙ্কর দর্শন'। লাভক্র্যাফটের গল্পের এই চরিত্র হোক বা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানব'— এদের সবচেয়ে বড় শত্রু এদের মুখ। দেখলেই মনে হয়, সেই মুখে লেগে রয়েছে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার নারকীয় আঁতাতের চিহ্ন। আর এখানেই উঠে আসে প্রশ্ন। 'কুরূপ' বলেই ভয় পেতে হবে? বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে মানুষের সমাজ থেকে! বহিরাবয়বে ভয় জাগাচ্ছে মানে সে ভিতরেও অতটাই বিপজ্জনক? কী এক সরল সমীকরণে দু'টো একাকার হয়ে যায়।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ‘দানব’ জানত সে কুৎসিত। এমনকী, তার স্রষ্টা পাগল বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সকলের থেকে একলা হয়ে যাওয়া সেই দানব চেয়েছিল নিজের মতো করে বাঁচতে। নিজের মতোই এক কুরূপাকে সঙ্গিনী হিসেবে চেয়েছিল সে। প্রথমে রাজি হয়েও পরে পিছিয়ে আসেন ভিক্টর। যদি দুই কুরূপ আর কুরূপার মিলনে পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় আরেক ভয়ঙ্কর, এই আশঙ্কায়। এরপর ক্রুদ্ধ সেই দানব যখন ভিক্টরের সদ্য পরিণীতা নববধূর শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তখন তার সেই হত্যালীলা ‘জাস্টিফায়েড’ হয় না ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা মানুষের প্রকৃতিকেই তুলে ধরে। দানব বলে, ‘ইফ আই ক্যান নট ইন্সপায়ার লাভ, আই
উইল কজ ফিয়ার!’

‘অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে’ দানব হয়ে ওঠে হিংস্র। তার এই হিংসা কি অভূতপূর্ব? মহাকাব্য থেকে পুরাণ কিংবা ইতিহাস— এমনটাই তো দেখে এসেছি আমরা। আমি না পেলে আমি কাউকেই পেতে দেব না, এ তো কেবল ওই দানবের ইচ্ছে নয়। তাহলে তাকে আলাদা করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অর্থ কী?

‘সাটান হ্যাজ হিজ কম্প্যানিয়নস, ফেলো ডেভিলস... বাট আই অ্যাম সলিটারি অ্যান্ড ডিটেস্টেড।’

শয়তান তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে আছে, কিন্তু আমি একলা। মেরি শেলির উপন্যাসের এই অমোঘ সংলাপেই ধরা রয়েছে সবটা।

(৩)

এ লেখা লিখতে লিখতে কবেকার একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। একজন সামান্য কলমচির স্বপ্নে কারও আগ্রহ থাকার কথা নয়, জানি। তবু বলতে চাই। কেননা আমার ধারণা, এই স্বপ্ন আসলে আমি একা দেখিনি। আরও অনেকে দেখেছে। হয়তো দৃশ্যগুলো এক নয়। তবু...

অন্ধকার এক রাস্তায় একটা ভয়ঙ্কর দর্শন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে যাকে ছুঁয়ে দেবে, সে-ই তার মতো হয়ে যাবে। তাই সে কারও কাছে ঘেঁষতে এলেই সবাই পড়িমরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার শরীরটা ঠিক কেমন ছিল, তা ঘুম ভাঙার পরে আর মনে নেই। কিন্তু তার চোখ-নাক-মুখ যে কুষ্ঠ রোগীর মতো বিকৃত ছিল সেটা স্পষ্ট মনে আছে। সে কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্য লোকেদের কাছে যাচ্ছে। আর বাকিরা চোর-পুলিশ খেলার

মেজাজে পালিয়ে যাচ্ছে। শেষমেশ লোকটা আমার একেবারে কাছে চলে এল। আর আমি সরে যাওয়ার আগেই আমায় আঁচড়ে দিল!

স্বপ্নের মধ্যে আঁচড়ে দেওয়ার মুহূর্তটা আমার কাছে দারুণ জ্যান্ত বলে মনে হয়েছিল। আরও কিছু ছিল সেই স্বপ্নে, সেটা স্পষ্ট মনে নেই। কেবল, আঁচড়ের পর মুহূর্তে লোকটার অশ্লীল হাসিটা মনে রয়ে গিয়েছে।

ওই লোকটা, চেহারা-চরিত্রে যাকে একজন দানবের মতোই মনে হয়, সে-ও চাইছিল একজন সঙ্গী। যে ঠিক তারই মতো হবে। অবিকল 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর দানবের আকুতি। আর সেটা ভাবতে গেলেই মনে হয়, মেরি শেলি না দেখলে ওই স্বপ্ন অন্য কেউ দেখত। দেখতে হতোই। কেননা, ওই দানব আমাদের স্বপ্নে স্বপ্নে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমার উত্তরপুরুষেরাও কখনও না কখনও স্বপ্নে ওই দানবকে দেখবেই। সভ্যতার অমোঘ নিয়তির মতো নানা রূপে, নানা চরিত্রে ওই দানবকে ফিরে ফিরে আসতেই হবে।

একটা স্বপ্ন থেকে আর একটা স্বপ্নে যাই। রবার্ট লুই স্টিভেনসন নামের এক
ব্যক্তি একদিন একটা স্বপ্ন দেখলেন। স্ত্রী ফ্যানি স্টিভেনসন আবিষ্কার করলেন তাঁর স্বামী ঘুমের মধ্যে ভয়ের স্বপ্ন দেখে মুখ দিয়ে কেমন শব্দ করছেন। তড়িঘড়ি স্বামীর ঘুম ভাঙান ফ্যানি। ঘুম ভেঙে স্ত্রীর ওপর প্রচণ্ড রেগে যান রবার্ট। বলেন, 'ডাকলে কেন? একটা অদ্ভুত ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম!'

এরপরই লেখা হয় 'স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'। ডক্টর হেনরি জেকিলের অল্টার ইগো এডওয়ার্ড হাইড। জেকিল হাসিখুশি। অথচ সে-ই যখন মিস্টার হাইড, তখন সে ভয়ঙ্কর।

এই উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর ছায়া টের পাওয়া যায়। আর ততই বোঝা যায়, নিজেদের ভিতরে যাকে ধারণ করে রাখছি আমরা, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না। বারে বারে সে স্বপ্নের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে বইয়ের পাতা, স্টেজ বা সিনেমা হলের অন্ধকার পর্দায় এসে দাঁড়াবে।

১৮২৩ সালে 'প্রিজাম্পশন, অর দ্য ফেট অফ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' নাটক দেখে লন্ডনে হলের ভিতরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন একাধিক মহিলা দর্শক! গা ছমছমে আলো-আঁধারিতে ঢাকা তৎকালীন লন্ডন শহরের বাসিন্দাদের মনের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছিল এক ভয়ঙ্কর দানবের মুখচ্ছবি। ভাবতে বসলে মনে হয়, এই ভয় আসলে কাকে? কাকে?

আর ভাবতে ভাবতেই বুঝতে পারি, তোমায় খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায় হল আয়না। অন্ধকার ঘরে রাতের নিস্তব্ধতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামতে থাকা আয়নার ঠান্ডা কাচ স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে। করি না। কেবল তাকিয়ে দেখি আয়নার ওপারের পৃথিবীকে। লুইস ক্যারলের অ্যালিস আয়নার দেশে গিয়েছিল। বয়স বাড়লে সেই পৃথিবীটা আর তেমন কোনও অজানা মজার দেশ থাকে না। একাকার হয়ে যায়।

আয়নার ভিতর থেকে তুমি বেরিয়ে এসে ক্রমশ ঢুকে পড়ছ আমার ভিতরে। নাকি আমিই আয়নার ভিতরে দাঁড়ানো তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবয়বের ভিতরে ঢুকে পড়তে থাকি? আমি যেমন তোমাকে খুঁজছি, তুমিও তো খুঁজছ আমায়! শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যেতে থাকে। আমার, আমাদের এই অন্বেষণ ফুরোবার নয়।

কবেকার এক অষ্টাদশীর স্বপ্নের ঘোর আজও সভ্যতাকে মগ্ন করে রাখে রাতের পর রাত।



সৃষ্টির নেশায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাল বিমানটি আকাশে উড়ল। পারমাণবিক তেজে আলোর সমগতি ব্যোমযানটি উড়ছে অসীম নীলিমার মধ্য দিয়ে। নীলিমার মুক্তির মধ্যে বসে অমৃতের স্বাদ অনুভব করলাম। পৃথিবী অমৃতময়। সমুদ্র মন্থনে গরল উঠেছিল ঠিকই; কিন্তু হলাহলের চেয়ে প্রাণপুঞ্জের পরিমাণই ছিল অধিক। তার কেঁদে ভারাক্রান্ত ধরিত্রী আজ বেঁচে আছে। বসুন্ধরার বিশুদ্ধ অক্সিজেন আজও আমাদের হৃদয় উদ্বোধিত করে।

যদিও ফেলে আসা কাহিনির তিক্তরসে মনটা ভারী হয়ে উঠেছে, তবুও এ চিন্তা আজ পাষাণ হয়ে চেপে নেই। মানুষই ভুল করে। মানুষেরই অধঃপতন হয়। তাই মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা অবজ্ঞা করতে মন চায় না।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের দিকে উড়ে চলেছি। ফেলে আসা পথে রিটা অপেক্ষা করছে অমৃতের পাত্র নিয়ে। ওর পাসপোর্ট পাইনি। যে যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আজ দীর্ঘ দশটি বছর পরে দেশে ফিরছি, তা দূর করে দেবে রিটার হৃদয়-মধু। মানুষ মানুষকে বিপদে, দুঃখে ভালোবাসবে, রক্ষা করবে তবেই তো আমাদের এই বিচিত্রা বিপুলা এবং সু-উন্নতা বসুমাতা গর্ব করবে সন্তান সৌভাগ্যে। তবেই তো কৃষ্টি ও সভ্যতায় তুলনামূলক বিচারে পিছিয়ে থাকা গ্রহান্তরের মানুষ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং হৃদয়ের উৎকর্ষের কাছে মাথা নত করবে।

নীচে সমুদ্রর জল দেখতে পাচ্ছি শক্তিশালী কাচের মধ্য দিয়ে। আমার অতীত স্মৃতিই যেন ওই নীল জলে ফসফরাস হয়ে জ্বলছে।

(২)

সানফ্রান্সিসকোর একেবারে পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের তীরেই বিশাল কারখানাটি। আধুনিক মহাকাশযান এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এখানে। এই কারখানাতেই চাকরীটা পেয়েছিলাম স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিদেশী বান্ধব মিঃ গিনেসের সুপারিশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান স্নাতক হয়ে বেরিয়েছি মাস দুয়েক আগে। হঠাৎ চাকরীটা পেয়েই বাড়ী থেকে বিদায় নিলাম।

চাকরীতে ঢুকে মাস কয়েক মনটা খারাপ লাগল মায়ের জন্য। বছর আড়াই সাধারণভাবে কাটল। কারখানার রসায়নাগারে আমার কাজ। রসায়নগারটি আকারে প্রকারে বিরাট। কারণ মহাকাশ যাত্রার সঙ্গে রসায়নের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। রসায়ন উন্নত হয়েছে নানা বিষয়ে। মহাকাশ সম্পর্কীয় গবেষণা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম খাবার। মানুষ আজ সংখ্যায় পৃথিবী থেকে উপচে পড়লেও কৃত্রিম খাদ্যগুণে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই বাস করছে। পৃথিবীর বাইরেও তাদের ঘর। মহাকাশযানের ভেতরকার জল যাতে নষ্ট না হয়, তা আবিষ্কার হওয়ার পরই পৃথিবীতে জলবিহীন স্থানের জলকষ্ট দূর হয়েছে।

পড়াশুনার সুবিধা এখানে চিরদিনই। তাই মাষ্টার ডিগ্রীটা পেতে অসুবিধা হল না। তারপর আড়াই বছর বাদে আমার সাধারণ জীবনযাত্রা বদলে গিয়ে অসাধারণ হয়ে উঠল।

ডঃ অ্যাণ্ডারসন কারখানাটির অন্যতম প্রধান পরিচালক। তাঁর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ডঃ ব্রুয়াণ। ভারতে থাকতেই এঁর সুনাম শুনেছি। শুনেছি, মহাকাশ-বিজ্ঞানের বর্তমান কর্ণধার ইনি। তা ছাড়া জীব-রসায়ন শাস্ত্রেও ইনি সমান পারদর্শী। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের কল্পকাহিনিকে ইনিই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তবে এঁর প্রণালী নাকি অসম্পূর্ণ ছিল প্রথমটায়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ প্রণালী আবিষ্কার করে গৌরবের ভাগীদার হয়েছেন।

এই আড়াই বছরে কারখানার নূতন উদ্ভাবনের কাজে কয়েকটি মৌলিক প্রণালী আবিষ্কার করায় আমার সুনাম হয়েছে কিছুটা। প্রৌঢ় পরিচালক ভদ্রলোকের অকৃত্রিম স্নেহাশীষ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছি এর ফলে। তিনিই গরজ করে জীব রসায়নের ওপর আমার থিসিসটি পাঠিয়েছেন বিজ্ঞান সভায়।

সেদিন উনি ডেকে হাসিমুখে দুটো সুসংবাদ শোনালেন। প্রথম, আমি ডক্টরেট পেয়েছি। দ্বিতীয়, বিজ্ঞানী ডঃ ব্রুয়ান আমাকে তার সহকারী হিসেবে পেতে চেয়েছেন। ডঃ অ্যাণ্ডারসনও আমাকেই উপযুক্ত মনে করেন এ কাজে। এ খবরে আমি আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলাম সেদিন। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সহকারী হয়ে কাজ করব— এ যে কল্পনাতীত সৌভাগ্য! আনন্দের আতিশয্যে সেদিন ডঃ অ্যাণ্ডারসনকে ভারতীয় প্রথায় প্রণাম করলাম। উনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। অনাবিল আনন্দে স্নেহাতুর মনটা ভরে উঠল।

তার পরদিন থেকেই ডঃ ব্রুয়ানের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় চলে এলাম। উত্তর কোণে সমুদ্রের আড়াআড়ি ফ্ল্যাটটিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ীর-ই লাগোয়া বিশাল পরীক্ষাগার। এরপর পরিচিত হলাম মিস সিমন এবং মিস্ অ্যানার সঙ্গে। সিমনের মাতৃসুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ক্রমে ক্রমে ওদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠলাম। ভারতীয় বিদেশীকে ওঁরা একান্ত আপন করে নিলেন।

(৩)

এখানে আসার পরদিন শূন্যমনে বসেছিলাম ঘরটিতে। দূরে জানলার ওপাশে নীল সমুদ্র। শ্বেত ফেনিল জল এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। চড়া রোদ এখানে
বেশি ওঠে না। আজ উঠেছে। সকাল বেলার তরীতরকারী ফেরিওয়ালা তার বিরাট গাড়ীটা নিয়ে আনন্দ করতে করতে ফিরছে। সমুদ্রের তীরে লাফালাফি করছে কয়েকটা শিশু। এ দেশে বসন্ত সমাগত।

পর্দার বাইরে থেকে মিষ্টি স্বর কানে এল— ভেতরে আসতে পারি আমরা? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলতে বলতে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলাম অ্যানা ও সিমনকে। ওরা অনেক কথা বললেন সেদিন। আমার পরিচয় নিলেন। জানলেন, আমার দেশে, বাবা নেই, মা বোন ভাই আছেন। আমি এবার অনুযোগ করলাম, আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করলেন, অথচ নিজেদের পরিচয় দিলেন না! শুধু স্বার্থপরের মতো আমার পরিচয় জানলেন!

অ্যানাই প্রথমে বলল, ক্ষমা করুন মিঃ রয়। আমার নাম মিস অ্যানা হেওয়ার্ড। আমি ডক্টরের বন্ধুর মেয়ে। বাবা বহুদিনই গত হয়েছেন। তারপর থেকে আমাকে এবং আমার স্বর্গতা মাকে ডক্টরই স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে দেখাশোনা করেছেন। বুঝলাম, ডঃ ব্রুয়ানকেই ডক্টর নামে অভিহিত করছে অ্যানা। আমি ভেবেছিলাম সিমন অ্যানার মা। তাই বললাম, তাহলে আপনার পরিচয় তো...?

সিমন আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বুঝেছি, তোমার প্রশ্ন অনুধাবন করতে পেরেছি। আমার জীবনটা খুব বৈচিত্র্যময়। ডক্টর যে ক-জনকে মৃত অবস্থা থেকে পুনর্জীবিত করেছেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার পূর্বের ইতিহাস এখন বলব না। সময়ে শুনতে পাবে। কথাগুলো মৃদু হেসে বলে সিমন থামলেন। ওঁর কথাবার্তায়, চেহারায়, ওঁকে অত্যন্ত উচ্চ অভিজাত বংশের মনে হল।

অ্যানা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর সম্পূর্ণ অবয়বটি এবার দেখলাম। শ্বেত শুভ্র একটি গাউন পরনে। শরীরের শুভ্রতার সঙ্গে পোষাকের ঔজ্জ্বল্য মিশে এক স্বর্গীয় সুষমার সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ কোণের সবুজ আলো জ্বলে উঠল। অলোর লেখা পড়লাম— 'এসো'। বুঝলাম, ডক্টর ডাকছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে সিমনও এলেন বাইরে। অ্যানা চলে গেল ডিনারের তদারক করতে।

(৪)

ডক্টরের ঘরে ঢুকতে একটু সংকোচজনিত ভয় হল। কি জানি তিনি কেমন! তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে বেশি সংযোগ রাখেন না। এ ধরনের সাধকগণ প্রায়ই রাগী মানুষ হন। ডক্টর যে বাইরের মানুষের কথায় কান না দিয়ে সমাজকে উপেক্ষা করে চলেন, তা বুঝেছি। কারণ, অবিবাহিতা অনাত্মীয়া সিমনকে নিয়ে এই দেশের সমাজেও কথা হয়, এবং ডক্টর আত্মবিশ্বাসে, প্রায় সদর্পেই তা উপেক্ষা করে চলেন। অবশ্য আত্মনিমগ্ন সাধকগণের পক্ষে এ সব ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা সম্ভবও নয়। কিন্তু ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হলাম। তাঁর চোখে মুখে নৈর্ব্যক্তিকতার ছোঁয়া মাখানো। জগৎ-অনাসক্ত মানুষের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবীয় শুদ্ধ শান্তরসের প্রলেপ থাকে। ডক্টরের চোখ দুটিও অকারণ হাসছে। অভিবাদন করতেই উনি এগিয়ে এসে হাত ধরলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি জানি ইয়ংম্যান, তুমি ভারতীয় এবং এও বিশ্বাস করি, ভারতীয়দের মনের জোর বা নিষ্ঠা খুব। তাই তোমাকেই আমার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহকারী হিসেবে পেতে চেয়েছি।

তারপর ক্রমে ক্রমে উনি পরীক্ষাগারের সম্পূর্ণ একটি সমীক্ষা বুঝিয়ে দিলেন। দেখলাম, জীব-রসায়ন সম্পর্কীয় নব-উদ্ভাবিত মেশিনগুলোই বেশি স্থান জুড়ে আছে। পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ মহাকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, নীহারিকা নিয়ে মেতে আছেন। ডক্টরও একদিন তা-ই ছিলেন। সুদূরের নক্ষত্রও আজ বিজ্ঞানীদের স্পেসশিপের আওতার মধ্যে। আবার কয়েকজন বিজ্ঞানী জীব-রসায়ন এবং চিকিৎসা বিদ্যায় অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে এসেছেন। আজ কোনও রোগই মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলতে পারে না। সর্বোপরি সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য আজ প্রায় প্রকাশিত হয়ে এসেছে। যেন সামান্য একটি স্বচ্ছ পর্দা তুললেই দেখা যাবে সৃষ্টি রহস্য তার সমস্ত গোপনীয়তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে পৃথিবীর কাছে। তাই, এখন এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা চলছে— কে আগে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

দেখলাম সূর্যালোক, জল, মাটি, নানারকম সামুদ্রিক কঠিন পদার্থ এবং নানান ধরনের উদ্ভিদের, প্রকৃতি, অণু-পরমাণু সম্বন্ধীয় বিচিত্র কয়েকটি মেশিনও রয়েছে। ঘরের মধ্যে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও প্রাচীন মিশরের ম্যমীকরণের কয়েকটি বিরাট বিরাট অয়েল পেন্ট রয়েছে।

উচ্চকোটির সাধকগণ সাধনার চরমে পৌঁছে, ষট্চক্র ভেদ করে, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার পর যে উত্তেজনা, যে অনুভূতি লাভ করে, বিশেষতঃ তন্ত্রসাধকগণ, সেই অনুভূতিকে 'প্রগাঢ় রোমান্স' বলা চলে। এবং ডক্টর এই রোমান্সের রসে সিঞ্চিত। আমারও মনে হয়, ওই অনুভূতির স্বরূপ খানিকটা বুঝেছি। তাই, ক-দিনের মধ্যেই ডক্টরের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠলাম।

***

কাজের নেশায় ভুলে গেলাম বাইরের জগৎ। তারপর একদিন রক্তিম গোধূলী বেলায় ডক্টর অভাবনীয় সংবাদ দিলেন। ডক্টর বোধ হয় খুঁজে পেয়েছেন সৃষ্টি রহস্যের মূল সূত্র এবং তাহলে নুতন প্রাণসৃষ্টিও অসম্ভব নয়। শুনতে শুনতে আমিও রক্তিম হয়ে উঠলাম। ডক্টর চাপা উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন। ওঁর চোখে মুখে গোধূলীর অলক্তকরাগ ছড়িয়ে পড়েছিল। কানের পাশের শুভ্র চুল ক-টি রক্তরাঙা হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে ডক্টরকে কি মহান— কি সুন্দর দেখাল। জানলা দিয়ে স্বর্ণালী রোদ যেন ডক্টরের কৃতিত্বের সাক্ষী হয়ে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে আমাদের গায়।

ডক্টর আমার দিকে চাইলেন। বললেন, রয়, আমি কৃত্রিম নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। এই কাজেই খুঁজে পেয়েছি পদার্থে প্রাণ সঞ্চারের মূলসূত্র। আনুষঙ্গিক কাজগুলো এবার তুমি করবে। আমি আনন্দে অধীর হয়ে বললাম, নিশ্চয়ই ডক্টর, বাকীটুকু আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি এগিয়ে চলুন। আমি আমার সমস্ত আত্মা দিয়ে এ কাজ করব।

—অসংখ্য ধন্যবাদ ইয়ংম্যান। তবে, একটা কথা, এ ব্যাপার এখন যেন সিমন আর অ্যানা ছাড়া কেউ না জানে। কারণটা তো বুঝবেই— আমি জগৎকে একটা চমক দিতে চাই।

(৫)

বিশাল পরীক্ষাগারটির একাংশে ডক্টর তাঁর এই পরীক্ষাকার্যের স্থান ঠিক

করেছেন। বিরাট তিনটি টবে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ-চারা। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি গাছও দেখলাম। একটা টবে ঘাসযুক্ত খানিকটা মাটি। কাচের পাত্রটায় তরল সূর্যালোক। বায়বীয় পদার্থের কয়েকটি সিলিণ্ডার পাশে দাঁড় করানো। ডানপাশেই রয়েছে সৌরবিদ্যুৎ সৃষ্টির গোলাকার যন্ত্রটি। রিফ্লেক্টাবে গোধূলিবেলার শেষ রোদ এসে পড়ছে। বাঁ পাশে আট ফুট লম্বা একটি গামলার মতো কাচের পাত্রে থলথলে ঘন সবুজ পদার্থ। পাত্রটির চারপাশে গায়ে লাগানো ছোট বড় অনেকগুলো তার গিয়ে যুক্ত হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে। কতকগুলো গিয়ে যুক্ত হয়েছে বাকী তিনটি মেশিনে। কাচের পাত্রটি একটি স্প্রিং এর ওপর বসানো। পাত্রটি অনবরত দুলছে। এই স্পন্দনটুকু একান্ত প্রয়োজনীয়।

ডক্টর সুইচ টিপলেন। ঢাকনা খোলা চৌকোনা চারটি মেশিন থেকে জোরালো আলো সলিউশনটির ওপর বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

ডক্টরের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যেতে লাগলাম।

(৬)

কয়েকদিন পর ফিলিপ এল। অ্যানার বন্ধু। ফিলিপ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচারার। ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে খুব আগ্রহান্বিত। সিন্টের মিঃ গ্রাহাম স্টিভেনসনের তৃতীয় পুত্র ফিলিপ। অ্যানা বিজ্ঞানের ছাত্রী, আর ফিলিপ দর্শনের। মনে মনে ভাবলাম, বিপরীত চরিত্রের মিলনই মধুর।

ফিলিপ ধরল ওকে, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। আমি অপারগ। শেষে ওকে স্বামিজীর লেখা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী, শঙ্করাচার্য, রামানুজ,
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি পড়তে বললাম। মহাভারতের কয়েকটি অধ্যায় ওকে অনুবাদ করে বোঝালাম। দুদণ্ডেই ও পরম বন্ধু হয়ে উঠল। এবং শেষে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। বার বার ধন্যবাদ শুনে ভাবলাম, কথায় কথায় ধন্যবাদ দেওয়ার সৌজন্য ওদের আবেগসঙ্গতি নীতির ফল।

গভীর রাত। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারিদিকের চাঞ্চল্য। সারা শহরটি ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে সমুদ্র। গর্জন শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওর গর্জন আজকাল আরও বেড়েছে। কারণ, 'নটিলাস' আজ সত্যিই ডুব দিয়েছে ওর গভীরতম গর্ভে। অনাঘ্রাতা, চিরশুদ্ধা ভৈরবীর কৌমার্য নষ্ট করেছে যন্ত্রদানব। ও তো গর্জন করবেই। মাঝে মাঝে প্রলাপোক্তি শোনা যাচ্ছে নাইট ক্লাব ফেরৎ মাতালদের।

মোটর গাড়ীর চাকার অসংলগ্ন ব্রেক কষার কর্কশ চিৎকার। পুলিশের বাঁশীও শুনছি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল— অকারণেই। জানলার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম দূরে পরীক্ষাগারে আলো জ্বলছে। বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। একটু সংকোচ হল। ডক্টর কি মনে করবেন কে জানে। তবুও কৌতুহল দমন করতে পারলাম না। পায়ে পায়ে পরীক্ষাগারের কাছে পৌঁছলাম। আরও বিস্মিত হয়ে দেখলাম ভেতরে ডক্টরকে অপারেশন গাউন পরিয়ে দিচ্ছেন সিমন। টেবিলে একটি নারীদেহ শোয়ানো। নিরাবরণ তনুদেহটিতে আলো পড়ে তার প্রতিফলন হচ্ছে। একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগল। এই নারীদেহটি দিনের বেলার ছিল কোথায়! দেখিনি তো! তা ছাড়া এভাবে রাত জেগে অপারেশন করছেন কেন? আমাকেও জানাননি কিছু! অথচ সিমন ঠিক পাশে আছে! উনিই তো বলেছেন পৃথিবীকে চমক দেবার জন্য এখন কাউকে কিছু বলবেন না। তবে এই মৃতদেহ পেলেন কোথায়! আর আমাকে উনি বিশ্বাস করতে পারেন না। ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল নিজেকে।

অ্যানাকে সব বললাম পরদিন। আমরা খবর নিয়ে জানলাম বিজ্ঞান পরিষদই সব পাঠিয়েছে। তিনটি মৃতদেহ পাঠিয়েছে গতকাল দিনে। ভেবে অবাক হলাম, মৃতদেহগুলোকে কোথায় রেখেছেন। পরীক্ষাগারের এককোণে কয়েকটি শূন্য বড় পাত্র দেখেছি। কিছুটা করে সাদা সলিউসন রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। তবে কি তিনি অদৃশ্যতত্ত্বকে বাস্তবায়িত করেছেন? অ্যানা আরও বিস্মিত হল এ কথা শুনে।

পরদিন ডক্টরের সঙ্গে দেখা হল। তিনি ধীরে ধীরে সব বললেন, কাল রাত্রে তোমার ডাকিনি বলে আমায় মার্জনা করো, রয়। সারাদিনের পরিশ্রান্তির পর ঘুমিয়েছ বলেই ডাকলাম না।

তাঁর গলার স্বরে স্নেহের আভাস পেয়ে মুগ্ধ ও লজ্জিত হলাম। বললেন, কাল আমি ব্যর্থ ও সফল দুই-ই হয়েছি পরীক্ষায়। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। আবার পাইনিও। দেখেছি যে, সাধারণ নারীদেহকে যদি প্রয়োজন মতো তৈরি করে নিতে পারি— তবে তা-ই উপযুক্ত আধার হয়ে উঠবে। আমার জিজ্ঞাসু চোখে অর্থ বুঝলেন— বললেন, হ্যাঁ, সৃষ্টির প্রধান কথা হল, এ কার্যে একটি উপযুক্ত আধার চাই। এই রহস্যের সর্বত্রই তাই। বিশেষত, বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে তো বটেই। আধার না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। এবং আমার ধারণা কৃত্রিম আধার এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়।

আরেকদিন বললেন, দেখো, সাধনার পথে বহু বাধা, অনেক বিঘ্ন। সবই সহ্য হয়। কিন্তু সামান্য একটি জিনিসের জন্যই যদি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, তাহলে ধিক্কার জন্মে নিজের ওপর। আজ বহুদিন হল বিজ্ঞান পরিষদকে বলছি আমাকে সমুদ্র তলদেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে, কারণ একটা নতুন সলিউসন তৈরি করতে একটা বিশেষ সামুদ্রিক পদার্থ দরকার — তা কিছুতেই শুনছেন না সে কথা। কিন্তু এও জেনো রয়, আমিও আমার সাধনা যে কোনও উপায়ে সফল করব। আমাকে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে।

'করতেই হবে' কথা দুটির ওপর অসম্ভব জোর দিলেন। 'আর শোনো, সিমন আমাকে ওর সব কিছু দিয়ে দ্বিধাহীন ভাবে সাহায্য করছে। তুমিও আশা করি আমাকে...'

আমি মাঝপথেই বললাম, আমারই দুর্ভাগ্য যে, এতদিনেও আমাকে পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তিনি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেশ, বেশ, এতে তুমি দুঃখ পেও না বন্ধু। এবার থেকে জেনো বাকী সব ভার তোমার ওপর রইল।

(৭)

তারপর আমার আর তাঁর মধ্যে এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হল। উনি আমাকে, রিটাকে এবং অ্যানাকে ওঁর পরীক্ষনীয় বিষয়টি সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বিটা অ্যানার বিশেষ বান্ধবী। বললেন, জানো তো, একদিন আমাদের ধারণা ছিল, জীবদেহের ও উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে যে সব জৈব পদার্থ আছে, তা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। আজ কোনও জৈব পদার্থই বাকী নেই তৈরি হতে। এমন কি ভিটামিন, হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক এনজাইম ইত্যাদি পদার্থগুলোও পরীক্ষাগারে সফলতার সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছে। সৃষ্টির আদি থেকে এই সেদিন পর্যন্ত এগুলো সব প্রকৃতির অকৃত্রিম রসানাগারে উৎপন্ন হত। এই আবিষ্কারগুলোর ওপর ভিত্তি করেই আমি এগিয়ে চলেছি।

—কিন্তু এ সব জৈব পদার্থগুলোর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন তো দেখা যায় না। অ্যানার প্রশ্নে হাসলেন উনি। বলতে শুরু করলেন, এইখানেই তো যত উৎকণ্ঠা। আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই জান, প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ হচ্ছে প্রোটিন। অর্থাৎ প্রাণ নামক অদৃশ্য বস্তুর প্রকৃত আধারই ওই জিনিসটি। আর প্রকৃতির রসায়নাগারের অর্থাৎ সমুদ্রের সমস্ত রহস্যই আজ আমাদের কাছে গ্রন্থিমুক্ত। যেটুকু বাকী ছিল তা উন্মোচন করতেই আমি একবার সমুদ্রের

তলদেশে গিয়েছিলাম এবং আরেকবারও যাওয়া দরকার। সিমনও প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, প্রোটিন তো কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়। কিন্তু প্রাণের স্ফুলিঙ্গটি যদি...

ডক্টর মৃদু হেসে বললেন, বুঝেছি, তোমার কথা বুঝেছি। আচ্ছা, তার আগে শোন— জীবনের মূল লক্ষণ কি? দিনে দিনে পুষ্ট হওয়া এবং সময় এলে বংশবৃদ্ধি করা— তাই তো? আদিম প্রাণের লক্ষণটিও এইভাবেই ধরা পড়েছিল। অর্থাৎ সেই সৃষ্টির প্রথম ক্ষণটিতে কোনও জৈব পদার্থ, অন্যান্য পদার্থকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করেছিল এবং তারই ফলে পুষ্ট হয়ে বংশ ছড়িয়েছিল চারদিকে। থামলেন ডক্টর। আমি রিটার দিকে চাইলাম। ও অন্য লাইনের ছাত্রী হয়েও মন দিয়ে শুনছে কথাগুলো। ওর নিবিষ্ট মুখখানিতে আলো পড়েছে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর চোখ দুটো। টকটকে লাল কপোল। প্রসাধনহীন ঠোঁট দুটি স্বভাবতই রক্তিম।

আবার বলতে শুরু করলেন, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আদিম প্রাণটি উৎপন্ন হয়েছিল একটি বিশেষ ধরনের সলিউসনের মাধ্যমে। তার নাম 'কলয়ডাল সলিউসন'। এই সলিউসন-ই বিবর্তনের চক্রে পড়ে অথবা হঠাৎ একদিনেই হোক, জৈব অজৈব সবরকম পদার্থ আত্মসাৎ করতে করতে নিজের আকার পরিবর্ধিত করে প্রাণময় হয়ে ওঠে। তাহলে, এটা অনুমান করা চলে নিশ্চয়ই, সেই সলিউসনটির সঙ্গে সেদিন এমন একটি কিছু মিশেছিল, যার ফলে ওই সলিউসনের পুষ্টি সম্ভব হয় এবং প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়। তাহলে সৃষ্টির পূর্বেকার আবহাওয়ায় যে পদার্থটির সংযোগে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়, সেটি-ই সিমনের কথায় প্রাণের স্ফুলিঙ্গ। আর এ জন্যই তখন প্রোটোপ্লাজমের কোনও আবরণ ছিল না। এই ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও বলতে পারি— সৃষ্টির প্রথমে যখন ধীরে ধীরে পৃথিবী শীতল হতে শুরু করে, তখনই আবহাওয়ায় এমন একটা কিছুর আবির্ভাব হয়, যার ফলে জৈব পদার্থ প্রাণময় পদার্থে পরিণত হয়।

একটু থেমে বললেন, আদিম সমুদ্রে কলয়ডাল সলিউসনের মধ্য থেকে যেভাবে প্রাণ-চিহ্ন দেখা দিল, এখন যদি আমি সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে পরীক্ষাগারে প্রাণ সঞ্চার সম্ভব নয় কেন? এবং তাই হয়েছে। আমি সার্থক হয়েছি এই ভাবেই। ওই যে মেশিনটি দেখছ— তিনি বাক্সের মতো নব আবিষ্কৃত মেশিনটির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেন— ওইটিই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। ওইটির দ্বারাই আমি আর ক'দিনের মধ্যে

পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম মানুষ উৎপন্ন করতে পারব।

শুনতে শুনতে উত্তেজনা বোধ করলাম। ইনি আজ অভাবনীয় কথা শোনাচ্ছেন। মানুষ হয়ে তিনি ভগবানের কাজ করতে চলেছেন। প্রকৃতি নামে সেই চরম শক্তির প্রকাশ দেখব আজ ডক্টরের মধ্যে। অ্যানা আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে একদল বিজ্ঞানী যে বলেন, যখন আকাশের ওপরে অক্সিজেনের অর্থাৎ বায়ুর স্তর গঠিত হয়নি, তখন সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি আদিম সমুদ্রের জলে পড়ে কলয়ডাল সলিউসন উৎপন্ন হয়েছিল, তাই কি ঠিক?

ডক্টর নির্বিকার মুখে হাসলেন, উত্তর দিলেন না এ কথার। সিমন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, পৃথিবী জন্মের সেই প্রথম দিনে পৃথিবী তো টগবগ করে ফুটছিল। তারপর দিনে দিনে ঠান্ডা হয়েছে এবং এই পৃথিবীর ভেতরকার ফুটন্ত পদার্থগুলো নিশ্চয়ই অনেক রকম বায়বীয় পদার্থের নিঃশ্বাস ছেড়েছে। তাহলে কি বলতে চাও, সেই বায়বীয় পদার্থের কোনও একটিই প্রাণের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে? সিমনের কথায় তিনি এবারও হাসলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। বুঝে পেলাম না অ্যানা ও সিমনের কথার মধ্যে সত্য কতখানি আছে।

রিটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ও নীরবে উপভোগ করছে আমাদের যুক্তি তর্ক। চাকর আরেকবার কফি দিয়ে গেল। কাপে চুমুক দিতে দিতে ডক্টর বললেন, চলো, এবারে ডিনারের টেবিলে যাই। বুঝলাম উনি এর বেশি কিছু বলতে চান না। মূল রহস্যটুকু আমি ধরে উঠতে পারলাম না। ডিনারে পরিবেশন করলেন সিমন। ডক্টরের প্রতি ওঁর তীক্ষ দৃষ্টি। মনে মনে মুগ্ধ হলাম এই ঐকান্তিকতায়।

(৮)

এর পরদিন রিটার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। ও ইতিহাসের ছাত্রী। আমাকে অনুরোধ করল, যদি জানি, ভারতের প্রাচীন ইতিকথা কিছু বলতে। বাধ্য হয়ে গুপ্তযুগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বই থেকে আর কিছু বানিয়ে বললাম। একেবারে কল্পনা নয়— সম্ভাব্য কাহিনি বললাম। রিটা শুনে বিস্মিত হল। হয়তো মুগ্ধও হল। যাবার সময় বলে গেল, মাঝে মাঝে এভাবে এসে বিরক্ত করবে। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে অনুভব করলাম রিটার প্রতি প্রেমের চেতনা। ভাবলাম, শত তিক্ত কাজের ভীড়েও প্রেমের ঠিকানা হারাইনি। তাই, আজ আমার হৃদয় তার পূর্ণ প্রেম নিয়ে এই অচেনা

বিদেশী মেয়েটির কাছে ধরা দিয়েছে। একটু পরেই বাদলা নামল। রেডিয়োতে শুনলাম, সুদূর বাংলা থেকে ভেসে আসছে চির চেনা সুর— 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে।'

***

হঠাৎ লাল আলো জ্বলে উঠল। ডক্টর তাড়াতাড়ি ডাকছেন। দ্রুত পায়ে পরীক্ষাগারে পৌঁছলাম। তাঁর মুখ গম্ভীর। তবুও যেন উদ্বেলতা রয়েছে স্বরে— রয়, আমি টিসু উৎপত্তি ব্যাপারে বিঘ্ন দেখছি। সাপোর্টিং, এডিপোজ, ফিবরাস, কনেকটিভ মাসল সবই হচ্ছে, কিন্তু এপিথিলিয়াল এবং নিউরন নিয়েই গণ্ডগোল হচ্ছে। তবে এপিথিলিয়াল স্তরে স্তরেই হয়ে যাবে, কিন্তু নিউরন সম্বন্ধে চিন্তা হচ্ছে আমার। দেখে তো, তুমি কিছু ধরতে পার কি না।

আমি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। বুঝলাম, তাঁর কথা ঠিকই। আধারের সংযোগ হলে স্তরে স্তরে এপিথিলিয়াল উৎপন্ন হবে। তবে নিউরনের সম্ভাবনা দেখছি না। উনি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, দেখি। আশা করি কাল পরশুর মধ্যেই পেয়ে যাব সব কিছু।

(৯)

উদ্বেগের মধ্য দিয়ে পাঁচটা দিন কাটল। তারপর এল সেই চরম লগ্ন। ডক্টর ডাকলেন সবাইকে। ফিলিপ, অ্যানা, রিটা এল। আমি আর সিমন তো সর্বদাই রয়েছি। দেখলাম, একটা পাত্রে খানিকটা সমুদ্রের জল রয়েছে। পাশেই সেই ছোট মেশিনটা। সূর্যালোক যেন গলে গলে পড়ছে জলের ওপরে মেশিনটার মধ্য দিয়ে। ডক্টর ওই জলটি সবুজ থলথলে পদার্থের মধ্যে মিশ্রিত করলেন। একটা সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে তারের দ্বারা সংযুক্ত করলেন সেটাকে। এই গ্যাসটি দেখে অবাক লাগল। এটি তো এতদিন দেখিনি। তবে কাল উনি সমুদ্রতীরে গিয়েছিলেন এবং কি একটা নূতন পদার্থ তৈরি করেছেন। তাহলে এই গ্যাসটিই সেই পদার্থ। বোর্ডে দেখলাম, কতকগুলো জটিল অঙ্ক কষা এবং প্রত্যেকের সমাধানই পূর্ণ।

ডক্টর সুইচের কাছে এলেন। বললেন, এবার আমি আমার মূল কাজ আরম্ভ করছি। ফিলিপের দিকে চেয়ে বললেন, জানি না, ভগবান বলে কেউ আছেন কি না— যদি থাকেন, তবে তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করতে বোলো। সুইচ অন করলেন। শব্দ করে মেশিনগুলো চলতে শুরু করল। ওরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে উঠল।

কাচের পাত্রটিতে থলথলে পদার্থ নড়ছে। আরেকটা পাত্রে একটি নারী দেহ শোয়ানো। সমস্ত দেহটিই প্রায় ওই পদার্থে ঢাকা। লোহার পাতগুলো তারের সঙ্গে দেহটির সঙ্গে যুক্ত। মেশিন থেকে আলো পড়তে লাগল দেহটির ওপর। পাতলা ধাতুর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম পাত্রটি। উনি এবার হাসি মুখে বললেন, আপাতত নিশ্চিন্ত। এবার চলো সমুদ্রের তীর থেকে বেড়িয়ে আসি।

সানন্দে ডক্টরের আনন্দে যোগ দিলাম। সকলে চললাম ছুটোছুটি করতে করতে, আজ পরম মুক্তির দিন। আজ উনি সার্থক হতে চলেছেন পৃথিবীর আশ্চর্যতম এবং অচিন্ত্যপূর্ব গবেষণায়।

(১০)

ডক্টর সেদিন দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আরেকবার সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করতে। বিশেষ একটি পদার্থ সংগ্রহ করা ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু ভেতরের দলাদলি ঈর্ষার জন্যই তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়নি। অসুবিধা অবশ্য দূর হয়েছে কোনও রকমে। তিনি বললেন, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ এখনও ক্রূর, ঈর্ষাপরায়ণ এবং চক্রান্তপ্রবণ। আমাদের এই উন্নতির যুগেও এই মধ্যযুগীয় মনোভাব। এসব দেখলে মনের কি অবস্থা হয় বলো তো।

মনে মনে আমিও ব্যথিত হলাম। কারণ, এই ব্যাপারে আমারও অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ আজ বিজ্ঞানের বলে চরম শক্তিমান। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। সে আজ ঈশ্বরের সমতুল। তবুও সুযোগ পেলে একে অপরকে শারীরিক কিংবা মানসিক দিক থেকে আঘাত হানতে ছাড়বে না। সমাজের উচ্চস্তরেও দলাদলি, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতার ধ্বংস বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যভিচারী শয়তানের দল মুখোশ এঁটে নির্বিবাদে চলাফেরা করছে বুক ফুলিয়ে। আমাদের ভাই না খেয়ে মরছে; দরিদ্র ছাত্র অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, আর আমরাই ছদ্মবেশি বারবণিতার পায়ে কোটি কোটি টাকা ঢেলে দিচ্ছি। সভ্যতায় উন্নত দেশ নিলজ্জের মতো সভ্যতা, ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করছে। জনসাধারণ শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাও পাচ্ছে না। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ভালোবাসা আজ কাব্যে-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ। সমবেদনার কথা বলতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়।

ডক্টরের প্রতি শ্রদ্ধা হল নূতন করে। তিনি বিশুষ্ক বৈজ্ঞানিক নন। তাঁর প্রাণ আছে— তাঁর হৃদয়ে প্রেম আছে। প্রেমের মর্যাদা তিনি দেন।

কয়েকটি দিন কেটে গেল নির্বিরোধে। কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটল না। রিটার যাওয়া আসা একটু বাড়ল। আমাদের সম্পর্কটা দিনে দিনে মধুর হয়ে উঠতে লাগল। ওকে আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যকার ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য সম্বন্ধে গল্প বলতাম, আর ও প্রায় আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করত।

(১১)

তারপর একদিন এল অপর চরম ক্ষণ। ডক্টর সংবাদ পাঠাতে বললেন বাইরে। তিনি সফল হয়েছেন। পৃথিবীর লোক জানল, তিনি আজ পরিপূর্ণ একটি মানবক উৎপন্ন করেছেন। সাংবাদিকগণ, বন্ধুবান্ধবগণ দেখলেন কাচের পাত্রটিতে একটি শিশু নড়ছে। অবিকল মনুষ্য-দেহ। সেই নাক, চোখ, মুখ, হাত পা সবই ঠিক। টেলিভিশন, বিজ্ঞান দপ্তরের নিউজ রিল, সাংবাদিকগণের হৈ চৈ মিটতে সেদিন রাত হয়ে গেল প্রচুর।

প্রশ্নের উত্তর, রিপোর্ট লেখার কাজ মিটলে মুক্ত আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। মনে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল। মানুষ আজ ঈশ্বরের সমান ক্ষমতার অধিকারী। সে আজ কৃত্রিম মানুষ সৃষ্টি করছে— কাল কৃত্রিম পৃথিবী তৈরি করবে। সেই সমাগত দিনের কথা কল্পনা করে উদ্বেলিত হলাম। আকাশের নীলিমার পানে চাইলাম। নক্ষত্র মিটিমিটি জ্বলছে। আকাশে মেঘ নেই এতটুকু। গ্রহান্তরের প্রাণীগণ এতক্ষণে হয়তো খবর পেয়ে গেছে।

ডক্টরের শোবার ঘর থেকে হঠাৎ ডক্টরের কথা কানে এল। — আর তোমার কথা শুনব না প্রিয়। তোমার পিতৃদেবও আর নিশ্চয়ই মনঃক্ষুন্ন হবেন না। তাঁর সম্মানও ঠিক থাকবে। তা ছাড়া এতদিন তো তুমি তাঁদের জগতের কাছে মৃত ছিলে। তোমায় পূর্বস্বামীও নিশ্চয়ই তোমার ওপর থেকে সব দাবী তুলে নিয়েছেন। সিমন কিছু বললেন না। ডক্টর বললেন, তাহলে আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। এসো— কাছে এসো। দরজায় ছায়া পড়েছিল সিমনের। দেখলাম তিনি এগিয়ে গেলেন।

পরদিন ভোরেই ডক্টর হেসে বললেন, আমাদেরকে, অর্থাৎ আমাকে আর সিমনকে অভিনন্দন জানাতে পার। আগামী কালই আমাদের বিবাহের দিন।

সিমনের প্রকৃত পরিচয় শুনলাম। উনি কেন্দ্রীয় গবেষণা-মন্ত্রীর একমাত্র

কন্যা। বিরোধী দলের সভাপতি মিঃ উইলিয়ামের পূর্ব স্ত্রী। মৃত্যুর পূর্বেই ওঁদের বিচ্ছেদ হয়। সিমনের মৃত্যু হয়েছিল কঠিন অসুখে। তারপর ডক্টর তার অমানুষিক সাধনায় ওঁকে এবং আরও কয়েকজনকে প্রাণদান করেছেন এবং সিমন এ পর্যন্ত প্রায় সকলের কাছেই মৃত। শুধু মন্ত্রী মহোদয় গোপনে জানেন। এ গোপনীয়তা সিমন ইচ্ছা করেই রচনা করেছেন। কিছুদিন পরই মিঃ উইলিয়াম বিখ্যাত এক চিত্রাভিনেত্রীকে বিবাহ করেছেন। আগামীকাল মন্ত্রী মহোদয় নিজে আসবেন এ বিয়েতে।

(১২)

বিরাট হৈ চৈ এর মধ্যে কাটল একটা মাস। সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, পণ্ডিতগণ অভিনন্দন বাণী পাঠালেন। প্রত্যেকের বাণীর উত্তর পাঠালাম যত্ন করে। রাষ্ট্রপ্রধানগণ শুভেচ্ছা জানালেন। তাঁদেরও উত্তর পাঠালাম।

দিনগুলো আনন্দে কাটছে। লস এঞ্জেলস, সাক্রামেন্টো থেকে ভারতীয় বন্ধু-বান্ধব এলেন দেখা করতে। ডক্টরের সহকারী হিসেবে আমারও সুনাম হয়েছিল একটু। বন্ধুগণ খাঁটি বাঙালী রান্নার লোভ দেখিয়ে গেলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রিটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। বান্ধবীরা রিটাকে বাঙালী বধুরূপে সাজিয়ে দিল।

এরপর সুসম্পন্ন হল অ্যানা আর ফিলিপের বিয়ে। উৎসব, আনন্দ, ফুল, উপহার আর সঙ্গীতে কেটে গেল আর ক-টা মাস। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঘুরলাম। দেখলাম পৃথিবীর সব মানুষই আশা আকাঙ্ক্ষায়, কামনা বাসনায় এক। কোনও দেশ হয়তো সভ্যতায় বেশি অগ্রসর, কোনও দেশ পিছিয়ে আছে। কিন্তু
মানসিকতায় প্রায় এক স্তরের। মানুষ সর্বত্রই মানুষ।

এভাবে দেড়টি বছর কেটে গেল। ডক্টর এবার তাঁর নবজাতক বাইরে আনবেন। বিশেভাবে নির্মিত হয়েছে একটি ঘর। শিশু বালকটির দেখাশোনার জন্য দুজন সেবিকা ঠিক করা হয়েছে। বোজ বোজ রিপোর্ট বের হচ্ছে এ সম্বন্ধে। একদিন তোয়ালে জড়ানো শিশুটিকে নিয়ে ডক্টর বাইরে এলেন। বাইরের আবহাওয়াও বেশ খাপ খেয়ে গেছে ওর শরীরের পক্ষে। আবার হৈ চৈ— ফটোগ্রাফারদের ভীড়। পুলিশ এল জনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, বিস্মিত জগৎ উন্মুখ হয়ে থাকে খবর পাবার জন্য। শিশুর বয়স অনুযায়ী শরীরটি বিশেষ পুষ্ট হয়নি। তবে তা হঠাৎ বোঝা যায় না।

এভাবে হৈ চৈ, কর্মচাঞ্চল্য, গান, রিটার সঙ্গে কাব্য সাহিত্য আলোচনা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে কেটে গেল ছ-টি বছর।

শেষে রিটার বাবা রাজী হলেন। শুভলগ্নে আমার আর রিটার বিয়ে হল। বিয়ের ঠিক পরদিনই দুর্ঘটনাটি ঘটল।

(১৩)

সেদিনটা ছিল রবিবার। নব-বিবাহের সুখস্মৃতি নিয়ে ভোর হল। সবাই মিলে প্রার্থনায় যেতে হল। বিয়ের হৈ চৈ এর মধ্যেই ডক্টরকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখেছি। প্রার্থনায় উনি গেলেন না। যানও না কোনওদিন। সেদিন প্রার্থনা সেরে ফিরে পরীক্ষাগারের নিকটবর্তী হতেই বুকের স্নায়ুগুলোতে অনুরণন অনুভব করলাম। বুঝলাম পরীক্ষাগারের অনুভূতি-নির্দেশক মেশিনটিতে কিছু হয়েছে। ছুটে গেলাম। দেখলাম, ডক্টর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল চেতনা নেই। সিমন ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি মেশিনটির দিকে না গিয়ে সুইচ বন্ধ করলাম। সেবিকাদের মধ্যে একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোধহয় ভয়ে কাঁপছে। আরেকজন নেই। দেখলাম ছ-বছরের শিশু বালকটি মেশিনটির তলায় পড়ে আছে। মুখ নাক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডক্টর খানিক পর চোখ মেললেন। জিজ্ঞেস করলাম, এ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল কি করে? উত্তর দিলেন তিনি— দুর্ঘটনা নয়। এ ঘটতোই। শিশুর শরীরে বাইরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কোনও স্নায়ু ছিল না। বুঝলাম, নবজাতকের মধ্যে নিউরণ বাদ পড়ে গিয়েছিল। ডক্টর প্রায় শিশুর মতো বলে উঠলেন, আমি ব্যর্থ হলাম, রয়। এখন জগতের কাছে মুখ দেখাব কি করে!

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, এ নিয়ে ভেবে কি হবে, ডক্টর। এখন হয় প্রচার করে দিই— হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বালকটির। কেউ তো দেখতে আসছে না, বা জানছে না যে নিউরণ নেই বলেই তীব্র অনুভূতি নির্দেশক মেশিনটির সমুখে এসে মৃত্যু হয়েছে শিশুর। শিশু বুঝতেই পারেনি সমুখে বিপদ। ডক্টর মেশিনটি চালিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেবিকাদের অসাবধানতাবশতঃ ঘরের দরজা খোলা ছিল। শিশুটি ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে পরীক্ষাগারে ঢুকেছিল এবং সোজা গিয়ে পড়েছে সামনের ওই মেশিনটির আওতায়। সিমন ডক্টরকে সান্ত্বনা দিলেন নানা প্রকারে। হঠাৎ ডক্টর উঠলেন— দৃঢ়স্বরে বললেন, হারব না রয়, আমার হাতেই যখন সব রয়েছে, তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। কলমনার সেলটিকে নিউরণ

বলে ভুল করেছিলাম। এবং সেই ছোট্ট সন্দেহটুকু উপেক্ষা করেছিলাম। এখন বুঝলাম আধারের হৃদয়ের এবং মস্তিষ্কের স্পন্দনের সঙ্গে শিশুর একটা বিশেষ সংযোগ রয়েছে। তাই জীবন্ত একটি আধার প্রয়োজন।

ভাবনা হল কথাটা শুনে। জীবন্ত আধার কোথায় পাব। ডক্টরের কথা চিন্তা ধরিয়ে দিল। উন্মাদনায় ডক্টর কি করে জীবন্ত আধার সংগ্রহ করবেন— কে জানে।

(১৪)

এই সংশয়ে রাত্রে বিনিদ্র রইলাম। সারাটা সকাল দুপুর ডক্টর উত্তেজিত ভাবে কাটালেন। কি একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে ওঁর শান্ত মনে— বুঝতে পারলাম না।

বেলা তিনটে নাগাদ প্রচণ্ড বর্ষা নামল। মনটা একটু শান্ত হল জলদ-স্পর্শে। মেঘখণ্ডগুলো যেন দূরের সমুদ্রের ওপর নুয়ে পড়ছে। ঝড় নেই— শুধু স্নিগ্ধ জলধারা। আকাশের এই কান্না সুদূরের অচেনা কোনও বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দেয়। রিটা ওর বাবার কাছে বিয়ের পর থেকে। বিয়ের আগে যত আনাগোনা ছিল— এখন তত নেই। বর্ষা মনে করিয়ে দিল বাংলার কথা। দেশের পুকুর মাঠ সবুজ জলে ভিজছে এখন। এখানে সে সবুজত্ব নেই। এখানে মত্ত দাদুরী নেই— পল্লীর বধু বুকে মধু নিয়ে দূরাগত বিরহী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে নেই। মানসনেত্রে দেখলাম, দেশে এতক্ষণে পাতা থেকে পাতায় টুপ টুপ করে জল পড়ছে। ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোনের আনন্দে ছুট দিয়েছে গামছা দিয়ে মাছ ধরার জন্য। ছোট ছোট চিংড়ি মাছগুলো লাফাচ্ছে। মা হয়তো গরম গরম তেলেভাজা ভাজতে বসেছেন। এখানে সে সব কিছুই নেই। আছে শুধু রিটা। তা ও এখন কোথায় কে জানে!

বাইরে চেয়ে দেখলাম কে যেন পায়ে হেঁটে বাড়ীর কম্পাউন্ডে ঢুকছে। ভালো করে লক্ষ করতেই বিস্মিত হলাম— রিটা। মনে মনে ভগবান ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিলাম তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক ভুলে গিয়ে।

তাড়াতাড়ি সুটকেশ থেকে আমার ধুতি বের করলাম। এখানে পরা হয় না মোটেই। তাই আনকোরা রয়ে গেছে। বাথরুম থেকে ও পোষাক পালটে এল। নূতন সাদা ধুতিখানা জড়িয়ে ও যখন সমুখে দাঁড়াল— তখন মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর রূপে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার তনুদেহটি মানসনেত্রে ভেসে উঠল। সুদেহী রিটা শ্বেত-বসনা হয়ে স্বর্গীয়া হয়ে উঠেছে। সিক্ত কয়েকটি অলোকগুচ্ছ ছড়িয়ে পড়েছে শুভ্র কপালে। দুগ্ধধবল কাপড়টি ওর সমবর্ণা

শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আরও উদ্বেল করে তুলেছে চারপাশের পরিবেশটা।

খানিকক্ষণ আগেই মেঘের আড়ম্বরে মনটা ভারী হয়েছিল। মনে পড়ে ছিল 'বিরহকাব্য' 'মেঘদূতে'র সেই বিখ্যাত শ্লোক— মেঘের সঙ্গে যে মন্দাক্রান্তার অপূর্ব আত্মিক মিল—

রূদ্ধাপাঙ্গ প্রসর মলকৈরঞ্জন স্নেহশূন্যং প্রত্যাদেশদর্পি চ
মধুনো বিস্মৃত ভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়ন মুপরিস্পঙ্গি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা মীনক্ষোভাচ্চল
কুবলয় শ্রীতুলা মেষ্যতীতি।।

কবি বলেছেন বন্ধু মেঘদূতকে উদ্দেশ্য করে— বর্ণনা করছেন প্রিয়ার অবস্থা—ঘনকৃষ্ণ অলকদাম এসে পড়েছে কপালের ওপর, যথেচ্ছভাবে, চোখ দুটি প্রায় ঢেকেছে তাতে। সজল আঁখিতে তার কৃষ্ণাঞ্জন নেই। প্রিয়-হারা ব্যথায় মলিন, নিরুত্তাপ। প্রিয়ার সে মদিরালস চাউনি নেই—সেই কটাক্ষের তেজও নেই। নিতান্তই দীপ্তিহীনা, হে মেঘদূত, তোমায় দেখে মৃগাক্ষী প্রিয়তমা আমার ঊর্ধে চাইবে। দেখবে, প্রিয়ার নয়নতারা থর থর কাঁপছে— চঞ্চল মীনের আঘাতে কমলকলি যেমন কম্পিত হয়। প্রিয়ার হৃদয়তল থেকে উত্থিত সে ব্যথা বিরহে উদ্বেলিত করছে তাকে। আমার প্রিয়ার সে গভীর চাউনি ব্যথা সিঞ্চিত।

রিটাকে কাছে পেয়ে সেই অনির্দেশ্য ব্যথা দূর হল। ওকে অনুবাদ করে শোনালাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে ও আরও শুনতে চাইল। বিদ্যাপতি আবৃত্তি করে শোনালাম। শেষে বললাম—

ইন্দিবর বর গরব গরাসিত
খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল
জিত স্মিত বিকশিত বয়না।।

ধ্বনি মাধুর্য ও নিজেই বুঝল। ভাব, অর্থ বুঝিয়ে দিলাম। ও আরও মুগ্ধ হয়ে উঠল।

(১৫)

হঠাৎ হুড়মুড় করে করে ঢুকলেন সিমন। বলতে বলতে বসে পড়লেন, রয়, তুমি যাও— দেখো ডক্টরকে বোঝাতে পার কি না। ও বলছে-ও নাকি শেষ পর্যন্ত জোর করেই সংগ্রহ করবে ওর আধার।

বিষন্ন মনে বাইরে এলাম। জানি ডক্টর আমার কথাও শুনবেন না। এই অবস্থায় কেউ শোনে না। দেখলাম, ডক্টর ভীষণ উত্তেজিত ভাবে বারান্দায় পায়চারী করছেন। আমাকে দেখেই চিৎকার করলেন, কি চাই? তুমিও বোঝাতে
এসেছ? যাও— বেরিয়ে যাও।

বুঝলাম— এতদিনের রূদ্ধ চিন্তা আজ ওঁর মস্তিষ্কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। এই আঘাতেই ওঁর ব্রেন ভার সামলাতে পারছে না কোনও কিছুর।

সিমন বললেন, সকালে রেডিয়োর খবর শুনেছেন— কোন্ এক জার্মান বিজ্ঞানী নাকি এই পথে এগিয়ে এসেছেন উন্নততর প্রণালীতে। এই খবর ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক হয়নি। তাই এ অবস্থা।

সিমন বললেন, আমি ওঁকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। বলেছি, জীবন্ত আধারের কি প্রয়োজন। ডক্টর তো মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত করে তা পেতে পারেন। কিন্তু, ডক্টর বলেছেন, তাতে নাকি হবে না। হত, যদি মৃত্যুর তিন চার সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি কাজ শুরু করতে পারতেন। তা ছাড়া মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ফলে নাকি দেহ থেকে কি একটা পদার্থ বাদ যায় এবং তার কৃত্রিম সংযোজন করতে হয়, কিন্তু ওই কাজে কৃত্রিম দিয়ে চলবে না। ডক্টর তাই পাগলের মতো খুঁজছেন জীবন্ত একটি নারীদেহ।

ডক্টর আজকাল দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন। ওঁর চিন্তাধারা আমিও বুঝতে পারছি না। ভেবে অবাক লাগল— সেই শান্ত, সৌম্য, মানুষটির আজ একি অবস্থা। তবু অশ্রদ্ধা করতে পারলাম না তাঁকে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, করুণায় মনটা ভরে উঠল।

সিমনের অবস্থা মনে করে কষ্ট হল। এ অবস্থায় ডক্টরকে একা ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত। উনি নির্জনে চিন্তার সুযোগ পাবেন। অবশ্য বুঝতে ঠিকই পারলাম, উনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেই গেছেন। তব ওঁকে একা ছেড়ে থাকাই সমীচীন মনে হল। তাই সিমনের কাছে প্রস্তাব করলাম দুদিন বাইরে ঘুরে আসব। কিন্তু তিনি স্বামীকে ছেড়ে যাবেন না। উপকার হলেও না। জানি ডক্টরকে রোধ করার শক্তি কারোই নেই। বিজ্ঞান সাধক উনি। সাধারণ চোখে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা তার আছে। তাই, লস এঞ্জেলসে রিটাকে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ী চলে এলাম। তারপর দুদিন পর যখন ফিরলাম তখন আমার এই বিদেশের জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছি!

কমিশনার মিঃ মরিস স্বয়ং থানা থেকে আসছেন খবর এল। ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে গেলাম পরীক্ষাগারে, দরজা বন্ধ। লোহার মতো শক্ত, বিশেষ ভাবে তৈরি কাচের জানলা দিয়ে দেখলাম। কথা বলার মেশিনটি চালু ছিল। তাই কথাগুলো কানে এল।

ডক্টর অপারেশন টেবিলে দাঁড়িয়ে আছেন। সমুখে শোয়ানো একটি নারীদেহ। তাকে বাঁধা হয়েছে টেবিলের সঙ্গে। সিমনকে অপরিচিত দুটো লোক চেপে ধরে আছে। ছটফট করছেন তিনি। বলছেন, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। ডক্টর, এই পাশবিক কাজটি করো না। তুমি তো আমারও প্রাণ দান করেছিলে, তুমি আমাকেই তোমার কাজে লাগাও। আমি প্রার্থনা করছি। ডক্টর।

সিমনের চুল এলিয়ে পড়েছে কাঁধে, বুকে। গাউনের কয়েকটি জায়গা ছিঁড়ে গেছে। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন নিজেকে ছাড়াতে।

টেবিলের নারীটির দিকে তাকালাম। অপরিচিত নয়। ডক্টরের কাছে, দু-একবার এসেছিল মেয়েটি। ওকে টেবিলটার সঙ্গে ভালো করেই বাঁধা হয়েছে। ও নিশ্চয়ই জানে অপারেশন হবার পর পর শরীরের সমস্ত স্পন্দন গিয়ে মিশবে কৃত্রিম সন্তানের চেতনায়। ওর সমস্ত অনুভূতি বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে নবজাতকের মস্তিষ্কে। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ডক্টর উঠে এলেন সিমনের কাছে। বললেন, যদি চুপ করে থাকতে পার— তবে সজ্ঞানে থাক; না তো... সিমন আক্ষেপে চিৎকার করে উঠলেন— তাই কর— একেবারে মেরেই ফেল আমাকে। মেরে ফেল—।

ডক্টর ওঁকে সম্মোহন-মেশিনটার কাছে আনলেন। এতে মনের জোর পরীক্ষা করা হয়। সিমনের স্নায়ু ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল। ঢলে পড়লেন ডক্টরের বুকের ওপর। লোক দুটি ধরাধরি করে শুইয়ে দিল মেঝেতে। আশঙ্কা হল আমার— ডক্টর কি প্রিয়তমা পত্নীকে চিরনিদ্রায় শায়িত করলেন! কারণ এক ঘণ্টার মধ্যে যদি সিমনকে ওষুধ না খাওয়ানো যায়, তবে এ চেতনাচ্ছন্ন ভাব আর কাটবে না।

বোধ হয় ডক্টরের আদেশেই একটি লোক কথা বলার মেশিনটিকে বন্ধ করল। ডক্টর তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। হঠাৎ বাইরে হৈ চৈ উঠল। মিঃ মরিস দলবলসহ এসে পড়েছেন। এসেই আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আমি ডক্টরের সহকারী। আমি নিশ্চয়ই উপায় বলে দিতে পারব

যাতে মেয়েটিকে এখনও বাঁচান যায়।

মরিসের অনুরোধে আমার মনে ঝড় উঠল। দরজা খুলার উপায়টি একমাত্র আমিই জানি। কিন্তু ডক্টরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার সাধ্য আমার নেই। বিবেক কি বলছে শুনতে পেলাম না। পরীক্ষাগারের দেওয়াল-সংলগ্ন সরু সরু ম্যানহোলগুলোর দিকে তাকালাম। ডক্টরকে বাধা দিতে গেলে উনি যদি পারমাণবিক তেজপুঞ্জের কিছুটা বাইরে চালনা করেন, তাহলে মুহূর্তে অদৃশ্য হব সবাই। তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছি ডক্টর ক্ষিপ্রহস্তে কাজ করছেন।

আমার এই চুপ থাকাকে মিঃ মরিস ভুল বুঝলেন, দুজন অফিসারকে বললেন আমার দুপাশে দাঁড়াতে। ছুটে গেলেন বন্ধ দরজার দিকে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। রিটাকে দেখলাম শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ডক্টর কাজ করে চলেছেন। সমস্ত দেহটিতে মলম লাগালেন। বাঁধন খুলে দিলেন মেয়েটির। বুঝলাম— ও মলমের গুণে অবশ হয়ে পড়েছে। বাম্পের মতো নবাবিষ্কৃত মেশিনটিতে মেয়েটির মাথাটি গলিয়ে দিলেন। কাচের পাত্রটিতে শুইয়ে দিয়ে বাকী মেশিনগুলো চালু করলেন। ছাই রংয়ের একটি বায়বীয় পদার্থ সমস্ত আধারটিকে ঘিরে ধরল। জোরালো আলোগুলো তীব্র রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে লাগল। দেখলাম, লোক দুটি বোবা ভয়ে চেয়ে দেখছে ডক্টরের কাণ্ডকারখানা।

মিঃ মরিস এদিকে দরজা ভাঙবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু দরজা একচুলও নড়ল না। আক্রোশে ফেটে পড়লেন তিনি অন্যান্য অফিসারদের ওপর। মনে মনে হাসলাম ওঁর অবস্থা দেখে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। সিমনকে ধরে ডক্টর এসে দাঁড়ালেন বাইরে। বুঝলাম, একঘণ্টার আগেই সিমনকে ওষুধ খাইয়েছেন ডক্টর। ফিলিপ, অ্যানা এগিয়ে এল। সিমনকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। ডক্টর সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ডক্টরের দ্বিবিধসত্তা আমাকে মুগ্ধ করল। আশ্চর্য মানুষ!

লোক দুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ। ওরাই ডক্টরকে সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে ওই মেয়েটিকে। পরীক্ষাগারের দরজা পুনরায় বন্ধ হয়ে গেছে। মিঃ মরিস একবার ভেতরে ঢুকতে চাইলেন। কিন্তু ডক্টর রাজী হলেন না। ধীরে ধীরে হাত দুটি প্রসারিত করে দিলেন সমুখে। মরিস বললেন, তার দরকার নেই। এমনিতেই চলুন। আমি ও ডক্টর মরিসের সঙ্গে পুলিশের গাড়ীতে উঠলাম। নারীহত্যার অপরাধে ডক্টর এবং তাঁকে সাহায্য করার অপরাধে আমি বন্দী হলাম।

এরপর বিচার চলল দীর্ঘ ন-মাস ধরে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। তবুও ডক্টরের পাঁচ বছর জেল হল। আমার প্রতি আদেশ হল ভারতে চলে যাবার। কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর মস্তিষ্কের সামান্য বিকৃতি ঘটেছিল। শাস্তির খবরে পুরোপুরি উন্মাদ হলেন। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে।

আমার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। একটা মাস সময় চাইলাম ডক্টরের সৃষ্টির পরিণতি দেখার জন্য। তাঁর পরীক্ষাগার জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান সভার তত্ত্বাবধানে ওঁর উৎপত্তি পরিণতির পথে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে।

একদিন শেষে খবর প্রকাশিত হল। ডক্টরের উৎপন্ন শিশু সার্থক হয়ে উঠেছে আগের চেয়েও। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতির কোনও লক্ষণ নেই শিশুর মধ্যে। বাগযন্ত্র পরিষ্কার— কিন্তু অর্থহীন ধ্বনি নিঃসরণ হচ্ছে। চোখের চাহনিও সুন্দর— কিন্তু ভাবলেশহীন। ডক্টরের মেশিনেই পরীক্ষা করা হল শিশুকে। সত্যি তাই। অনুভূতি নেই। তবে শব্দ বা স্পর্শ একটু একটু বুঝতে পারে নবজাতক।

সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে, আমার মনে ক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠল। কোন মুখ নিয়ে ডক্টরের সঙ্গে শেষ দেখা করতে যাব? কি সান্ত্বনার বাণী শোনাব তাঁকে?

দুদিন পরই জার্মান এবং সোভিয়েট রিপোর্ট বের হল। উন্নততর প্রণালীর পরীক্ষা হলেও তাঁরা একই ফললাভ করেছেন। রিপোর্টে বলেছেন, সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন কৃত্রিম মানুষ উৎপন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যান্য জীবের মতো স্থলে অনুভূতিগুলো উৎপত্তি হয়েছে— কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি হয়তো সম্ভব নয়। কোন অজানা রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে এই অণু-পরমাণু গড়ে উঠবে তা হয়তো চিরদিনই অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। মানুষ হয়তো কোনওদিনই প্রকৃতির সমক্ষমতা- সম্পন্ন হতে পারবে না।

ব্যাথিত হৃদয় নিয়ে ডক্টরের কাছে শেষ বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলেন। আমার দিকে ভাবলেশহীন চোখে চাইলেন। বললাম সব। ভেবেছিলাম হয়তো কিছুই বুঝবেন না। স্পষ্ট দেখলাম আমার শেষ ক-টি কথা শুনে প্রথমে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর চোখ দুটো যেন ঔজ্জ্বল্যে হেসে উঠল। কথা বলা ওর বন্ধ হয়েছিল অনেকদিন আগেই।

হঠাৎ বলে উঠলেন, ধন্যবাদ। হাসপাতালের কর্মীগণ ছুটে এলেন। ডক্টরের বাকযন্ত্র তবে নষ্ট হয়নি। ভীড় বাড়ল। আমি নিঃশব্দে বিদায় নিলাম। ব্যাথা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে এয়ারপোর্টে চলে এলাম। বিদায় জানাবার জন্য রিটা অপেক্ষা করছিল সেখানে।

এ কমপ্লিট ওম্যান



রোবার্তা ল্যানেস

অনুবাদ : সুদীপ দেব

এখনও আমি শব্দহীন, দৃষ্টিহীন। আমার হাত নেই, পা নেই। কী অসহ্য যন্ত্রণা! যখন ভাবি পশ্চিম আকাশে লাল আবির ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু আমার চোখে শুধুই অন্ধকার, সেই যন্ত্রণা যেন আরও সহস্রগুণ বেড়ে যায়। তাই সে ভাবনা থেকে বিরত হই।

আজ সকাল ছ'টায় নার্স এসেছে। শুধুমাত্র শব্দ শুনেই আমি সময়ের ধারণা করতে পারি। রাত্রিবেলা ডাক্তারের বোন আমার পাশে বসে ছিল। তার নাকি অনিদ্রা রোগ আছে, সেই জন্য রাতে সে আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বসে থাকে। আমার খুব একটা বিশ্বাস হয়নি ওর কথা। তবে মেয়েটার সঙ্গ আমি মাঝে মাঝে উপভোগ করি। আসলে এই অবস্থায় শুধুমাত্র চিন্তা করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না আমি।

আমাকে স্নান করানো, খাওয়ানোর মতো সকালবেলার নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো শেষ করার পর আমার দু'জন নার্সের একজন রেডিওতে ক্লাসিক্যাল গান চালিয়ে দিল। আমি হেসে আমার ভালো লাগার কথা তাকে জানালাম। দু'জনের মধ্যে ওকে আমার বেশ পছন্দ।

আমাকে স্নান করানো যেমনই দুরুহ, তেমনই যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যাপার। আমার কাঁধ বেয়ে যে টিউবগুলি নেমেছে তাদের পরিষ্কার করে সিন্থেটিক চামড়ার আশপাশের মৃতকোষগুলি ঘষে তুলে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ লাগানো হয়। স্নান করানোর এই পর্বটা সত্যিই অসহ্য। ব্যথায়, যন্ত্রণায় আমি কাতরাতে থাকি; তাই ওই সময়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর সেই জন্য আমি আসল জিনিসটাই উপভোগ করতে পারি না। আমার প্রিয় নার্স তার মোলায়েম হাত দিয়ে ধুয়ে দেয় আমার স্তনবৃন্ত, সাবানমাখা কাপড় বুলিয়ে দেয় আরও নীচে মাংসপিণ্ডাকার প্রত্যঙ্গগুলিতে। যার নীচে কয়েকদিন পরেই আমার পায়ের সৃষ্টি হবে। আমার ভালো লাগাটাও বুঝতে পারে, তাই বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে এই কাজটা করে। আমি নিশ্চিত, যন্ত্রণার শেষে প্রশান্তির ছাপ আমার মুখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যায়। আমি তার নিশ্বাস

প্রশ্বাসে স্বস্তির ছন্দ অনুভব করতে পারি।

প্রাত্যহিক এই প্রভাতি কার্যকলাপের পর যখন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি, মৃদুসঙ্গীতের মূর্ছনায় আমি আবার আমার অতীত ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাই। এরপর ডাক্তার আসে।

আহ্, ডাক্তার। তোমার চেহারা আমার মানসচোখে এখনও ভাসে। দীর্ঘকায়, প্রশস্ত বুক, বাদামি চুল। নাহ্, তার রূপ, মেধা বা বাকচাতুর্যের মোহে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিইনি। সেদিন বিকেলের প্রতিটি কথা আমার অনুপুঙ্খভাবে মনে আছে।

ক্যানসার আমার স্তনদুটি আর লিম্ফনোড কেড়ে নিয়েছিল। আমার কেমোথেরাপি চলছিল। নেড়া মাথার এক বিষণ্ণ মূর্তির মতো অপেক্ষা করছিলাম অন্তিম দিনটির জন্য। ভিজিটিং আওয়ারের ঠিক পরেই ডাক্তার এল। একজন সফল লেখক আর গবেষক হিসেবে জীবনের আটাত্তরটা বসন্ত পেরিয়ে আসার পর আমাকে ভিজিটিং আওয়ারে দেখতে আসার মতো কেউ ছিল না। তাই ওকে দেখে আমি একটু বিস্মিত হয়ে ছিলাম।

প্রবীণ লোকটা মন্দ্র মোলায়েম স্বরে বলল, ‘মিস ক্রাগ, আমি একজন ডাক্তার।’ তার দৃষ্টি আমার স্তনহীন বক্ষ আর শীর্ণ হাতের ওপর খেলা করছিল।

আমি রুক্ষভাবেই বললাম, ‘কী ব্যাপার?’

‘আমি আপনার লেখার একজন ভক্ত। রেনেসাঁ শিল্পী বিশেষ করে সঙ্গীতকারদের জীবনী নিয়ে আপনার অসাধারণ বইগুলির আমি এক মুগ্ধ পাঠক। আপনি নিঃসন্দেহে রুচিশীল এবং নিষ্ঠাবান একজন মানুষ। আপনি ইতিহাসকে রোমাঞ্চকর আর অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ কল্পনাশক্তির সঙ্গে মিশিয়ে উপস্থাপিত করতে পছন্দ করেন।’ সে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করল। আমার বেশ মনে আছে, সেই মুহূর্তে হতাশভাবে ভেবেছিলাম যে এই ধরনের মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো রূপ বা সামর্থ্য কোনটাই আর আমার নেই। এমন একজন মানুষ আমার কলমের আবেগ অনুভব করতে পেরেছে।

“আশা করি, আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু আমি আপনার চার্টে যাওয়ার স্বাধীনতা নিয়েছি। আমি অঙ্কোলজিস্ট নই, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি কিছুটা বেশি পরিমাণে মেটাস্ট্যাসাইজ করতে পারবেন।”

“হ্যাঁ, আমি তো এখন সেই অর্থহীন মরীচিকার পিছনেই অর্থব্যয় করছি, তাই না?”

“হুম। তবে আমি আপনাকে এর মধ্যেও মরুদ্যানের সন্ধান দিতে চাই।”

আমি অতি কষ্টে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগলাম, সে দ্রুত আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। আমি ভুরু কুঁচকে তাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম।

“আপনি কি আমার চিকিৎসার ব্যয় বহন করার মতো কোনও প্রস্তাব দিতে চাইছেন?”

“আপনার অনুমান শক্তির খুব একটা প্রশংসা করতে পারছি না।” সে ঘাড় ফিরিয়ে তার পাশে থাকা ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, “আমি এর মতো আরও কয়েকজনকে একটি নতুন জীবনের সন্ধান দিতে পেরেছি, আর আপনাকেও সেটা দিতে চাই।”

নাকের কাছে নেমে আসা চশমাটা তুলে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নজরে এল না।

“কীভাবে ম্যাজিকটা দেখাবেন? আরও একবার অস্ত্রোপচার?”

“আমি আপনাকে কোনও সর্বরোগনাশক বড়ি দিতে পারব না, মিস ক্রাগ। ডাক্তারি পরিভাষার কচকচিতে না গিয়ে সোজা করে বলতে গেলে এ হল সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের প্রতিস্থাপন, যা করা হবে অন্য একটি সুস্থ সবল মাথা এবং শরীরের মধ্যে।” সে চুপ করে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আগে কেউ আমাকে এমন প্রস্তাব দিলে কী করতাম জানি না, কিন্তু এখন আমি অসুস্থ, দুর্বল, অবসাদগ্রস্ত এক বৃদ্ধা যে আর কোনওদিন এই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আশাটাও ত্যাগ করেছে। এসব শোনার পর তার অভিব্যক্তি কী হতে পারে! আমি উচ্চকিত হেসে উঠলাম।

সে আমাকে হাসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। আমি জানি, সে আশা করেছিল যে আমি হয়তো খুব ভয় পেয়ে যাব বা খুব অবাক হয়ে যাব। কিন্তু আমি যে কেন হেসে উঠলাম তা আমি নিজেও জানি না।

“মিস ক্রাগ, এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস একটা বিষয়। আপনাকে বেছে নেওয়ার অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম হল আপনার প্রখর বাস্তববোধ।”

তার সেই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, গোলাপি হয়ে যাওয়া অজেয় কচি মুখখানা দেখে আমি সত্যি প্রেমে পড়ে গেলাম।

“মাই ডিয়ার ডক্টর...”

“ডক্টর চার্নস্কি... কেনেথ।”

“ডক্টর চার্নস্কি, তুমি যেটা করছ নিশ্চয়ই সেটা পুরোপুরি নিজের বিশ্বাস

থেকেই করছ। কিন্তু তুমি তো আমার জায়গায় নেই, থাকলে বুঝতে পারতে এমন একটা সময় এমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে আসার অভিঘাত কীরকম হতে পারে।”

“হ্যাঁ, অবশ্যই অদ্ভুত, অভূতপূর্ব আর অবিশ্বাস্য। ঠিক আপনারই মতো। আপনার মতো অসাধারণ একটি মন, একে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। আর সেটাই আমি সম্ভব করে দেখাব। আমি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। আমি মাইকেল এঞ্জেলো। আপনি ঠিক যেমনটি চান অস্ত্রোপচার করে আমি সেটাই আপনাকে দিতে পারি।” পাশের ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে টেনে আরও কাছাকাছি নিয়ে এল সে, “আমি আমার করা কাজগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছি।”

আমি আরও ভালোভাবে ছেলেটির দিকে দেখলাম, “তাহলে আপনি আগেও এইরকম বীভৎস সার্জারি করেছেন?”

“হ্যাঁ, তবে আপনার জানা উচিত যে এ জিনিস যুক্তরাষ্ট্রের কোনও মেডিকেল
বোর্ড বা স্কুল দ্বারা অনুমোদিত নয়।”

“অবৈধ?”

“বেআইনিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন অর্থে অবৈধ নয়। এইরকম সার্জারি এখনও পর্যন্ত করা হয় না। কিন্তু যখন আমি তার স্বীকৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারব তখনই হবে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাইমন, এবং আশা করব আপনিও আমাকে এই কাজে সাহায্য করবেন।”

আমি সেই নিদর্শন হিসেবে উপস্থিত ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, “ওহে, বলো তো, এটা কি খুব যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার?” যে যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই আমাকে আসতে হয়েছে এখন মনে হচ্ছে তার পুরোটাই হতাশাজনক, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে।

সে মুচকি হেসে বলল, “আমি অন্যরকম উত্তর দিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। ঘুমের ওষুধ আর পেইন কিলার দিয়ে কিছুটা ব্যথার উপশম করা হয় মাত্র। কিন্তু এখন, অস্ত্রোপচারের দীর্ঘদিন পর আমি নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে পারি সেই কষ্ট বা বেদনা বিফলে যায়নি।”

আমি ডাক্তারের দিকে ঘুরে গেলাম, “আধুনিক বিজ্ঞানের জয় হোক। এই

ফ্র্যাঙ্কেনস্টিনিয়ান ক্রিয়াকলাপ শেষ হতে কতক্ষণ সময় লাগবে?”

সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, “সাইমনের প্রায় এক বছর লেগেছিল।”

“এক বছর? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এত সময় কীভাবে লাগে।”

“যখন আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম, প্রথমে আমি ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে পুনরুদ্ধার করেছি; হাড় থেকে হাড়, পেশি থেকে পেশি, ধমনী থেকে ধমনী। এছাড়া অপটিক স্নায়ু বা বিচ্ছিন্ন চোখের মতো জিনিসের পুনঃসংযোগ করেছি। এসব ব্যাপারে আমার দক্ষতা এখন সব প্রশংসার ঊর্ধ্বে। এরপর আমি এই সেলাই ফোঁড়াইয়ের চিহ্নগুলো অদৃশ্য করতে প্লাস্টিক সার্জারির কৌশল শিখেছি। মস্তিষ্ক সংযুক্তি ব্যাপারটা দু’বছর ধরে পরীক্ষামূলক ধাপে ছিল, যতক্ষণ না আমি তা সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তুলতে পারি। এরপরেও মস্তিষ্কের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গগুলিকে সমাবেশ করানোর এই যে পদ্ধতি, তা কিন্তু একটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া।”

“আমার নির্বোধ প্রশ্নের জন্য ক্ষমা করবেন, সময় বাঁচানোর জন্য একটা শরীর সমেত মুন্ডুর মধ্যে মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করে দিলেই তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত, তাই নয় কি?”

“না, এটা নির্বোধ প্রশ্ন নয়। এইভাবে করলে অবশ্যই পদ্ধতিটা আরও গতিশীল হবে। সারা বিশ্বে বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে দান করা দেহাংশের খোঁজ আমি পাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্য এবং চেহারা সম্পন্ন একটি সম্পূর্ণ শরীরের সন্ধান কোথাও পাইনি আমি। এমন একটি শরীর
যাকে আপনি নিজের যোগ্য বলে মনে করবেন।”

“আমার একটাই চাওয়া, যদি আমাকে এই ব্যথা-বেদনা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে
যেতে হয়, তবে সেটা যেন বিফলে না যায়। তাই ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার মতো কোনও পদ্ধতি নেই?”

সে শ্রাগ করে বলল, “আমার প্রয়োজন মতো যেমন যেমন দেহাংশ পাব সেই হিসেবে এগিয়ে যাব।”

“আর তোমার পছন্দমতো মুন্ডু খুঁজে পাওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয় তবে কী হবে?” আমি মৃদু হেসে বললাম।

“সেটা হবে না। দেখুন, আমার কাছে এই মুহূর্তে একটি নিখুঁত মাথা এবং

ধড় আছে। আপনাকে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”

“কয়েক ঘণ্টা?” হঠাৎ আমার অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণ বৃদ্ধি পেল আর আমার সামনে বিকল্প চিন্তার সম্ভাবনাগুলি ক্রমশই কমে আসতে লাগল।

“মেয়েটি সর্বতোভাবে নিখুঁত। আজ বিকেলে আমি তাকে পেয়েছি। তার মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়েছে, আমি তার শরীরের বাকি অংশটা লাইফ সাপোর্টে রেখেছি। সেটার কোনও রকম অবনতি আমি চাই না, তাই আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।”

আমি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। গল্পের চরিত্র ছাড়া আর কাউকে এরকম অবস্থায় পড়তে দেখিনি। আমার যদি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচার সুযোগ হয়, তাহলে আমি কি সেটা গ্রহণ করব? অন্য কারও শরীরে কি আমি বেঁচে থাকতে পারব? আমি কি আবার সব কিছু করতে সক্ষম হব? নতুন করে? নাকি সবটাই মূল্যহীন হয়ে যাবে?

আর যদি আমি না রাজি হই, তাহলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও পথ তো সামনে খোলা নেই। আমি জানি আমার মুখের অভিব্যক্তিতে আমার এই দোটানা ফুটে উঠেছে।

“সাইমন, তুমি মিস অ্যালিসন নেরি ক্রাগের সঙ্গে কথা বলো। সাইমন লেফেভের, আমার সর্বশেষ সৃষ্ট মানুষ।”

“কথাকার সাইমন লেফেভের! তিনি তো মারা গিয়েছেন!” বিস্ময়ে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল।

“হ্যাঁ, তিনি মারা গিয়েছিলেন। এখন তিনি অন্য নাম নিয়েছেন।”

আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। “নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। আমি জানি, কাগজে পড়েছিলাম।” আমি ছেলেটিকে কাছে টেনে আরও ভালোভাবে তাকে খুঁটিয়ে দেখলাম।

“তার মৃত্যুর আগে তাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। বিস্তারিত খুঁটিনাটি বলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না।”

আমার মাথা সত্যি সত্যিই ঘুরছিল। আমি লেফেভেরের প্রায় সব লেখাই পড়েছি। গভীর আধ্যাত্মিক সব শক্তিশালী উপন্যাস। তিনি এমনকী দ্বিতীয় জুলিয়াস সম্পর্কেও লিখেছিলেন, সেই পোপ যিনি রেনেসাঁর প্রাথমিক শিল্প সমর্থকদের একজন ছিলেন। একটি অতুলনীয় লেখা, সেই সময় আমি তাঁর পাশে সর্বক্ষণের জন্য ছিলাম।

ছেলেটির বয়স খুব বেশি হলে উনিশ বছর হবে, উচ্চতা এবং চেহারা

মোটামুটি চলনসই, কিন্তু আগে আমি যেমন দেখেছি তেমনটা সুন্দর নয় মোটেও। এই ছেলেটির মধ্যে যদি সাইমন লেফেভেরের মনটা থেকে থাকে, তাহলে সে আবার সেইরকম মহান সৃষ্টি করতে পারে! ডাক্তার নিশ্চয়ই আমার মুখে বিস্ময়কর আনন্দ প্রতিফলিত হতে দেখতে পেয়েছে।

"সাইমন, অ্যালিসন নেরি ক্রাগকে চিনতে পেরেছ নিশ্চয়ই।"

ছেলেটা আমার হাতদুটো তার মুঠোতে ধরল, আমি শিহরিত হলাম। নেড়া মাথা নেড়ে বললাম, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"আচ্ছা, বেশ। আমি আপনার ভক্ত। শিল্প সম্বন্ধীয় আপনার নিবন্ধ 'আর্ট অ্যান্ড অ্যান্টি কুইটিস' আমাকে 'দ্য পোপ' উপন্যাসটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আপনার মনে আছে কি না জানি না, উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার ঠিক আগেই এব্যাপারে আমি আপনাকে একটা চিঠিও লিখেছিলাম।"

"সত্যি! সত্যিই আপনি বেঁচে আছেন।"

"হ্যাঁ, আছি। আর সেটা সম্ভব হয়েছে কেনেথের জন্যই। এই দেখুন..." তিনি আমাকে তাঁর কবজিতে আর কাঁধে দুটি জোড়ের চিহ্ন দেখালেন। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

"এখনও কি খুব যন্ত্রণা হয়?"

সাইমন তার চিবুকে হাত বুলিয়ে বলল, "অনাক্রম্যতা রোধের ওষুধগুলো খেলে মাথাব্যথা করে, অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছু আছে, যেমন কখনও কখনও খুব দুর্বল লাগে, কিন্তু বুড়ো বয়সে আমার যে অবস্থা হয়েছিল তার তুলনায় এ কিছুই নয়। তা ছাড়া দিন দিন আরও ভালো বোধ করছি।"

"বাহ! খুব ভালো কথা। আশা করি আপনি এখনও লেখালিখি চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"অবশ্যই। তবে আমি এখন ছদ্মনামে লিখছি। সাইমন লেফেভেরের ভূত তো আর লিখতে পারে না। এখন আমি জিনলুক ফোরাড।"

"হুম...'ঈগলের বাসা' নামে আপনার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। আমার বাড়িতে আছে।" আমি নব্বই বছর বয়স পেরিয়ে আসা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এখন তার বয়স তিরানব্বই বছর হওয়ার কথা। আমিও এরকম একটি সুন্দর, নবযৌবন পেতে পারি। আবার আমার লেখার শক্তি ফিরে আসতে পারে, এমন একটি ভবিষ্যৎ।

"আপনি কেনেথকে সম্মতি জানাবেন কি না জানি না, কিন্তু যদি সম্মত হন তবে ভবিষ্যতেও আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখতে চাই। আমি

এখনও আপনার কাজের একইরকম ভক্ত।”

“আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। ডঃ চার্নস্কি, আমি আপনার সাহায্য এবং সঙ্গ চাই। আমি আবার আমার যৌবন ফিরে পেতে চাই।” শিশুর মতো হেসে আমি বলে উঠলাম।

“চিরকালের জন্য...” ডাক্তার ঠাট্টার ছলে বললেন।

আমাকে হাসপাতাল থেকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে আসা হল। পরের দিন, একটি মোটেলের ঘরে পাওয়া গেল আমার লাশ, আমার হাতে পাওয়া শট গানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন আমার মাথা। ঘটনাটিকে নিখুঁত করার জন্য আমার মাথায় বসানো হয়েছিল সেই মহিলার মৃত মস্তিষ্ক, যার মাথায় আমার মস্তিষ্ক খুব তাড়াতাড়ি বসানো হবে। আমার আত্মহত্যার চিঠিটা খুব ছোট এবং মিষ্টি ছিল।

তিন সপ্তাহ পরে আমি কোমা থেকে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে আমার চেতনা ফিরে এল। সে প্রথমেই বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে আমার মৃত্যু সংবাদ পড়ে শোনাল। তারপর সে আমার ক্ষতিগ্রস্ত অপটিক স্নায়ু, আর আমার ল্যারিংসের অস্থায়ী অবস্থার ব্যাখ্যা করে বলল, এসবই শুধরে নেওয়া তার আয়ত্তের মধ্যে আছে। আমাকে শুধু ধৈর্য রাখতে হবে।

এই অবস্থায় আমি প্রায় দু'মাস ধরে আছি। গত সপ্তাহে ডাক্তার আমাকে বলেছিল, জার্মানিতে একটি হাত পাওয়া গেছে, যার টিস্যু ম্যাচ করেছে। একটা হাতে অন্তত আমি ছুঁয়ে দেখতে তো পারব। তবে হাত লাগানোর পর সেই ক্ষমতা ফিরে পেতেও নাকি একমাসের মতো অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমাকে অসীম ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

ডাক্তার আসছে। আমার নতুন হৃৎস্পন্দনের মতোই তার পদধ্বনি আমার কাছে পরিচিত।

“তোমার হাত এসে গেছে। আমাকে ঠিক যেমনটি বলা হয়েছিল তেমনই সুন্দর হাত। গ্রেটা তোমাকে তৈরি করে দেবে, আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে অস্ত্রোপচার করব।”

আমি তাকে বলতে চাইলাম যে আমি খুব ভয় পাচ্ছি, অসহনীয় যন্ত্রণা, তারপরেও সেই হাত কাজ করবে না, আমি তারপরেও তাকে স্পর্শ করতে পারব না। কিন্তু আমার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। ডাক্তার পরমস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

“সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন আমি হাতের অস্ত্রোপচার করব, তখনই অপটিক স্নায়ুর মেরামতির কাজটাও সেরে নেব। খুব তাড়াতাড়ি আমরা একজোড়া চোখ
পেতে চলেছি।”

আমি যাতে শান্ত হই সেই জন্যও আমায় আশ্বাস দিয়ে চলে। কিন্তু আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়ে আছি। আমি যা শুনতে চাই ডাক্তার আমাকে সেটাই বলে চলেছে, কিন্তু আমি এতে আশ্বস্ত হতে পারি না।

ওরা আমাকে অপারেশন রুমে নিয়ে এল, আমি নিশ্বাসে অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ পাচ্ছি। ঠান্ডা বাতাসের অনুভুতি, টালির মেঝেতে ঢাকনা পরা জুতোয় চলাফেরার শব্দ। মুখোশে ঢাকা মুখ নিঃসৃত কণ্ঠস্বর। ধাতব ট্রের উপর যন্ত্রপাতি রাখার ঠুংঠাং আওয়াজ। আমার মন শেষবারের মতো আমার সঙ্গে বলা কেনেথের ব্যক্তিগত কথাগুলিতে ফিরে যাচ্ছিল। ঠিক দু’দিন আগের ঘটনা।

ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার আগে আমি তাকে আমার খুব কাছে অনুভব করলাম।

“অ্যালিসন, আমি ভাবছিলাম সেই সকালটির কথা যেদিন তুমি সম্পূর্ণ রূপ ফিরে পাবে এবং আমরা একসঙ্গে জেগে উঠতে পারব।” সে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। “আমার স্বপ্ন যে আর বাধ মানছে না। আমি সেদিন হাসপাতালে সেই রোগে জর্জরিত শীর্ণ বৃদ্ধ খোলসের মধ্যে আটকা থাকা মহিলাটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন তুমি একজন শিল্পীর আত্মা এবং এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মননের সঙ্গে এক বিস্ময়কর সুন্দর নারী হতে চলেছ। আমি জানি না তুমি কি ভাববে... আচ্ছা, আমরা দু’জন কি সুখী দম্পতি হতে পারি না?”

কত সহস্র লক্ষ কথা যে অনুক্ত থেকে গেল... কত কিছুই না বলতে চেয়েছিলাম... আমি শুধু তার হাতে ধরে থাকা আমার মাথাটা সামান্য নাড়াতে পারলাম তার প্রস্তাবের উত্তরে। প্রথমে সে তার তর্জনী রাখল আমার ঠোঁটের ওপর। তারপর পেলাম তার ঠোঁটের স্পর্শ। আমি একটি অদ্ভুত মুখ দিয়ে তাকে চুম্বন করলাম। একটা টক-মিষ্টি লেবুর জলের স্বাদ।

“আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ছি, যে শব্দগুলি তুমি বলতে পারছ না। আমি তা শুনতে চাই। আর বেশি দেরি নেই... আমরা একসঙ্গে আমাদের মনের কথা, আমাদের স্বপ্নের কথা একে অপরকে বলতে

পারব।”

“আমি জানি না তুমি বুঝতে পেরেছ কি না... আমার অনেক অনেক দিনের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল সেই দিন... যেদিন তোমার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলাম। এর আগে কাগজে তোমার ছবি দেখেছি, তোমার ওপরে বানানো রোনাল্ড ন্যাপের তথ্যচিত্র দেখেছি। তোমার নিজের লেখা এবং তোমার ওপরে যাবতীয় লেখা আমি পড়েছি। আমি তোমাকে জানি, তোমার সারাটা জীবন সম্বন্ধে জানি। আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এমনকী তোমার সেই নেড়া মাথা বৃদ্ধ শরীরটাকেও আমি ভালোবেসেছি।”

“এখন তোমার নতুন মুখটা যদি তুমি দেখতে পেতে তাহলে দেখতে, কী অপূর্ব সুন্দর এই মুখখানি। শুধু চমকপ্রদ মিষ্টি সৌন্দর্য নয়, তোমার জন্য আমি হন্যে হয়ে খুঁজেছি এমন একটি মুখ, যার মধ্যে সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক মেলবন্ধন ঘটেছে। ঠিক এমনটাই আমি চেয়েছিলাম।”

“আমাকে অহংকারী মনে করো না। হয়তো ভাবতে পারো যে আমি খুব স্বার্থপর।

কিন্তু এটা বলতে পারি, সাইমনের ক্ষেত্রে ঠিক যেমন আমি জানতাম সাইমনও আমার বন্ধুত্ব চাইবে। তোমার বেলায় আমি আরও নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে না।”

আমি মনে মনে চিৎকার করে বলে উঠলাম, না না। আমি ফিরিয়ে দেব না। আমি যখন আমার সব কিছু হারিয়ে রিক্ত হয়ে বসেছিলাম, সেই সময় তোমার মতো একজনকে পেলাম যে আমার জন্য জীবনের সব রং-রস-গন্ধ ফিরিয়ে নিয়ে এল, তোমাকে কি আমি ফেরাতে পারি!

জীবনের অনেকগুলো বছর আমি একা কাটিয়েছি। মানুষের মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের শারীরিক আর আধ্যাত্মিক কামনা বাসনার রূপ দেখে দেখে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে অনেকেই আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু আমার স্বপ্নের মানুষটি তো অধরাই থেকে গেছে। হয়তো তাদের কোনও দোষ নেই, কিন্তু আমি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম কেনেথের মধ্যে তার সবটুকুই আছে। যত্নবান, কিন্তু ন্যাকামো নেই। মনোযোগী, কিন্তু স্বতন্ত্র। উজ্জ্বল, সুদর্শন এবং আকর্ষক। প্রতিভাবান, কিন্তু উচ্চকিত নয়। সব থেকে বড় কথা, সে আমার মনটাকে ভালোবাসে।

হ্যাঁ, আমি তোমারই হতে চাই কেনেথ।

যন্ত্রণা আমার অন্যান্য অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে যেন কেউ আমার কাঁধে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে আমার প্রিয় নার্সের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম।

"মিস ক্রাগ, ব্যথা কমানোর জন্য আপনাকে একটু মরফিন দিই? ডাক্তারবাবু আসবেন একটু পরেই।"

আমি অস্ফুটে সম্মতি জানালাম।

"আপনার হাত দুটো কী অসম্ভব সুন্দর দেখতে হয়েছে। লম্বা লম্বা আঙুল, সুন্দর নখ। সত্যিই অপূর্ব!"

হাত দুটো? আমার দুটো হাতই প্রতিস্থাপন করে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে! হ্যাঁ, এটা ওর পক্ষেই সম্ভব। ও জানে কীসে আমি খুব খুশি হব।

"এ বাবা! আমি বলে ফেললাম। প্লিজ, এটা আপনি ডাক্তারবাবুকে বলবেন না। আমাকে উনি বলতে বারণ করেছিলেন।"

আমি বলব না। গ্রেটাও আমাকে সবসময় খুশি রাখতে চায়। খুব ভালো মেয়ে।

"ওই যে উনি আসছেন।"

ওর পায়ের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে শুনতে পেলাম। ও বুঝতে পেরেছে যে আমার জ্ঞান ফিরেছে। তাই ওর আসার গতি আরও বেড়ে গেল, সবসময় আমায় কথা চিন্তা করছে। আমাকে এত ভালোবাসে। সত্যিই আমি খুব ভাগ্যবান!

"অ্যালিসন, তুমি জেগে আছ।" ড্রিপ গেজের ওপর ওর আঙুলের টোকা মারার
শব্দ শুনতে পেলাম, "যাক, গ্রেটা তোমায় কিছুটা মরফিন দিয়েছে। কাঁধে কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার দুটো হাত দু'রকমের দেব? একজন লেখকের দু'রকম হাত হতে পারে? সাইমনকে যেমন দিয়েছিলাম, তার জন্য এখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।" ধাতব চার্টে ওর কলম বোলানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে আমার কপাল থেকে চুলের গাছিটা পরম যত্নে সরিয়ে দিল। ওর কাছেই শোনা, যে আমার চুলের রং সোনালি। "তুমি জেনে হয়তো খুশি হবে বেলেরিনা থেকে এক অষ্টাদশীর দুটি হাত তোমার জন্য আনানো হয়েছিল। সেই দুটি পেলব নিখুঁত হাত এখন তোমার।" ওর ঠোঁট আমার

ঠোঁট ছুঁলো। ওর চিবুক আমার চিবুক স্পর্শ করল। ভিজে ভিজে লাগছে। ও কি কাঁদছে?

আমি যে কীভাবে ওকে ধরে রাখতে চাই সেটা যদি বলে বোঝাতে পারতাম! কিন্তু এই টিউবগুলি যতদিন না খোলা হবে এ যন্ত্রণা আমার কমার নয়।

আমি চেতনা এবং অবচেতনের মধ্যে আসা যাওয়া করছি। দিন আসে দিন যায়, আমি শুধু আমার কেনেথ আর গ্রেটার স্পর্শ অনুভব করি।

এখন রাতই হবে। ওর বোন, সোনিয়া, আমার পাশে বসে বই পড়ছে। ফিসফিস করে তার পড়ার শব্দ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। সোনিয়া আমাকে কখনও স্পর্শ করে না। এমনকী, আমি যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেও না। তখন সে ডাক্তারকে ডেকে দেয়। তাই আমি শুধু তার গলার আওয়াজ চিনি, আর তার বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ।

হঠাৎ আমার গলা থেকে এক গভীর গোঙানোর মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে। আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতে চাই, "বাঁচাও!"

সোনিয়া তার বই নামিয়ে রেখে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে যায়নি বুঝতে পারছি। কারণ, হলঘর থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকছে। তারপর টেলিফোনে তার উত্তেজিত গলা শুনতে পাই।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলেছেন... খুব অস্পষ্ট... কিন্তু বোঝা গেছে... 'বাঁচাও'।"

যার সঙ্গেই সে কথা বলুক না কেন, সে এই সংবাদে নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কারণ এরপর সোনিয়ার কণ্ঠস্বরে একটা সাবধানতার ছোঁয়া পেলাম।

"ঠিক আছে, অবশ্যই, এক্ষুনি।" সে ফোন রেখে দিল।

তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে তারপর সে ধীরে ধীরে আমার বিছানার কাছাকাছি এগিয়ে এল। আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি, মানুষ কীভাবে দৃষ্টিহীনদের নির্বোধ বলে মনে করে। যেন চোখে না দেখতে পেলেই অন্য সব অনুভূতিগুলিও আর থাকে না।

"আমি কেনেথকে ডেকেছি। এখুনি সে আসছে।"

আমি খুব কষ্ট করে উচ্চারণ করলাম, "আমি কথা বলতে পারছি।" আমার কণ্ঠস্বর একইসঙ্গে বেশ তীক্ষ্ণ আর খসখসে। ল্যারিংস সম্ভবত এখনও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত, যে অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল সেটা এখনও করা হয়নি।

"হ্যাঁ, আপনি কথা বলতে পারছেন।" সোনিয়া কৃত্রিম উচ্ছ্বাস দেখিয়ে

বলল।

এই সময় কেনেথ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, বিছানারও পর প্রায় ঝাঁপিয়ে পরে চুমুতে চুমুতে আমাকে ভরিয়ে দিল। আমার ঠোঁটে, আমার গলায়, আমার মুখে।

"সোনিয়া বলল যে তুমি নাকি কথা বলতে পারছ। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করো, শুনি। শুধু আমার নাম।"

হয়তো বা এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আমি সুন্দর হেসে লম্বা করে টেনে বললাম, "কেনননননেথ।"

"আহ্! এখন তোমার কণ্ঠস্বরকে বিশ্রাম দাও। আমি আর তার ধকল বাড়াতে চাই না। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও, এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত পুনর্জন্ম!"

আমি মাথা নেড়ে হাসলাম। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আগামীকাল, আমি তোমাকে বলব যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ঘটনার অভিঘাত কাটিয়ে উঠে যখন আমি আবার ঘুমের জগতে চলে যাচ্ছি, বাইরের ঘর থেকে আমি তাদের কথাবার্তার কিছুটা শুনতে পেলাম। দরজা প্রায় পুরোটাই বন্ধ, তাই তাদের কণ্ঠস্বর তেমন স্পষ্ট নয়।

"ওঁর গলার আওয়াজ যে ঠিক তার মতো শোনাচ্ছে।" সোনিয়া ভয়ে ভয়ে বলছে।

"ল্যারেংসের অপারেশনটা হয়ে গেলে ওর গলা অ্যালিসনের মতোই লাগবে। ওই কণ্ঠস্বর এ জীবনে আমি আর শুনতে চাই না। যেমন আমি চাই না সেই দুটি চোখ আমাকে আবার দেখুক।"

"কেনি, আমি জানি তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবে, কিন্তু ব্যাপারটা এর মধ্যেই অন্য দিকে চলে যাচ্ছে।"

"সোনিয়া, আমাকে বাধ্য করো না।" কেনেথের কথায় আমি ঠিক অবাক হলাম না, কিন্তু ওর বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যেন সে বলতে চাইছে, "যদি তুমি আর একটি শব্দ উচ্চারণ করো তবে আমি তোমাকে হত্যা করব।"

সোনিয়া চুপ করে গেল। আমি বুঝতে পারলাম সে ফিরে আসছে, বসল, বইটা তুলে নিল, একবার ঢোক গিলল। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমার কাঁধে সে হাত রাখল। এবার আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আমার চোখে ঘুম নেই। মরফিনে আচ্ছন্ন হয়ে আমি দিবাস্বপ্ন দেখতে

লাগলাম। যেন আমি ওদের সবার শিকার। যেন কেনেথ আর সংবেদনশীল প্রেমিক কারিগর নয়, যেন সে একটি কসাই, যে তাকে আঘাত করবে তাকেই সে সংহার করবে।

গ্রেটা আসার পর সোনিয়া চলে গেল। সে আমাকে পরিষ্কার করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম, তারপর আমার নতুন কণ্ঠস্বরে আমি ডাকলাম, "গ্রেটা।"

"আপনি কিছু বললেন কি?" ও জানে না যে আমি কথা বলতে পারছি।

"আমি খুব ভয় পাচ্ছি গ্রেটা।"

"ওহ, মাই গড!" গ্রেটা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "উনি জানেন যে আপনি কথা বলতে পারছেন?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তুমি জানো আমি কে?"

"অ্যালিসন নেরি ক্রাগ। আমি আপনার লেখা একটা বই পড়েছি, তবে আমি পাঠক নই। আমি সাধারণ একজন মানুষ, আপনার বইটার নাম আমি শুনেছিলাম, তারপর একদিন হাতে পেয়ে পড়ে ফেললাম, এই পর্যন্তই।"

"আমি যে আসলে কে, তা কি ডাক্তার আগে জানতেন?"

"আপনি জানেন না আপনি কে?" তার গলায় ভয়ের ছাপ।

"তুমি যার কথা বললে আমি সেই। কিন্তু আমার শরীর? আমার মুখ? ডাক্তার আমার কণ্ঠস্বর শুনে তার বোনকে বললেন, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি আমার কণ্ঠস্বরটি আর শুনতে চায় না। তাই তিনি এটা পাল্টে ফেলবে।"

"আমি ঠিক জানি না।" আমি গ্রেটার উত্তরে অবাক হয়ে গেলাম, "আপনি আমার কাছে খুব সুন্দর, কিন্তু আপনি... আপনি কি জানেন আমি কীভাবে..."

আমি জানতে চাই, "আমার মনে হচ্ছে এই শরীর... এই মুখ সে আগে থেকেই চেনে। না হলে এই চোখ বা কণ্ঠস্বর কেন তাকে অন্য কারও কথা মনে করিয়ে দেয়?"

"মিস অ্যালিসন।" সে আমার চিবুকটা ধরে বলল, "আমি আপনার কোনও ক্ষতি হতে দেব না।"

আমরা দু'জনেই হল ঘরের মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রেটা আমাকে স্নান করানোর প্রস্তুতি নিতে লাগল।

"আজ সকালে কেমন আছ?" আমার নগ্ন শরীরটা ঢেকে রাখা হালকা

কম্বলটা
সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল কেনেথ।

"আমার কষ্ট হচ্ছে।" আমি মৃদু স্বরে বললাম।

"তোমার স্নানের পরে ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধটা বাড়িয়ে দেব। একটা দারুণ খবর আছে। দুটো পা পাওয়া গেছে। আমাকে ফ্যাক্স করে পাঠানো ছবি দেখে আমার পছন্দ হয়েছে। এখন শুধু টিস্যু মিলে যাওয়ার অপেক্ষা। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ওই পা দুটো তোমারই হবে। বেশ লম্বা সুন্দর দুটি পা।" তার কণ্ঠে আনন্দের রেশ বুঝতে পারছি। ও সত্যিই খুব খুশি। আমার সন্দেহ কিছুটা কমে গেল।

"বেশ।" আমি জোরে বলে উঠলাম, "তাহলে এবার আমি তোমার জন্য নাচতেও পারব।"

সে শান্তভাবে হেসে বলল, "ধৈর্য রাখো।" আমার স্তনবৃন্তের কাছে তার আঙুলের স্পর্শ পেলাম। তার হাত আমার স্তনের প্রতিটি খাঁজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর আঙুল ক্রমশই আরও নীচের দিকে নামছে। হঠাৎ আমার গ্রেটার কথা মনে এল, সে নিশ্চয়ই সব দেখতে পাচ্ছে।

গ্রেটা বেসিনে একটা আওয়াজ করে বলল, "আমরা স্নানের জন্য রেডি।"

কেনেথ হাত সরিয়ে নিয়েছে। একটা লম্বা শ্বাস টেনে বলল, "পনেরো মিনিট পরে আসছি।"

গ্রেটা আমার হাত ধুয়ে দিচ্ছে। আমি শপথ করে বলতে পারি সে বেশ তাড়াহুড়ো করছে।

"প্লিজ, গ্রেটা। আস্তে আস্তে করো।"

"এবার আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।"

আমি তাকে শান্ত করতে চাইছিলাম, পরিবর্তে আমি বরং তাকে আরও দ্রুত আমার স্নান করাতে সাহায্য করলাম। তার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য একটিও শব্দ উচ্চারণ না করলেও আমি খুব ভালোভাবে তার উদ্বেগ বুঝতে পারছি। স্নান করানো শেষ হয়ে গেলে সে আমার কাছে তাড়াহুড়ো করার জন্য ক্ষমা চাইল। আমি তাকে নিরস্ত করলাম, যদিও আমি তার অল্প ছোঁয়ায় ঠিক তৃপ্ত হইনি। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল।

কেনেথ ফিরে এল, আমার ওষুধ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "সোনা, এবার তুমি মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্নের দেশে পাড়ি দাও।"

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটা একটা করে কুয়াশার চাদর সরে যাচ্ছে। আমি ডাক্তারকে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে শুনতে পাচ্ছি। একজন নার্স। অপারেশন রুমের গন্ধ নাকে আসছে।

“সুন্দর দুটি পা। আমি বুঝতে পারছি সেই ড্যান্সার যদি শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে তবে নিশ্চয়ই সে তার পা দুটির জন্য বেশ কষ্ট পাবে।”

“ওকে কি জানানো হয়নি যে, পা দুটো বাদ দেওয়া হচ্ছে?”

“দুর্ঘটনায় ওর পেট চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার জ্ঞান ছিল না যখন নিয়ে আসা হয়। সে জানবে কী করে যে তার পা দুটো সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল?”

“আপনি একটি শয়তান, ডাঃ চার্নস্কি। যদি আমি জানতাম যে এমন একটি কাজের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে তাহলে কখনই আসতাম না।”

“ডেবি, এই ধরনের কাজের জন্য আপনাকে আর প্রয়োজন হবে না।”

ভদ্রমহিলার চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু তাদের কথাবার্তা থেমে গেল। আমি মাথা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম। আমার গলার কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমি ঢোক গিলতে পারছি না। নাক বা মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতেও পারছি না। মেশিন চলার শব্দ কানে আসছে।

“জ্ঞান ফিরে আসছে। ওকে নীচে নামিয়ে আনো। জলদি।”

আমি আবার সংজ্ঞা হারালাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন গ্রেটা আমাকে স্নান করাচ্ছে। ওর নাক টানার শব্দ পেলাম। ঠান্ডা লাগল নাকি মেয়েটার। আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গলা বন্ধ। আমার মনে হল বুঝি এবার দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা টিউব দিয়ে আমার ফুসফুসে বাতাস সরবরাহ করা হচ্ছে। আমি ছটফট করে উঠলাম।

“মিস অ্যালিসন, অনুগ্রহ করে শান্ত হন। ডাক্তারবাবু আপনার ল্যারিংসে কিছু কাজ করেছেন। ফোলাটা না কমা পর্যন্ত আপনি একটি নলের মাধ্যমে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারবেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনার শরীরের অনেক সমস্যা হয়েছে। নিজেকে উত্তেজিত করবেন না। আমি আপনার দেখভাল করছি।” তার কণ্ঠস্বরে মনে হল সত্যি কেউ যেন আমার পাশে আছে। আমি তার স্পর্শে স্বস্তি ফিরে পাচ্ছি। “এই তো, খুব ভালো মেয়ে। আপনি অনেক ভালো হয়ে গেছেন।”

আমি এমনকী যন্ত্রণায় কাঁদতেও পারছি না। কেনেথ আসে, তাকে বিভ্রান্ত দেখায়।

"আমার আজ দুপুরে দুটো জরুরি অপারেশন আছে। আমি তোমার পাশে বসতে পারব না। যাই হোক, গ্রেটা থাকবে। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।"

আবার আমি এই দুনিয়া থেকে বিরতি নিলাম।

পেইন কিলারের প্রভাব কমে গেলেই আমার কাঁধ আর নিতম্ব অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যায়, তখন আমি জেগে উঠি। কাঁটার বল গিলে ফেললে যেমন হতে পারে গলায় ঠিক তেমনই ব্যথা। আমার হাতের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যেন আমি ফ্রস্ট বাইটে কয়েকটা আঙুল প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম, এখন আবার সেখানে সাড় ফিরে আসছে। আমি গ্রেটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে আমার এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, সে যেন আমার মতোই আমার যে কোনও ব্যথা বা আনন্দের ব্যাপারে সচেতন। আজ এখনও সে আসেনি।

প্রথমবার, আমি কাঁদতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করি কারণ আমি কোনও অশ্রু অনুভব করতে পারি না। শুধু আমার চোখের কোণে এবং হৃদয়ে ক্ষরণ।

তারপর সে আসে।

"এই তো।" তার উপস্থিতি আমার আবেগের রসায়ন পরিবর্তন করে দেয়, আর আমি আস্তে আস্তে ব্যথাহীনতার মধ্যে হালকা পালকের মতো ভেসে যাই। "আমি খুব দুঃখিত, অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর অফিসে একটা ছিঁচকে চুরির সুযোগ এসে গেল। ভাবলাম, তোমার রেকর্ডটা একবার দেখে নিই, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই পেলাম না। তবে তোমার রেকর্ডের মধ্যে অন্য মহিলাদের ফাইল পেলাম, কিন্তু কেনেথের কাছে তাদের আলাদা ফাইলও আছে। দাঁড়াও... ভাবি... একজনের নাম লিডিয়া, অন্য একজন চ্যান্টাল, এবং শেষ জনের নাম ক্যারল।" সে তার জিভে চুকচুক শব্দ করে বলে, "তুমি কী ভাবলে জানি না, আমার কি এটা করা উচিত হল।"

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। মাথা নড়ল কি না তা ঠিক বুঝলাম না, ওষুধের প্রভাবে মাথা ঘোরাও হতে পারে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি যেন নৌকোয় বসে দুলছি।

"আমি শনিবার আসব না। ভাইপোর দু'বছরের জন্মদিনের পার্টিতে যাব। আমি চাই না কেউ আমাদের সন্দেহ করুক..." আমার চুলে হাত বুলিয়ে সে বলল, "আমি তোমার জন্য একটু কেক নিয়ে আসব, কেমন?"

সেটা যে এত তাড়াতাড়ি আমার খাওয়া হবে না।

প্রথমে আমার ডান হাতে অনুভূতি পেতে শুরু করলাম। তর্জনী এনে বুড়ো আঙুলে ঠেকাতে পারলাম। কেনেথ স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি হল। আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন সে আমার গলার নলটা খুলে দেবে আর আমি কথা বলতে পারব। আমি জানি যে, ফুলো ভাবটা কমে গেছে। তবুও সে আমাকে আশ্বস্ত করতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, খুব তাড়াতাড়ি চোখ আসছে। আমিও তার কথা বিশ্বাস করতে চাই না, বা এমনভাব দেখাই যেন তার কথা শুনতেই পাইনি। এভাবেই এখন আমি ওর ওপর প্রতিশোধ নিই।

আমার মনে পড়ে যায়, আমার ডাক্তারের ক্লিনিকে পৌঁছনোর প্রায় ছ'মাস পরে সাইমন একবার এসেছিল। কেনেথের সঙ্গেই এসেছিল, কিন্তু একটা অপারেশনের জন্য কেনেথ তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার পরেও সে থেকে যায়।

"কেনেথ আপনার অগ্রগতি সম্পর্কে আমাকে বলেছিল। আমি এখন চোখের
সামনে দেখতে পাচ্ছি আপনাকে কত সুন্দর লাগছে।"

আমি আমার নতুন হাত দিয়েই ইশারা করি। গ্রেটাই আমাকে ইশারার ভাষা শিখিয়েছে। আমার কাছে একটা বড় কাগজের প্যাড আর বাচ্চাদের পেন্সিল রয়েছে। যা দিয়ে আমি মনের কথা লিখে বোঝাতে পারি।

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আমি বসেই ছিলাম, রাত্রিবেলা গ্রেটার রেখে যাওয়া কাগজ পেন্সিল তুলে নিয়ে আমি লিখলাম, "যদি আমি নিজে দেখতে পেতাম যে আপনি কতটা সুন্দর দেখছেন আমাকে। আমার জন্য চোখ আসছে অবশ্য।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেনেথ আমাকে বলেছিল, তিনি আপনার কণ্ঠস্বরের পুনর্নির্মাণ করেছেন। গলার নলটা কবে খুলবেন উনি?"

আমি লিখলাম, "তাকেই জিজ্ঞেস করুন না। অনেকদিন হয়ে গেল, মাসখানেকের মতো মনে হয়।"

"হুম, এটা তো ঠিক কথা নয়। আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব। গ্রেটাকে আপনার সঙ্গে দেখলাম। সে আমারও নার্স ছিল। সেরা নার্স। আমি ওকে ছাড়া পারতামই না। ও মনে হয় বিশেষ করে আপনার খুব পছন্দের।"

খুব তাড়াতাড়ি হিজিবিজি করে লিখলাম, "আমি একমত। ও যেন ঈশ্বরের দূত!"

"আমি ঠিক পড়তে পারছি না। যাই হোক, আমি জানি সে তুলনাহীন।"

তারপর তিনি তাঁর নতুন বই সম্পর্কে অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমার

সার্জারি বা কেনেথ নিয়ে আর কোনও কথা হল না। গ্রেটা একঘণ্টার মধ্যে লাঞ্চ থেকে ফিরে এল। তারপর তারা আমার পাশে কথা বলতে লাগল। তাদের হৃদ্যতা আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আর কেনেথ আমাকে খালি আশ্বাস দেয়।

আমি এখানে পৌঁছনোর পর ন'মাস কেটে গেছে। কেনেথ গত মাসে টিউবটা বের করে নিয়েছে। সে আমাকে বলেছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কথা বলতে পারব। চোখ এখনও আসছে শুনি। আমি ইতিমধ্যেই কথা বলতে পারি, কিন্তু আমি সেটা ওকে জানাইনি।

সে আমাকে ভালোবাসে বলেছে ঠিক কথা, কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করি না। সে এসে আমার পায়ের ব্যায়াম করিয়ে দেয়, কখনও কখনও আমাকে ছুঁয়ে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। সে বলেছে, আমরা পরস্পরকে খুব তাড়াতাড়িই ঘনিষ্ঠভাবে ভালোবাসতে পারব। শুধু আমার চোখটা পাওয়ার অপেক্ষা। আমাকে কেউ এভাবে স্পর্শ করুক তা আমি চাই না। কিন্তু গ্রেটা... আমি বুঝতে পারছি না... হয়তো চাই।

এই কয়েক মাসে আমার একটা খিদে জন্মেছে। যা এতদিন কোথাও আবদ্ধ
হয়েছিল তা যেন আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি আবার লিখতে চাই, আমি আবার পড়তে চাই।

চোখ এসে পৌঁছেছে। সবুজ রঙের চোখ, গ্রেটা বলেছে। কেনেথ আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, স্নায়ুগুলি সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা হয়েছে। তবে এ হল অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে কঠিন ধাপ। আমি মনে করি, যদি সে আমার মস্তিষ্ক পুনরায় সংযুক্ত করতে পারে, তবে তার অসাধ্য আর কিছুই থাকবে না।

এবার আমি যখন জেগে উঠলাম, অন্ধকার যেন সত্যি পরতে পরতে ঢাকা বলে মনে হল। চোখের ওপর ব্যান্ডেজ অনুভব করতে পারছি আর যদিও আমার চোখের পেশি সরাতে বারণ করা হয়েছে, গ্রেটা যখন ঢুকল সেদিকে দেখার চেষ্টা করার থেকে নিজেকে বিরত করতে পারলাম না। যন্ত্রণা অসহনীয় নয়। আমি তাকে বললাম যে, আমি সর্বপ্রথম তার মুখটাই দেখতে চাই।

সে আমাকে ধরে রাখে। আমি তার নিশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছি, লবঙ্গ আর মধু দেওয়া চায়ের গন্ধ।

“আমিও সেটাই চাই। কিন্তু আমার ভয় করছে। কারণ আমি তো তোমায় দেখেছি। কিন্তু তুমি আমাকে কখনও দেখনি।”

“তোমাকে দেখার পর কি তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমে যেতে পারে? কেন কমবে বলতে পার? যদি কেনেথ আটাত্তর বছর বয়সি আমাকে ভালোবাসতে পারে, আমি যদি না দেখেও তোমাকে ভালোবাসতে পারি, তারপরেও কি সম্ভব?

“এটাই আমি ভয় পাচ্ছি। ওহ, আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমি তোমার এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছি, আমরা দুজনেই একে অপরের জন্য এত বেশি অনুভব করছি... তুমি তো জানো, একজন নার্স হিসেবে এতটা কাছে আসা আমার উচিত নয়। এটাই আমাদের শেখানো হয়। মূল বিপদ হল সেখানেই।”

“কেন তাহলে তুমি একে বাড়তে দিলে? তুমি তো আটকাতে পারতে।”

“আমি চিন্তা করেছি। আমরা একে অপরের থেকে কতটা আলাদা। আমি তোমার অতীত সম্পর্কে জানতাম, যে তুমি পুরুষদের পছন্দ করো। আমি নিজেকে অনেকবার সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমার শরীরের স্পর্শ পেলেই কিছু একটা হয়ে যেত। যেন আমাদের মধ্যে একই বিদ্যুৎ বয়ে চলেছে। যেন আমরা আমাদের নিজের চেয়ে বড় কিছু একসঙ্গে তৈরি করি এমন একটা ইচ্ছে। ঠিক এভাবেই যে ভেবেছি তা হয়তো নয়। কিন্তু এর শেষ দেখার একটা জেদ আমার ভিতরে কাজ করত। যার থেকে আমি বেরতে চাইনি, বেরতে পারিনি।”

আমি বললাম, “আমি সবটাই বুঝেছি। যাই হোক সে তো আমি নিজেও নিজেকে সামলাতে পারিনি। তাহলে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, তোমার ভয় পাওয়ার
কোনও কারণ নেই।”

তার কম্পিত কণ্ঠস্বর কানে এল, “তুমি ঠিকই বলেছ।”

সেই রাতে, আমি জেগে শুয়েছিলাম, চোখে এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা, সোনিয়ার ফিসফিস করে বই পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এক সময় সে উঠে হল ঘরে গেল। সেখানে এমন একজন কেউ এসেছে যার গলার স্বর আমি এর আগে শুনিনি। তারা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল যাতে আমি শুনতে না পাই। কিন্তু আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এখনও যথেষ্ট প্রখর। আমি সব কথাই ভালোভাবে শুনতে পেলাম।

"আচ্ছা, ও তো প্রায় শেষের কাছাকাছি চলে এসেছে।" সোনিয়া সন্তর্পণে বলল।

"সম্পূর্ণ হলে তারপর বলবেন। এই কাজের জন্য একটি মৃতপ্রায় হেটেরোসেক্সুয়াল মস্তিষ্কের দরকার ছিল। কিন্তু ক্যারলের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এখন শুধু কণ্ঠস্বরের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।"

"পায়ের জন্য এখনও মাসখানেক কসরত করতে হবে। রিড, সে যদি তাকে আবার তৈরি করে? যাই হোক না কেন, সেই একই শরীর তো। যে হাত দিয়ে ওকে ঠেলে দিয়েছিল সেই হাত সে সরিয়ে দিয়েছে। যে পায়ে হেঁটে মেয়েটা ওর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল সেই পা সে বাদ দিয়েছে। আমি জানি ওর রুচি, ও সবসময় ড্যান্সারদের পছন্দ করে। সে শুধু ক্যারলের মাথা আর ধড়টা চেয়েছিল। সে অনেক খুঁজেছে, কিন্তু ওই দেহের সৌন্দর্য যে খুব বিরল। অমন সুন্দর স্তন ক'টা আছে। আর কী অদ্ভুত পরিহাস দেখ, ওই মহিলা, ক্রাগ, সে কি না স্তন ক্যানসারেই মারা যাচ্ছিল। কেনি তাদের দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখল।"

"পরিহাস! কিন্তু ঐশ্বরিক পরিহাস। যদি ক্যারল ঠিক ওইভাবে মারা না যেত... তারপর থেকেই সে অনেক শান্ত, ধীর, স্থির হয়ে গেল। ও ভাবতে পারেনি যে মেয়েটা তাকে শুধু গর্ভবতী হওয়ার জন্য ব্যবহার করে নিজের প্রেমিকার কাছে ফিরে যাবে। আমি ভেবেছিলাম সে আর মেয়েটাকে কখনই ফিরে পেতে চাইবে না।"

"ওহরিড, তোমার স্ত্রী যদি অন্য মহিলার জন্য তোমায় ছেড়ে দিত তাহলে তুমি সেটা কীভাবে নিতে?"

"অসম্ভব।"

"কেনেথ একই জিনিস ভেবেছিল। পুরুষকার! সে নিজেও এটা মেনে নিতে পারেনি।" সোনিয়া নাক টেনে বলল, "ছাড়ো, ওকে ওর মতো থাকতে দাও।"

"কিন্তু ও কি আবার একজন নতুন ক্যারল তৈরি করতে চলেছে?"

"অ্যালিসন। ওর নাম অ্যালিসন। তোমার ভালো মনে থাকা উচিত।"

কথোপকথনের বাকি অংশ আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এল। প্রত্যেকটি সন্দেহ নিশ্চিত প্রমাণিত হল। সোনিয়া যখন ফিরে এল, আমি নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম, যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

আজ ব্যান্ডেজ খোলা হবে। প্রত্যেকবার ডাক্তার যখন ব্যান্ডেজ পাল্টে দেয়,

আমি অল্প অল্প দেখতে পাই। শুধুই আলোর আভাস। এতেই আমি সুখী। আমার নতুন কণ্ঠস্বর গ্রেটা ছাড়া আর সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছি। আমি চোখে দেখতে পাওয়ার পর কেনেথের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে অনেক কিছু বলার আছে আমার, আর সেই সব শোনার পর তার প্রতিক্রিয়াকে মনে হয় সেটাও দেখতে চাই।

কেনেথ আমার দৃষ্টি উন্মোচন করতে আসে। অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে রিডের গলাও শুনতে পাচ্ছি। গ্রেটা চকিতে আমার হাত একবার চেপে ধরে চলে গেল। কেনেথ উপস্থিত সবার উদ্দেশে কিছু বলতে চলেছে।

"এই যে বসে আছে আমার অ্যালিসন। ও খেতে পারে, লিখতে পারে আর খুব তাড়াতাড়ি নাচতেও পারবে। আজ ও দু'চোখ ভরে দেখবে। আমি আপনাদের সবাইকে এখানে ডেকেছি আমার প্রথম সৃষ্টি পরিপূর্ণ নারীর সাক্ষী হওয়ার জন্য। আপনাদের কেউ কেউ জানেন আমার ভাই, রিড, একজন নিউরো সার্জন। তিনি বিশেষ করে এই উপলক্ষে শহরে এসেছেন।" তারপর সে আমার দিকে ঘুরে যায়, "অ্যালিসন, আমার ভাই, রিড। রিড, অ্যালিসন।"

"অবশেষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুব খুশি।" তার হাত আমার হাত স্পর্শ করল।

আমি মাথা নাড়লাম। কোনওরকম ভনিতা ছাড়াই কেনেথ ব্যান্ডেজ অপসারণ করল। আমি চোখ মেললাম। কতগুলো ফ্যাকাশে গর্তের চারপাশে জেলিফিশের মতো কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে দিয়েই আমি দরজার মতো একটা আকৃতি দেখতে পাচ্ছি।"

"তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?" কেনেথ আমার কপালে লেগে থাকা আঠা মুছে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল। আমি জানি সে আমাকে উত্তর লিখে জানানোর জন্য এবার কাগজের প্যাড এগিয়ে দেবে।

আমি বললাম, "ঝাপসা ঝাপসা বিভিন্ন আকৃতি।" আমার কণ্ঠস্বর আমার নিজের মতোই একদম, ক্যারলের আর কোনও ছাপ নেই।

একটা দমকা বাতাস কেনেথের গলা থেকে বেরিয়ে আসে, "তুমি কথা বলতে পারছ! উফ! এ তো আমি ভাবতেও পারছি না, আশাতীত ঘটনা। সবাই শুনুন, অ্যালিসন কথা বলতেও পারে!" সবার কাছ থেকে সাধুবাদ ছিটকে আসে।

রিড চোখ পরীক্ষা করার সরঞ্জাম এনে আমার চোখের ওপর একটি

আলো ফেলল। "রেটিনাল প্রতিক্রিয়া একদম যথাযথ। পিউপিল ঠিকঠাক প্রসারিত হয়েছে। ভাই, তুমি কিন্তু একটা দারুণ কাজ করেছ। আমি আবার তোমার প্রশংসা করি। অ্যালিসন, তুমি সত্যিই এক বিস্ময়।" সে আমার হাত ধরে তুলে নেয়, তার পর তা ছেড়ে দেয়।

"আমি ক্লান্ত। আমি দুঃখিত, হইচই করার জন্য আমার আর শক্তি অবশিষ্ট নেই।"

কেনেথ সবার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়। গ্রেটাও রয়েছে, আমি তার অবয়ব অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। ছোটখাটো কালো চেহারা।

"তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো?" কেনেথ আমার মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে বলল।

"আমার মনে হয় তুমি হলে দ্য গ্রেট চার্নস্কি। ঠিক তো?"

"ওহ, অ্যালিসন।" সে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে। গ্রেটা আর আমার চুম্বনের সঙ্গে এই চুম্বনের কোনও তুলনাই হয় না। ওর জিভ আমার জিভকে নিয়ে খেলা করছে আর আমি ভাবছি গ্রেটার ওপর আমার যে আকর্ষণ তা ক্যারলের কোষের কারণে নয় তো, নাকি আমি নিজের যৌনতার জন্য আমার সঠিক অনুভূতিগুলি এর আগে কখনও স্বীকার করিনি। যাই হোক না কেন, আমি আর কেনেথের কল্পনার পুতুল হয়ে থাকতে চাই না। তার প্রতি আমার কোনও আবেগই আর অবশিষ্ট নেই।

"আমি তোমাকে গ্রিক দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্র ভ্রমণে নিয়ে যেতে চাই। সেটাই দারুণ হবে, তোমার কী মত?"

"কেনেথ, আমি আমার লেখার জগতে ফিরে যেতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

সে কিছুটা হতাশ হয়েছে মনে হল, "তুমি যখন প্রথম এসেছিলে তখন তুমি কতটা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলে মনে আছে? আর আজ এতটাই নিস্পৃহ?" আমার হাতের ওপর হালকা চাপড় মেরে বলল, "ঠিক আছে, অ্যালিসন। আমাদের সামনে দীর্ঘজীবন পড়ে রয়েছে।"

আমি হাসতে চেষ্টা করি, কিন্তু বোঝা যায় সেটা ছলনার হাসি। সে সামান্য ভ্রূকুটি করে কি? নাকি ভুল দেখলাম, "আমাকে কি খুব বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে?"

"জানি না, আমার নিজেকে খুঁজে পেতে হবে। আমার নতুন সত্তা। তুমি আমাকে এই নতুন শরীর দিয়েছ, আর একটি নতুন জীবন। এর অর্থ

আমাকে জানতে হবে।”

তার কণ্ঠে বিষণ্ণতার আভাস খেলা করে যায়, “কোথাও আমার মনে হচ্ছে যেন আমি তোমাকে হারাতে চলেছি। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।” সে মুখ ফিরিয়ে নিল। “পারব না।” আবার সেই একই রকম বলার ধরন যেমনটা সেদিন সোনিয়ার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল, “আমি তোমাকে হত্যা করব...”

আমি স্থির ভাবে বলার চেষ্টা করলাম, তবু আমার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, “কেনেথ, তুমি আবার খুব তাড়াহুড়ো করছ।”

সে সামান্য শান্ত স্বরে বলল, “তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।” আমি তার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। সে এতেই কৃতজ্ঞ মনে করল। সে চলে যাওয়ার পর আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

গ্রেটা তার পিছনে দরজা বন্ধ করে এক ছুটে আমার কাছে চলে আসে। আমি এখনও তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার ওষ্ঠ আমার কাছে বাস্তব এবং আমাকে বেষ্টন করে থাকা তার বাহু দুটি আমার আশ্রয়স্থল।

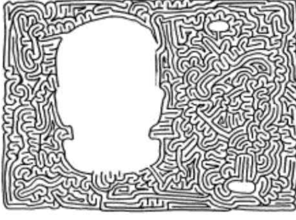
“আমি তোমাকে ভালোবাসি।” এই কয়েক মাসের জমিয়ে রাখা শব্দগুলো আমি উচ্চারণ করে ফেলি।

সে দু’হাতের তালুতে আমার মুখটা স্থির ভাবে ধরে থাকে। ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসে, কিন্তু শুধুমাত্র একটি মুহূর্তের জন্য। ও তো আমার কত পরিচিত। কত চেনা একটি মুখ। সে মুখে বলিরেখার দাগ। একবছর আগে আমার নিজের মতো। আমি যে এক বয়স্ক মানুষের প্রেমে পড়েছি। তার হাতের ব্যবহার দেখে আমি নিজের হাত ব্যবহার করতে শিখেছি। স্পর্শের সূক্ষ্ম অনুভুতি আমার এখনও আসেনি যাতে আমি তরুণ ত্বকের পেলবতা অনুভব করতে পারি। আমি ওর সঙ্গে আমার জীবন কাটাতে পারব না। আমার সারাটা জীবন।

আমি প্রার্থনা করি, যেন আমার হতাশা প্রকাশ না পায়। আমাকে আবার বিষণ্ণতা গ্রাস করে নেয়। যদি জানতাম, অন্যরকমভাবে ভালোবাসতে পারতাম কি না জানি না। প্রকৃতির ওপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণই যে নেই। ভগবানের সঙ্গে খেলা করার ক্ষমতা এমনকী, কেনেথেরও নেই।

আমি আমার দু’হাত প্রসারিত করে দিলাম তার দিকে। আমার ঘাড়ে সে

মুখ গুঁজে দিয়েছে। ওর চোখের জল গড়িয়ে নামছে আমার কাঁধ বেয়ে। আর এই প্রথমবার আমার নিজের গাল বেয়ে নামছে অশ্রু।



ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ‘দানব’-এর বিবর্তন

দেবজ্যোতি গুহ

‘I saw the dull yellow eye of the creature open; it breathed hard, and a convulsive motion agitated its limbs.’

লন্ডন। ১৮১৮ সালের ১লা জানুয়ারি, প্রকাশ পেল এক নামহীন রচয়িতার উপন্যাস ‘Frankenstein Or, The Modern Prometheus’— যা কিনা প্রখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক Brian Aldiss এর মতে প্রথম প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন কাহিনি। এই রচনা প্রকাশ পেয়েছিল খুবই ছোট প্রকাশনা Lackington, Hughes, Harding, Mavor, & Jones থেকে। ছাপা হয়েছিল মাত্র ৫০০ কপি।

গত দুই শতাব্দী ধরে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং তাঁর তৈরি ‘দানব’ নানা রূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে সিনেমা, টিভি, নাটক, বই, কার্টুন এবং কমিক্সের পাতায়। সারা বিশ্বে সাহিত্যে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রথম ১০টি চরিত্রের মধ্যে অন্যতম ধরা হয় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ‘দানব’কে।

১৮২২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে খুব কম লোকই জানতেন এর রচয়িতা মেরি শেলি। কিন্তু ১৮১৮ এবং ১৮২২— এই দুই সংস্করণেই কোনও ছবি দেখা যায়নি। লেখিকার বর্ণনা পড়েই পাঠক এবং ভক্তদের তাদের মনের আয়নাতেই কল্পনা করে নিতে হয় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ‘দানবকে’ (ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের জবানিতে)— যে আট ফুট লম্বা, যার চোখ হলদে এবং পাতলা চামড়ার আবরণ ভেদ করে পেশিকোষ এবং রক্তনালী ফুটে উঠছে।

১৮২৩ সালে English Opera House-এ মঞ্চস্থ হয় তিন অঙ্কের নাটক *on; or, the Fate of Frankenstein’*। তৎকালীন পেশাদার মঞ্চ-অভিনেতা Thomas Cooke অভিনয় করেন নামহীন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ‘দানবের’ ভূমিকায়। স্বয়ং মেরি শেলি এই নাটক দেখেন এবং Thomas Cooke এর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন, ‘Frankenstein had prodigious success as a drama & was about to be repeated

for the 23rd night at the English opera house. The play bill amused me extremely, for in the list of dramatis personæ came, ——— [i.e., the Creature] by Mr. T. Cooke: this nameless mode of naming the un{n}ameable is rather good.'; 'The story is not well managed— but Cooke played ———'s part extremely well— his seeking as it were for support—his trying to grasp at the sounds he heard—all indeed he does was well imagined & executed.' এই প্রথম সকলের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' সঙ্গে।

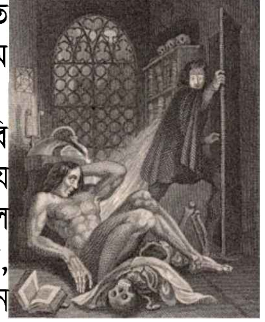


নাটকটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করে এবং দ্রুত আরও বড় মঞ্চে স্থানান্তারিত করা হয়। বছর শেষের আগেই পাঁচটি ভিন্ন সংস্করণ— একটি প্যারডি-সহ, মঞ্চস্থ হয়। পরের তিন বছরে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা মিলিয়ে প্রায় ১৪টি নাটকের প্রোডাকশন মঞ্চস্থ হয়। ১৮২৩ সালে এই নাটকের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবকে' নিয়ে, যদিও সব ক'টা সমান সাফল্য লাভ করেনি।



১৮২৬ সালে প্যারিসে 'Le Monstre et le magician' নাটকে Thomas Cooke আবার অভিনয় করেন এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার— এই নাটকে ওঁর মেকআপে মুখে সবুজ রং প্রয়োগ করা হয়, যা আর এক শতাব্দী পরে এই চরিত্রের প্রায় সিগনেচার মেকআপ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮২৭ সালে আবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং এবারে Richard John O. Smith অভিনয় করেন দানবটির ভূমিকায়। যদিও আগের নাটকটির মতন এটি অত জনপ্রিয় হয়নি।



১৮৩১-এ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধতে Theodor von Holst-এর আঁকা ছবিতে প্রথম উপন্যাসের ইলাস্ট্রেটেড সংস্করণ প্রকাশ পায়।

পরবর্তী সমস্ত উপন্যাসের সংস্করণেই 'দানবের' ছবি ছাপা হতে থাকে। খেয়াল করার বিষয় যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' চেহারা কিন্তু সেরকম ভয়াল দর্শন নয়, যা আমরা পরবর্তী কালে দেখতে অভ্যস্ত, বরঞ্চ এখনও তা শুধু আয়তনে বড় কিন্তু কিম্ভূত-দর্শন নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং তার 'দানব' প্রাত্যহিক ব্যবহারের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার করুণ পরিসমাপ্তি বোঝাতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানব' প্রায় নিত্যদিনের কথায় ব্যবহৃত হতে থাকে। কার্টুনিস্টরা এই সময়ের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ এবং হুমড়ি খেয়ে পড়াকে ব্যবহার করেছেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' সঙ্গে তুলনা করে।



১৯১০ সালে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' প্রথম প্রকাশ ঘটে ছায়াছবির জগতে। Edison Studios-এর ফিল্ম Frankenstein এ Charles Ogle অভিনয় করেন দানবের ভূমিকায়।

১৯৩৪ সালে প্রকাশ পায় বিখ্যাত উডকাট আর্টিস্ট Lynd Ward-এর আঁকা উপন্যাসের সংস্করণ। এখানেও কিন্তু শিল্পী 'দানবের' বেশ সহানুভূতিশীল চিত্রণ করেছেন।

কিন্তু এর মধ্যে ১৯৩১ সালে মুক্তি পেয়েছে Universal Pictures-এর James Whale পরিচালিত এবং Boris Karloff অভিনীত Frankenstein সিনেমাটি। এই সিনেমাটি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' চেহারা আগামি ৬০ বছর ধরে কেমন হবে তা যেন ঠিক করে দেয়। এর পরের দশকগুলিতে



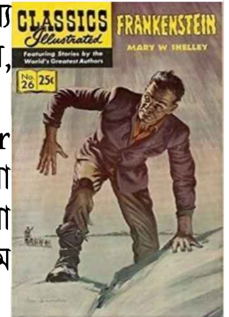
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের' চেহারা এবং মেকআপ সিনেমাতে তৈরি হতে থাকে Boris Karloff-এর মেকআপ ও অভিব্যক্তির অনুকরণে।



১৯৩৯ সালে কমিক্সে আত্মপ্রকাশ ঘটে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবের', DC Comics এর Movie Comics no. 1 (April 1939)। এখানেও সেই Boris Karloff অনুপ্রাণিত 'দানবের' ছবি আঁকা হয়েছে। কমিক্সের এই গল্পটি অবশ্য ১৯৩৯-এ রিলিজ হওয়া Son of Frankenstein সিনেমার গল্প।

১৯৪৫ এ Classics Illustrated কমিক্স নং. ২৬ এ মেরি শেলির উপন্যাসকেই চিত্ররূপ দেওয়া হয়। যদিও Boris Karloff-এর ছায়া এর মধ্যে কম দেখা যায়।

৪০, ৫০ এবং ৬০-এর দশকের সিনেমা এবং প্রকাশিত কমিক্সগুলি মূলত ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবকে' Boris Karloff-এর ছায়ায় পরিবেশন করতে থাকে। বাজারে ছেয়ে যায় Karloff অনুপ্রাণিত 'দানবের' খেলনা, অ্যাকশান ফিগার, বোর্ড গেম ইত্যাদি। এরই মধ্যে সিনেমাতে 'দানব' তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর লাভ করে, পড়াশোনা করতে শেখে এবং বিয়েও করে।



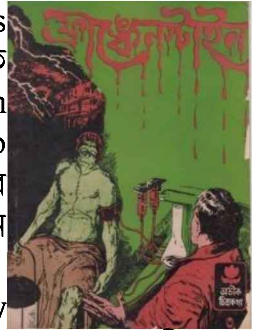
১৯৭৩-এ Andy Warhol প্রযোজিত Flesh for Frankenstein ছবিটি এক নতুন 'দানবের' চেহারা দর্শকের সামনে আনে, Srdjan Zelenovic অভিনয় করা 'দানবকে' এখনও অবধি বলা হয় সবচেয়ে হ্যান্ডসাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানব'।

উল্লেখযোগ্য এই সময়েই মুক্তি পায় blaxploitation ছবি Blackenstein প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানব'।



১৯৮৩-তে আঁকা Bernie Wrightson কমিক্স 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এ আবার অনেক দিন বাদে এক নতুন চেহারার ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের 'দানবকে' দেখা যায়, এর চেহারার সঙ্গে যেন মেরি শেলির উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রটি যেন পুরো মিলে যায়।

৮০-র দশকের শেষ ভাগে অভীক চিত্রকথা থেকে প্রকাশিত কমিক্স ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এ কিন্তু এইদিকে সেই পুরানো Boris Karloff-এর ছায়াই পাওয়া যায়।



১৯৯৪-তে রিলিজ হওয়া Mary Shelley's Frankenstein-এ আবার নতুন করে সিনেমাতে ভাবতে শুরু করায় দানবকে নিয়ে। Kenneth Branagh পরিচালিত এবং Robert De Niro অভিনীত ছবিটি তথাকথিত হিট ছবি না হলেও এর বাইরে বেরিয়ে নতুন আঙ্গিকে 'দানবের' রূপায়ন দর্শককে ভাবায়।

২০১১ তে National Theatre, লন্ডনে Danny Boyle-র পরিচালনায় নতুন আঙ্গিকে থিয়েটারে Frankenstein পরিবেশন করে। মুখ্য অভিনেতা Jonny Lee Miller এবং Benedict Cumberbatch দু'জনেই একই নাটকে রোল পাল্টাপাল্টি করে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং 'দানব' চরিত্রে অভিনয় করেন।

২০১৮ সালে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে Restless Books এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে চলেছে, মেক্সিকান আর্টিস্ট Eko র আঁকা
নতুন ছবিসুদ্ধু।

'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর 'দানব'-এর ছায়া সাহিত্য, শিল্পের বিভিন্ন উপাদানে এইভাবে ছেয়ে আছে গত প্রায় ২০০ বছর, বাণিজ্যিক ফ্রাঞ্চাইসিগুলোর এক

সার্থক কাঁচামাল হয়ে। এর পেছনে হয়তো আমাদেরই মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কোনও অল্টার ইগো দায়ী। আমরা ভয় পেতে ভালোবাসি অনেক সময়। যে ভয় অজানা আবছায়ার মাঝে দেখা দেয় দুঃস্বপ্নের গভীরে।

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল



সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

নেভাদা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— ইউএস আর্মির গোপন এক বায়োকেমিকেল ল্যাব —

আজ অফিসে ঢুকতে কিছুটা দেরিই হয়ে গেল ডঃ ভি–এর। কিন্তু অফিসের মুখে এসেই শুনলেন দুঃসংবাদ!

"স্যার— খবরটা শুনেছেন?" সারাহ জিজ্ঞেস করল।

"না তো— কী হয়েছে? আর তুমি এখানে কেন?", ডক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

"স্যার, আজ সকালে ডঃ শিন মারা গেছেন। ল্যাবের L2B456V ভাইরাসের কালচারটা মনে হয় কোনও ভাবে খোলা ছিল। উনি সকালে ঢুকে ডিফ্রস্টার খুলতেই..."

ডক্টর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। L2B456V হচ্ছে ডঃ ভি-এর আবিষ্কৃত ভাইরাসের মধ্যে অন্যতম ভয়ঙ্কর ভাইরাস। এটি কোনওভাবে রক্তে প্রবেশ করলে মৃত্যু অবধারিত। অবশ্য এই অত্যাধুনিক ল্যাবের সিস্টেমই এমন যে, কোনও ভাইরাস দুর্ঘটনাক্রমে ল্যাবে একবার ছড়িয়ে গেলে, নিমেষের মধ্যে ল্যাব বাইরে থেকে এয়ারটাইট হয়ে কোয়ারেণ্টাইনের সিগন্যাল দিতে শুরু করে— যাতে বাইরের খোলা বাতাসে বা নিদেন পক্ষে অন্য ঘরেও যেন সেই ভাইরাসের প্রবেশ না ঘটে!

"ডঃ শিন প্রিকশন নেননি?" ডঃ ভি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হাউ কুড এ পারসন বি সো ইরেসপনসেবল? পইপই করে আমি বলে দিয়েছি— তবুও এই হাল!"

সারাহ মাথা নাড়ল। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কালরাতে ডঃ শিন একবার ল্যাবে ঢুকেছিলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে যান। এবং আজ সকালে এসেছিলেন আবার। তখনই এই দুর্ঘটনা!

ডঃ ভি-কে কেমন একটা অসহায় দেখাল! এই সময় হার্বাটও পাশে নেই। ছেলেটা কাছে থাকলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

ডঃ ভি হার্বাটকে ফোন লাগালেন, "বিটল, খবর পেয়েছ? ডঃ শিন মারা গেছেন।"

ওপাশ থেকে ফ্লাইটে অ্যানাউন্সমেন্টের আওয়াজের সঙ্গে ভেসে এল ডঃ হার্বাটের উৎকণ্ঠা, "কী হল?"

পুরো ঘটনা বলে ডঃ ভি জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না হার্বাট। তুমি পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত হতুম।"

"আমিও প্রফেসর। কিন্তু আমার আন্ট-এর এখন-তখন অবস্থা। আমি নেমে ফোন করছি।" হার্বাটের গলা শোনা গেল।

ফোনটা ছাড়ার পর হার্বাট কিছুক্ষণ দাঁত চেপে রইল। তারপর অন্য একটা ফোন বের করে একটা স্পেশাল নাম্বারে ফোন লাগাল।

"প্যাকেজেস আর অন দ্য ওয়ে। পুরো ব্যাপারটা ছকে ফেলেছি। একটা ব্রিফিং লাগবে। অ্যারাইভিং টুমরো।"

ইমিগ্রেশনে নিজের নাম সই করল— "ডঃ হার্বাট ওয়েস্ট"- ডেসটিনেশন – কলকাতা, ইন্ডিয়া।"

***

জ্বর আর সর্দিটা কিছুতেই কমছিল না রুক্মিনীর।

বেশ ক'দিন ধরেই ভোগাচ্ছে জ্বরটা। নভেম্বরের মুখে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য এমন বিচ্ছিরি মুশকিল পড়ে যাবে সেটা কে জানত। পরশুই অফিসে প্রেজেন্টেশনটা আছে, এদিকে কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করছে না তার! জ্বালা হল দেখি!

মা পইপই করে বলেছিল বৃষ্টিতে ভিজিস না। কিন্তু বৃষ্টি হলেই যেন রুক্মিনী কীরকম একটা হয়ে যায়। ছোটবেলায় তার বাবা এই অভ্যেসটা তাকে ধরিয়েছিল। এখন বাবা তো নেই— কিন্তু অভ্যেসটা রয়ে গেছে। সেদিন অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু অফিসে কনফারেন্স ছিল— শাড়ি পরে বেরিয়ে তো ভেজা যায় না, তাই বাড়িতে এসে কোনওমতে ব্যাগটা রেখেই ছুটে গিয়েছিল ছাদে— মনের সুখে গায়ে লেপ্টে নিয়েছিল ঠান্ডা জলের চাদর!

জ্বরটা আসার পর দু-চারটে বাজার চলতি ওষুধ খেয়ে দেখেছে রুক্মিনী। কিন্তু কিছুতেই কমছে না জ্বরটা। মা বলে ভাল্লুকে জ্বর— ভাল্লুক যেমন মধু খাবার জন্য একই জায়গায় বারবার ফিরে ফিরে আসে, সেরকমই নাকি এই জ্বরটাও ঘুরে ফিরে আসছে। যেন প্রেমে পড়ে গেছে রুক্মিনীর।

দশ দিনেও যখন ব্যাপারটার নিস্পত্তি হল না, তখন ডাক্তার দেখানোই ঠিক করল রুক্মিনী। পারতপক্ষে সে ডাক্তারদের এড়িয়েই চলে, কিন্তু এখন কিছু করার নেই। ডাঃ মিত্র ওকে ভালো করে দেখে সামান্য কিছু ওষুধ দিলেন, বললেন হপ্তাখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা না করতে, আর বেশি করে ফল-মূল খেতে।

রবিবার সকাল থেকে ফলেরই শ্রাদ্ধ করছে রুক্মিনী। পেয়ারা, কমলা, কলা সবই এক এক করে শেষ করছে। কিন্তু তা-ও মাথাটা বড্ড ভার লাগছে তার। ল্যাপটপ খুলে দুনিয়ার এক্সেল শিটে মন বসাতে পারছিল না সে আর কিছুতেই। বিরক্তিকর! অফিসে এত কাজ দেয় কেন? এদিকে এইচআর সারাজীবন ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্সের বুলি শুনিয়ে গেল— মাই ফুট! শালা রবিবারেও নিস্তার নেই! নিজের মনে গজগজ করতে করতে কাজ করে যাচ্ছিল রুক্মিনী।

মাথাটা যেন আরও ভার হয়ে আসছে— গলাটাও কেমন ব্যথা ব্যথা করছে! সে তো ছোটবেলা থেকে বৃষ্টিতে ভিজে আসছে, এরকম তো কখনও হয়নি! আশ্চর্য! শরীরে যে কখন কী হয়!

শাম্বটাও যে এই সময়ে কোথায় চলে গেল তার ঠিক নেই। শরীরে কষ্ট হলে, মন ভীষণ ভাবে নিজের মানুষদের কাছে থাকতে চাইতে থাকে। আর ছাগলটা এই সময়েই ট্রেকিং করতে গেল, তা-ও সান্দাকফু-তে। ফোনে পাওয়া যায় না, ইন্টারনেট তো দুরস্ত! মনটা খারাপ হয়ে গেল রুক্মিনীর।

ফেসবুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে নিজের পেন্ডিং ফ্রেন্ডলিস্টটা চেক করছিল সে। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা অদ্ভুত আইডি থেকে রিকোয়েস্ট এসেছে। কুইক রেমেডি বলে কেউ একজন তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। মাথাটা বেশ যন্ত্রণা করছে তার, তিন-চারবার বিকট শব্দ করে হেঁচেছে একটু আগেও। মা এসে ধাতানি দিয়ে গেছে এই শরীরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার জন্য। কী মনে করে রুক্মিনী অ্যাকসেপ্ট করে নিল রিকোয়েস্টটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিং শব্দ হল ম্যাসেঞ্জারে।

"ফিলিং ডাউন অ্যান্ড আউট?"

কী করে বুঝল? রুক্মিনী জিজ্ঞেস করল "কে তুমি?"

প্রশ্নটা উপেক্ষা করে পাল্টা প্রশ্ন এল,

"শরীর খারাপ লাগছে?"

ঠোঁটটা কামড়ে রুক্মিনী লিখল, "হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে। কিন্তু কে তুমি? তুমি

কেমন করে জানলে শরীর খারাপ?”

উত্তর এল, “আমরা কুইক রেমেডি। জ্বর-সর্দির জন্য আমাদের কোম্পানি একটা অব্যর্থ ওষুধ বের করেছে। ট্রাই করতে চাও?”

পিত্তি জ্বলে গেল রুক্মিনীর— যত্তসব! কেউ অ্যাডের জন্য প্রোফাইল বানিয়ে রেখেছে। ভালো লাগে না— ফেসবুকটা দিনকে দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। মোবাইলটা হাতে থেকে রেখে দিতে যাবে, আবার পিং...

“যদি চাও তো তোমাকে স্যাম্পেল পাঠিয়ে দেখতে পারি। তোমার ঠিকানা জানাও— একদিনে রেমেডি।”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রুক্মিনী। দোলাচলে দুলতে থাকল কিছুক্ষণ। ক’দিন আগে ডাঃ মিত্রকে দেখিয়েছে— কিন্তু তাঁর ওষুধে শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। ডঃ মিত্র ডায়াগনোজ করে সাধারণ জ্বরের থেকে বেশি কিছুই বলেননি। জ্বরও যে খুব বেশি আছে তা নয়— সাধারণ ঘুষঘুষে জ্বর কিন্তু সর্দি এবং শারীরিক অস্বস্তি প্রবল।

রুক্মিনী সরাসরি নিজের ঠিকানা দিতে চাইল না। অনেক বদলোক আছে, যারা এইসব করে মেয়েদের ঠিকানা বাগাবার চেষ্টায় থাকে। তারপর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত স্টক করবে। এ অভিজ্ঞতা রুক্মিনীর এই সাতাশ বছরের জীবনে কম হল না। তাকে দেখতে সুশ্রী, শান্ত স্বভাব। পাড়ার দিক দিয়ে সেরকম কোনও অসভ্যতা না হলেও, কিছু উড়োলোকের টার্গেট সে বহু দিন ধরেই ছিল। তারা অফিস থেকে তাকে মাঝে মাঝে ফলো করত। অনেক কষ্টে সে এসব পশুগুলোর খপ্পর থেকে বাঁচতে পেরেছে। এ হয়তো এরকমই কেউ। বেশ ক’দিন ধরে তাকে ফলো করেছে। বুঝতে পেরেছে তার শরীর খারাপ। তাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে কায়দা করে তার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইছে। হুঁ হুঁ, রুক্মিনীও কম ধড়িবাজ নয় হে চাঁদু। ভাবতে ভাবতে চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মামার ঠিকানাটা দিলে কেমন হয়? মামা অর্থাৎ মিঃ অমর সরকার, বালিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর। এরা যদি কিছু ডেলিভারি দেয়, তাহলে তার মামার বাড়িতেই দিক। কেউ বেগড়বাঁই করলে মামা তাকে সোজা লক আপে চালান করে দেবে— উফফ, হেব্বি মজা হবে। যদি সত্যি কিছু ডেলিভারি হয়, তাহলে কাল অফিস থেকে ফেরার সময় মামির থেকে ওষুধটা নিলেই চলবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ— চটপট মামার বাড়ির অ্যাড্রেসটা দিয়ে কুইক রেমেডিকে পাঠিয়ে দিল সে। নীল একটা ডট হয়ে রয়ে গেল সেটা— অর্থাৎ

ম্যাসেজ চলে গেছে, কিন্তু প্রাপক পড়েনি। যাগ গে যাক, তার এখন অনেক কাজ আছে। আপাতত দুপুরে চান খাওয়া করে একটু গড়িয়ে নিলে যদি বিকেলের দিকে অস্বস্তিটা একটু কমে, সে চেষ্টাই করতে হবে রুক্মিনীকে।

রাতের দিকে সে খেয়াল করল, ম্যাসেজটা রিড হয়েছে, কিন্তু আর কোনও জবাব আসেনি।

***

দিন পনেরো আগেঃ- কলকাতা

"ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া- সিকিওরড লাইনেরও পাশ থেকে উচ্ছ্বাস ভেসে এল। কিন্তু আমার দু-চারটে প্রশ্ন আছে।" মিঃ আলি বলে উঠলেন, "আমি জানি আপনি কী জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবুও, বলে যান। একে একে উত্তর দিচ্ছি।"

"যা বললে তা তো অবিশ্বাস্য— কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এত ঝামেলা করার দরকার কী? ভাইরাসটা বাতাসে ছেড়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।"

"নাঃ— আপনি হয়তো জানেন না— রোগটা মহামারীর আকার নিলে, ভাইরাসের অ্যান্টিডোট বের করতে বেশি সময় লাগবে না। সরকার সতর্ক হয়ে যাবে— আমাদের প্ল্যান ভেস্তে যাবে। তাই ধীরে চলাই শ্রেয়। তা ছাড়া এটা একটা
স্পেশাল টাইপ— বাতাসে ছেড়ে দিয়ে হয় না।"

"আর এলিক্সির! সেটা কী করে খাওয়াবে?"

"সেটা আমার আলাদা প্ল্যান আছে— লোকে যেচে খাবে। আপনি কেবল ড্রোনটার ব্যবস্থা করুন। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।" মিঃ আলি বললেন।

"ওকে, বাট হোয়াই কলকাতা? উই হ্যাভ ফার রিচ প্লেসেস টু অ্যাটাক!"

"এটা পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা স্যার। ধরে নিন এটা একটা পাইলট প্রজেক্ট। সফল হলে নেক্সট টার্গেট আপনার চয়েস হিসেবেই হবে।" ফোনের ও প্রান্তের গলাটা কঠিন হয়ে এল, "বিধর্মী, কাফেরগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামের জয় চাই! মিসির— তুমি ব্যবস্থা করো।"

আলি মুচকি হাসলেন, "চিন্তা করবেন না। এ একেবারে ফুলপ্রুফ প্ল্যান।"

***

অফিসে আজ খুব একটা ভালো দিন যায়নি রুক্মিনীর। শরীরটা বেশ খারাপ

লাগছে। চাপা একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি তাকে কিছুতেই কাজে মন বসাতে দিচ্ছে না। সহেলীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "ওসব ছাইপাঁশ অ্যালোপাথি গিলিস কেন? হোমিওপ্যাথি খা। দেখবি চট করে সেরে যাবে। নির্মূল হয়ে যাবে জিনিসটা।" হোমিওপ্যাথের ওপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই রুক্মিনীর। ও নিজে পড়েছে, ওটা সিউডো-মেডিসিন। মানে মেডিসিনের মতো দেখতে, কিন্তু কিছুতেই ওষুধ নয়। কিন্তু ঠেলায় পড়লে বাঘেও ঘাস খায়। অফিসে বসে ধ্যাতানি খেয়ে তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। আরে মশাই, শরীর খারাপ হলে সে কী করবে?

"মিস সেন, আপনার কি শরীর খারাপ? তাহলে অফিস এসেছেন কেন? রেস্ট নিন।"

"স্যার তাই নিতাম, কিন্তু পরশুর প্রেজেন্টেশনটার জন্য কিছু কাজ ছিল।" রুক্মিনী ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে।

"ওসব দেখা যাবে, কাল ছুটি নিন। না হলে যা অবস্থা দেখছি, পরশু পাক্কা ধ্যাড়াবেন। ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

রুক্মিনীকে তার শরীর খারাপের কাহিনি বিশদে বলতে হয়। বস শুনে চুকচুক করে মাথা নাড়েন, "শরীরের প্রতি যত্ন নিন, বুঝলেন? খালি সারা দিন ফোন আর ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? এই দেখুন আমি রোজ সকালে এক ঘণ্টা জগিং করি, বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানেক সুইমিং করি। আমার শরীরে কখনও কোনও ক্লান্তি বা কষ্ট দেখেছেন? এই শরীরকে অবহেলা করবেন না। বুঝতে পারছি, আপনার ইমিউনিটি কমে গেছে।..."

উপদেশামৃত পান করে ধ্বস্ত রুক্মিনী অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল।

"কোথায় যাবেন দিদিভাই?"

"শোভাবাজার, পাওয়ারহাউসের দিকে।"

"পঞ্চাশ টাকা বেশি লাগবে।"

কটমট করে ট্যাক্সিওয়ালাটার দিকে একবার তাকিয়ে রুক্মিনী ট্যাক্সিতে উঠে
পড়ল। "তোমাদেরই বাজার, চলো।"

ট্যাক্সিতে উঠে শাম্বকে দু'বার ফোন করতে চেষ্টা করল রুক্মিনী— ফোন নট রিচেবেল। শালা, অদ্ভুত ছেলে তো! কাল থেকে একটাও ফোন নেই, না কোনও মেসেজ! আসুক এবার, ফোন করুক। এইসব ছেলেদের স্বভাব এক-

একটু পাত্তা দাও কি মাথায় চড়ে বসবে! ক'দিন আগে কি পেছন-পেছন ঘোরা, লাঞ্চ করা, কফিশপে বসা নিয়ে কত বায়ানাক্কা! আর যখনই ছেলেটার ওপর একটু দুর্বল হতে শুরু করেছে রুক্মিনী, তখনই এমন গা-ছাড়া ভাব দেখাচ্ছে শাম্ব, যেন ওর কিছু এসে যায় না। মাথাটা দুম করে গরম হয়ে গেল রুক্মিনীর।

মা-কে একটা ফোন করার জন্য ফোনটা তুলতে যাবে রুক্মিনী, তখনি মামিমার ফোন ঢুকল।

"হ্যাঁ মামি বলো, আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছি।"

"আচ্ছা আয়— তোর নামে একটা পার্শেল এসেছে রে। তোর নাম লেখা। তুই কি কাউকে আমাদের বাড়ির অ্যাড্রেস দিয়েছিলি?"

ইসসস-খুব ভুল হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মামিমাকে জানানো উচিত ছিল। "সরি মামি। কী এসেছে গো?"

"কে জানে কী এসেছে। লেটার বক্সটা খুলতে গিয়ে দেখি এটা পড়ে আছে। তুই আয়, এলে দেব।"

লেটারবক্স? এ আবার কী! আজকাল লেটারবক্সে কেউ ডেলিভারি দেয় নাকি! এ আবার কেমন ধারা কোম্পানি রে বাবা!

মা-কে ফোন করে মামার বাড়ি যাচ্ছে বলে জানিয়ে দিল রুক্মিনী। শরীরটা বড্ড ম্যাজমাজ করছে আবার!

মামি যখন তার হাতে প্যাকেটটা তুলে দিল, তখন সে অবাক হয়ে গেল। সাধারণ কাগজের প্যাকেট। প্যাকেটের উপরে তার নাম লেখা। খুব সন্তর্পণে প্যাকেটটা ছিঁড়ে নিল সে। প্যাকেটের ভেতর থেকে বেরলো একটা ছোট্ট শিশি— তাতে কুইক রেমেডির একটা লোগো আঁটা আর লেখা "এলিক্সির"— যে লোগোটা সে ম্যাসেঞ্জারের দেখেছে, ঠিক সেইরকমই। শিশির সঙ্গে একটা ফিডব্যাক শিটের মতো, ওষুধ খেয়ে কী কী উন্নতি হচ্ছে, সেগুলোতে টিক মারতে হবে।

ওষুধটা খেতে ঠিক ভরসা পেল না রুক্মিনী।

সে তো মজা করেই অ্যাড্রেস দিয়েছিল, এ যে সত্যি সত্যি চলে আসবে সেটা রুক্মিনী আশাই করেনি। ডাক্তার না দেখিয়ে দুমদাম ওষুধ খাওয়া যায় না। ডঃ মিত্র বলেছিলেন, একবার ব্লাড টেস্ট করাতে। সকালেই ঝন্টিদা এসে রক্ত নিয়ে গেছে। রাতের বেলা হয় তো রিপোর্ট দেবে। কী যে হচ্ছে তার সঙ্গে কে জানে।

ওষুধের শিশিটা ব্যাগে পুরে রাতের দিকে মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। মামার ফিরতে রোজই রাত হয়— পুলিশের চাকরি। পুরো থানার দায়িত্ব ঘাড়ে। সবে সবে পুজো মিটেছে— তাই মামাকে এখন নাকি প্রতিদিনই ওভার টাইম করতে হচ্ছে। মামা-মামির এক ছেলে। অনিদা কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। রুক্মিনী আর অনির্বাণ পিঠোপিঠি মামাতো ভাই-বোন।

বাড়ি ফিরতে ন'টা বেজে গেল রুক্মিনীর। কলিং বেল বাজাতে মা এসে দরজা খুলে দিল, "দ্যাখ কে এসে বসে আছে।"

বিরক্ত রুক্মিনী জুতো খুলতে খুলতে চাপা স্বরে মা'কে বলল – "আবার কে এল এত রাতে! বিরক্তিকর। শরীর ভালো নেই সেটা তুমি তো জানো মা। ফালতু কেন যে লোকজনকে ডাকো কে জানে।"

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই তার শরীর যেন এক লহমায় ভালো হয়ে গেল। ডাইনিং টেবলে হাতে একটা চকোলেটের প্যাকেট নিয়ে হাসি-হাসিমুখে বসে আছে শাম্ব।

***

নেভাদা, ইউএস আর্মি গোপন বায়োকেমিক্যাল ল্যাবঃ

নেভাদায় রাতের আকাশ দেখার মতো। যেন কালো ক্যানভাসের প্রেক্ষাপটে কিছু জ্বলন্ত পুঁতি সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। সেদিকে তাকিয়ে ডক্টরের রোজই অন্যরকম লাগে। সারাদিন ল্যাবে কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস, নানা ক্যালকুলেশনসের মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত ডক্টরের এই একমাত্র ব্রেক। কিন্তু সেদিকে তাকিয়েও ডক্টরের মাথায় হাজারো চিন্তা। হার্বাট সেদিনের পর আর ফোন করেনি। ফোন প্রতিবারই সুইচড অফ বলেছে। ছেলেটা এভাবে তো কোনওদিন গায়েব হয়ে যায়নি। হলটা কী?

এদিকে সিআইএ ডঃ শিনের বাড়িতে হানা দিয়ে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছে। ডঃ শিন নাকি আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে ঘৃণ্য আতঙ্কবাদী দল আইএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্তত তাঁর বাড়ি থেকে পাওয়া নথি এ কথাই বলছে। ডক্টর ভেবে পান না—কীভাবে এত সিকিয়োরিটির বেড়াজাল এড়িয়ে এইসব লোক তাঁর টিমে এসে ঢুকল। ডঃ রিচার্ড শিনকে তো বেশ ভালো মানুষ মনে হতো, সে যে ভেতরে ভেতরে কিছু ষড়যন্ত্র করছে তা কে জানত!

"স্যার..." সারাহ-র গলা পেয়ে ডক্টর চমকে উঠলেন। মেয়েটা যেন খালি দুঃসংবাদই বহন করে আনছে।

“আবার কী হল?” ডক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

“স্যার- H1N5RR678 ভাইরাসের কালচার গায়েব। আজ সব কালচারগুলো সাজাতে গিয়ে দেখতে পেলাম।”

“সে কী! ওটা আবার কে নিয়ে গেল?” ডক্টর প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“জানি না স্যার— আরও একটা গণ্ডগোল লাগছে। এলিক্সির-এর মূল ভায়ালটাও উধাও।” তারার আবছা আলোয় সারাহ-এর চোখে মুখের আতঙ্ক স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ডক্টর ভি।

“হোয়াট!” প্রচণ্ড চমকে উঠে ডক্টর ছুটলেন তাঁর ল্যাবে। এটা সম্ভব নয়। ওটা তাঁর প্রাইভেট কেবিনের ভেতর স্পেশাল রেফ্রিজারেটারে ছিল। আর তার কম্বিনেশন কেবল জানেন তিনি এবং...

এবং ডঃ হার্বাট ওয়েস্ট।

***

“তুই? এত রাতে? তোর ফোন তো নট রিচেবেল।” রুক্মিনীর গলা থেকে খুশি উপচে পড়ল যেন।

“হে হে— ইচ্ছে করে রেখেছিলাম। যাতে তুই হেভি রাগ করে বাড়ি ফিরিস। তোর শালা বাড়ি ফেরার নাম নেই! সেই কখন থেকে বসে আছি জানিস? নে নে, চকোলেটটা খেয়ে ফেল। দারুণ জিনিস— সন্তুদা আমেরিকা থেকে এনেছে।” শাম্ব এক গাল হেসে বলল। সন্তু শাম্বর পিসতুতো দাদা। আইটিতে চাকরি করে, সেই সূত্রে আমেরিকাবাসী। হ্যালির ধুমকেতুর মতো ঠিক নিয়ম করে পাঁচ বছরে একবার বাড়ি ফেরে মাসখানেকের জন্য— আর তখন বাড়ির লোকেদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে।

রুক্মিনী গভীর চোখে শাম্বর দিকে তাকাল। ছেলেটাকে আজ খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। রংটা আরও ফরসা হয়েছে। গালগুলো পাকা আপেলের মতো রক্তাভ হয়ে আছে। বেশ লাগছে আজ ওকে।

মা ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “শাম্ব, আজ খেয়ে যেও বাবা। মাটন বানিয়েছি। তোমার তো খুব পছন্দ।”

শাম্ব এক গাল হেসে বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ কাকিমা, নিশ্চয়। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে।”

শাম্বর পেটে কনুই এর হালকা গুঁতো মেরে রুক্মিনী বলল, “পেটুক কোথাকার।”

শাম্ব রুক্মিনীর আগের অফিসের কলিগ। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটাকে বেশ লাগত রুক্মিনীর। সৎ, কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান, মিতভাষী ছেলেটিরও রুক্মিনীকে ভালো লেগেছিল। রুক্মিনী অবিশ্যি চুপচাপ মেয়ে। সে শাম্বকে অফিসে সারাদিন দেখলেও কাছে যাওয়ার চেষ্টা কোনওদিন করেনি। যতদিন তারা এক অফিসে ছিল, নিপুণভাবে অফিস ডেকোরাম মেনে চলেছে। একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, কেউ কাউকে কিছু জানতে দেয়নি।

রুক্মিনী অফিস ছাড়ার পর থেকেই শাম্ব ওকে ফোন করত। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইত। রুক্মিনীরও ভালো লাগত না শাম্বকে না দেখে। ব্যাপারটা যেন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েগিয়েছিল। অভ্যেস যে কখন নিঃশব্দে ভালোবাসায় পরিণতি পেল, সেটা দু'জনের কেউই বুঝতে পারেনি।

রুক্মিনির ঘরে বসে শাম্ব বলল, "তোর শরীর খারাপ নাকি রুমি? মুখটা এত শুকনো কেন?"

রুক্মিনি কিছু বলার আগেই, মা বলে উঠলেন, "দ্যাখো না বাবা, তুমি যবে থেকে গেছো, তারপর দিন থেকেই কীরকম শরীর খারাপ করে বসে আছে। খাওয়া দাওয়া শিকেয় উঠেছে। জ্বর-জারি নিয়ে বড্ড ভুগছে রুকু।"

রুক্মিনী মায়ের প্রতি দাঁত কিড়মিড় করল— উফফ, সব ব্যাপারে শাম্বর ঝোল টানার দরকার কী আছে? মা আর বদলাল না।

শাম্ব ছদ্ম-সিরিয়াসনেসে ফিসিফিসিয়ে বলল, "কীরে রুমি! আমার বিরহে জ্বর এসে গেল?"

রুক্মিনী বলল, "বিরহ না ছাই! কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। মা, আমার ব্লাড রিপোর্টটা দিয়ে গেছে ঝন্টিদা?"

"হ্যাঁ রে, দিয়ে গেছে। দ্যাখ তোর ঘরের টেবিলের ওপর রাখা আছে।"

শাম্ব ব্লাড রিপোর্টটা ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে মন দিয়ে দেখল। "আরে, এ তো সবই নেগেটিভ। ভয়ের তো কিছুই নেই।"

রুক্মিনী থম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইল। তার মাথায় এবার সত্যিই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ব্লাড রিপোর্ট কিছু বলছে না, কোথাও কিছু নেই, কিন্তু গত দশ দিন ধরে তার জ্বর সারে না কেন?

শাম্ব রুক্মিনীর হাত ধরল। রুক্মিনী বুঝতে পারল, শাম্বর হাত বেশ ঠান্ডা— তবে কি তার জ্বর আসছে? "দ্যাখ রুমি", শাম্ব খুব ঘন হয়ে এল, "তোর কিছু হয়নি। তুই সেদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলি নির্ঘাত? সেখান থেকেই ঠান্ডা লেগে হয়েছে এটা। আমারও হয়েছিল এরকমই— কিছুতেই সারছিল না।

তারপর একটা অদ্ভুত ওষুধে পুরোপুরি সেরে গেল। আমি জানতাম না, তোর এই কেস হয়েছে— তা হলে আমি নিয়ে আসতাম।”

রুক্মিনী আন্দাজে ঢিল ছুড়ল, “কী ওষুধ? এলিক্সির?”

শাম্ব রুক্মিনীকে ছেড়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে। “তোকে কে বলল?”

রুক্মিনী শাম্বকে সব খুলে বলল। এতক্ষণ ব্যাপারটা কাউকে বলতে না পেরে তার পেট ফুলে উঠেছিল। বলে ফেলে এখন তার অনেক হালকা লাগছে।

শাম্ব চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, “দ্যাখ রুমি— আমিও সেদিন ভিজেছিলাম অফিস থেকে ফেরার পথে। শালা দিব্যি ফুরফুরে ওয়েদারে বৃষ্টি নামবে কি করে বুঝব বল? আর অদ্ভুতভাবে আমারও পরের দিন জ্বর এসেছিল। যাবার আগের দিন জ্বর এলে কেমন লাগে বল? যখন ক্রোসিন, কাঁড়িকাঁড়ি প্যারাসিটামলেও কোনও কাজ হল না, আমার কাছে কুইক রেমেডি যেন ভগবানের আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল। আমার বাড়ির ঠিকানা দিলাম— বললাম আর্জেন্ট আছে। দেখি ঘণ্টাখানেক পর আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে কেউ একটা প্যাকেট রেখে গেছে— আমার নাম লেখা। খুলে দেখি ছোট একটা শিশি। তাতে বিভিন্ন ডোজ উল্লেখ করা আছে। ‘জয় মা’ বলে গলায় ঢেলে দিলাম। তারপর দ্যাখ, দিব্যি ট্রেক করে এসেছি, দুর্দান্ত ফিল করছি। তুই এত ভাবিস কেন সব ব্যাপারে? খেয়ে নে— দারুণ জিনিস। আমি তো ভাবছি সব্বাইকে রেকমেন্ড করব এবার ওষুধটা। জ্বর-সর্দির এর থেকে অব্যর্থ ওষুধ আমি জীবনে দেখিনি।”

রুক্মিনীর বুক থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। সে বলল, “বেশ আমিও খাব। তুই যখন বলছিস। চল, মা ডাকছে এখন খেয়ে নে।”

হঠাৎ শাম্ব উঠে দাঁড়িয়ে খুব অপ্রত্যাশিত একটা কাজ করে বসল। রুক্মিনীকে জড়িয়ে ধরল আচমকা। রুক্মিনীর গলায়, ঘাড়ে ঘষতে লাগল তার মুখ। রুক্মিনীর কাছে ব্যাপারটা এতটাই অদ্ভুত ছিল, যে সে প্রথমে শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজেকে সঁপে দিল শাম্বর বুকের ভেতর। কেমন যেন অদ্ভুত বন্যভাবে তাকে আঁকড়ে ধরেছে শাম্ব। রুক্মিনীর জীবনের এরকম অনুভূতি এই প্রথম, কিন্তু বেশ উপভোগ্য। মুখচোরা শাম্ব যে এতদূর পর্যন্ত বিনা আমন্ত্রণে এগোতে পারে, সেটা রুক্মিনী সত্যিই ভাবতে পারেনি।

মায়ের দ্বিতীয় ডাকটা কানে যেতেই রুক্মিনী এক ধাক্কায় শাম্বকে সরিয়ে দিল তার কাছ থেকে। কিন্তু ঘরের হালকা হলুদ আলোটা ওর মুখে পড়ে এক অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি মুহূর্তের জন্য রুক্মিনীর চোখে ধরা পড়ল। আচমকা প্রত্যাখ্যাত শাম্ব'র মুখটা এত ক্রুর এবং নৃশংসভাবে কুঁচকে গেল, যে রুক্মিনী ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্যই। যখন চোখ খুলল, তখন শাম্ব ঘর ছেড়ে চলে গেছে। রুক্মিনী বুক হালকা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

খাবার টেবিলে বিশেষ কোনও কথা হল না। রুক্মিনীর মা একাই বকে গেলেন। রুক্মিনী কেবল তাকিয়ে রইল শাম্বর দিকে। কী পরিবর্তন এসেছে ছেলেটার মধ্যে— বাপরে! একটা ব্রেকে গিয়ে ছেলে তো পুরো লোক বনে গেছে। অন্য ধরনের একটা পার্সোনালিটি গ্রো করেছে— একটা ডমিনেটিং ব্যাপার, যেটা নিয়ে রুক্মিনী মনে মনে শাম্বকে কল্পনা করে এসেছে।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ করল রুক্মিনী— শাম্বর খাওয়া অসম্ভব বেড়ে গেছে। নিজের মাংসের বাটি তো শেষ করলই, সঙ্গে সঙ্গে তার মাংসের বাটিটাও বেমালুম তুলে সাফ করে দিল। ছেলেটার সত্যি বেশ খিদেই পেয়েছিল বলতে হবে। অন্যদিন হলে এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত, কিন্তু আজ রুক্মিনীর শরীরটা একদম ভালো লাগছে না। তা ছাড়া শাম্বর প্রগলভ ব্যবহারও তাকে কিছুটা হতভম্ব করে দিয়েছে।

***

রাতে শোয়ার সময় 'এলিক্সির'-এর শিশিটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল রুক্মিনী। শিশির মাথার প্যাঁচটা বেশ অদ্ভুত। এত শিশি-বোতলের টুপি দেখেছে, এরকম ক্যাপ দেখেনি সে আগে কখনও। শিশির মধ্যেকার তরলটি স্বচ্ছ। এবং তার মধ্যে তিনটি বিভাজিকা আছে— সেগুলো কর্ক দিয়েও হতে পারে, বা অন্য কোনও বস্তু দিয়েও হতে পারে। এর অর্থ, তিনটে ডোজ যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই খেতে হবে। তার থেকে বেশি খাওয়া যাবে না। প্রথম ডোজ খাওয়ার পর হতে পারে প্রথম বিভাজিকাটি বেরিয়ে আসবে। তারপর দ্বিতীয়— একসঙ্গে পুরোটা যাতে না খাওয়া যায়, তাই এই ব্যবস্থা। বাহ্ কোম্পানির বুদ্ধি আছে বলতে হবে। রুক্মিনী চমৎকৃত হল।

খাওয়ার পর থেকেই তার মাথাটা ভীষণ দপদপ করছে। গলাটাও ব্যথা করছে বেশ। তবু সে একবার ল্যাপটপ খুলে বসল। টাইপ করল, 'এলিক্সির'। প্রথমেই দেখতে পেল 'এলিক্সির' নামে একটা প্রোগ্রামিং

ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তা ছাড়া, যে কোনও তরল মেডিসিন যার মধ্যে অসাধারণ কিছু নিরাময় ক্ষমতা থাকে, তাকে এলিক্সির বলে। কিন্তু মুশকিল হল, এই নামে কোনও ওষুধ মার্কেটে নেই। কুইক রেমেডি বলেও কোনও কোম্পানি সে খুঁজে পেল না। মহা মুশকিল— এ কি ভুঁইফোড় কোম্পানি নাকি! সকালে দেবাশিস দা'কে জিজ্ঞেস করতে হবে। দেবাশিসদা একটা নামী ওষুধ কোম্পানীর বেশ উঁচু পোস্টে চাকরি করেন। তাঁর পক্ষে অন্তত ওষুধের কোম্পানির খোঁজ রাখা সুবিধেজনক। মেসেঞ্জারে দেবাশিসদাকে ওষুধের শিশির ছবিসমেত একটা পুরো ইনফো দিয়ে রাখল সে।

রাতে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে রুক্মিনী বুঝতে পারল তার সাংঘাতিক জ্বর আসছে। উঠে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই। গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, হাতও চলছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। মা'কে কোনওমতে ডাকতেই হবে যাতে ডঃ মিত্রকে খবর দেয়। এভাবে সে বাঁচবে কী করে! শরীরটা হাঁচড়-পাঁচড় করে রুক্মিনী বিছানায় উঠে বসল। জলের বোতলটা নিতে গিয়ে দেখল মাথার শিয়রে টেবিলের ওপর রাখা আছে 'এলিক্সির'-এর শিশিটা। যা থাকে কপালে বলে প্লাস্টিকের কভারটা খুলে গলায় ঢেলে দিল প্রথম ডোজটা। তারপর শিশিটা টেবিলে রেখে কাত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে গেল সে— মাথার ওপর হালকা হলুদ আলোটা অন্ধকার হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

নেভাদা – আমেরিকাঃ

"সরি ডক" ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন, "ডঃ শিনের ঘরে ওসব কিস্যু নেই।"

"আপনি ডবল চেক করেছেন ইন্সপেক্টর? ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর।" ডক্টর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ইন্সপেক্টর মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন। "দেখুন ডক, আমার কাজ আমি খুব ভালোভাবে জানি। আপনি যে ভায়াল বা কালচারের ছবি দেখিয়েছেন, সেরকম কিছুই ওঁর বাড়ি থেকে পাওয়া যায়নি। আপনি ভালো করে দেখুন— হয়তো ল্যাবেই কোথাও রেখেছেন। আমি জানি বিজ্ঞানীদের এরকম ভুলো মন থাকে।"

ডক্টর হতাশ হয়ে বসে রইলেন। একটা জিনিস কিছুতেই তিনি বুঝতে পারছেন না— 'এলিক্সির'-এর সঙ্গে H1N5RR678 ভাইরাসের কালচার গায়েব হওয়ার কারণ কী?

ইন্সপেক্টর বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি অনেকক্ষণ মাথা টিপে বসে থাকলেন। রাতের খাবারও খেলেন না। সারাহ-কে বলে একটা ফ্লাস্কে ব্ল্যাক কফি দিয়ে যেতে বললেন।

সারা রাত ল্যাবে ব্ল্যাক কফি এবং নেভাদার শান্ত বাতাসে দুটো চুরুটের ঘন ধোঁয়া বাতাসে মেশানোর পর ভোর রাতে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা মারাত্মক সম্ভাবনা তাঁর মাথায় খেলে গেল। হ্যাঁ, এটাই, এটা ছাড়া আর কোনও কারণ হতে পারে না।

তিনি বুঝে নিয়েছেন চোরের উদ্দেশ্য, বুঝে নিয়েছেন এর পেছনে রয়েছে এক অসাধারণ শয়তানি এবং ধুরন্ধর মস্তিষ্ক। তিনিও কম যান না, কিন্তু এখন তাঁকে জানতে হবে, চোর সেটা কবে এবং কোথায় অ্যাপ্লাই করেছে।

এবং চোরটা ঠিক কে!

ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসল রুক্মিনী তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। যাকগে, আজ অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। বিছানায় উঠে বসেই সে অনুভব করল, তার গায়ের ব্যথা, জ্বর সব গায়েব হয়ে গেছে। শরীরটা একদম নতুন লাগছে — এতটা সুস্থ সে বহু দিন ফিল করেনি। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সে বাথরুম সেরে নিল। তারপর ঘড়ি দেখল প্রায় দশটা বাজে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার। বেশ বেশ, এই তো সুস্থ তার লক্ষণ। মাকে হাঁকডাক করে ব্রেকফাস্ট বানাতে বলল রুক্মিনী। অফিসে আজ সে যাবেই— যতই দেরি হোক। ওই সবজান্তা বসকে দেখিয়ে দেবে, সুস্থ সে-ও থাকতে পারে।

তিন-তিনটে অমলেট গলাধঃকরণ করে যখন সে প্রায় দৌড়ে বাসে গিয়ে উঠল তখন তার শরীর চনমন করছে। অফিসে সারা দিন সে প্রচুর ধকল নিল, প্রেজেন্টেশন বানাল— দু-চারটে ভেন্ডর মিট করল। অফিসের বাইরে গিয়েও চারটে মিটিং করে এল। সহেলি বলল, “তোর হল কী রে? হোমিওপ্যাথি খেয়েছিস নাকি? কাল তো দেখলাম লটকে আছিস— আজই এত চাঙ্গা?”

রুক্মিনী মুচকি হাসল, “খেয়েছি রে পাগলি, তবে হুমো পাখি না, এলিক্সির।”

“এলিক্সির? মানে অমৃত?” সহেলি হাঁ করে চেয়ে রইল।

অমৃতই বটে, রুক্মিনী ভাবল। সত্যি ওষুধটার ক্ষমতা আছে বলতে হবে।

তার খিদেও বেড়েছে বেশ। দুপুরে জমিয়ে লাঞ্চ করল অফিসের ক্যান্টিনে। তারপর বিকেলে নীচে নেমে পাঁচটা বিস্কুট সমেত দু-কাপ চা।

নাহ্, এতদিনের বুভুক্ষু পাকস্থলী যেন সুদে-আসলে সব উশুল করে নিতে চাইছে তার থেকে।

বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় দেবাশিসের ফোন।

"কিরে, ওই ওষুধের ব্যাপারে কী লিখেছিলি কাল? কোথায় পেলি ওটা?" দেবাশিসের গলায় উত্তেজনা।

"কেন গো? কোনও সমস্যা?"

"আমি এখুনি তোর বাড়ি আসছি। তুই ফিরছিস কখন?" দেবাশিসের গলায় স্পষ্ট উৎকণ্ঠা।

"এই একঘণ্টা পরে, কী ব্যাপার বল তো, কী হয়েছে?" রুক্মিনী এবার একটু সতর্ক হল।

"দেখা হলে বলব। আর একটা কথা, ওষুধটা এখন খাস না।" বলেই ফোনটা কেটে দিল দেবাশিস। রুক্মিনীর জবাবের তোয়াক্কা না করেই।

সারা বাসটা চিন্তামগ্ন হয়ে কাটল রুক্মিনীর। বাড়ি ফিরে দেখল দেবাশিস বসে বসে চা খাচ্ছে।

সে সামনে দাঁড়াতেই দেবাশিস তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পেয়েছিস ওষুধটা?"

রুক্মিনী পুরো ইতিহাস দেবাশিসকে বলল। তবে এটা চেপে গেল যে সে একটা ডোজ খেয়ে ফেলেছে। আগে শোনাই যাক না কী বলতে চায় দেবাশিস।

"তোর ওষুধের খবরটা কাল রাতেই দেখেছি। তখন কিছু বুঝিনি। তবে কিছুটা বুঝেছি আজ বিকেলে। বুঝেই তোকে তড়িঘড়ি ফোন লাগিয়েছিলাম।" দেবাশিসের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"কী হয়েছে দেবাশিসদা? একটু খুলে বলবে?"

"ব্যাপারটা আমিও খুব ডিটেইলসে জানি না। তবে, আমাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। ডাক্তারদের বোঝানোর জন্য, তাদের বিভিন্ন কোয়ারিজ থাকে, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হয়। অনেক এমআর পড়ে না, তারা ফাঁকিবাজি দেয়, ডাক্তারদের ঘুষ দেবার চেষ্টা করে ওষুধের বিক্রি বাড়ানোর জন্য, কিন্তু আমি সেই দলে পড়ি না।"

রুক্মিনী জানে, দেবাশিসদার প্রতিটি কথা নির্জলা সত্যি। ভদ্রলোক তার দাদার বয়সি এবং তাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করেন। কাজের ক্ষেত্রে দেবাশিসদা অসম্ভব প্রফেশনাল এবং দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সে

শুনেছে, আড়ালে দেবাশিসদাকে অনেকে 'পাস না দেওয়া ডাক্তার' বলেও ডাকে। অনেক ডাক্তারও নাকি দেবাশিসদার সামনে পড়ে নাজেহাল হয়েছেন, মেডিসিনে ওঁর স্ব-অর্জিত জ্ঞানের সামনে বাধ্য হয়েছেন নতজানু হতে।

"বহুদিন আগে, মানে প্রায় বছর পাঁচেক আগে আমাকে একবার জার্মানিতে যেতে হয়েছিল। মিউনিখে একটা ডাক্তারদের অধিবেশন ছিল। সেখানে একটা মেডিকেল জার্নালে আমি 'এলিক্সির' নামের একটা ওষুধের ব্যাপারে কিছু একটা পড়ি। আমি কাল সারারাত জার্নালটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। সারা ইন্টারনেট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন কিছু পেলাম না, তখন ভাবলাম, একবার আমার কেবিনের ফাইলগুলো চেক করে দেখি। আমার প্রতিটা অধিবেশনের মিনিটস্, সেখানে পাওয়া জার্নাল আমি যত্ন করে তুলে রাখি আলাদা ফাইলে। সেখান থেকেই আজ সকালে জার্নালটা পেয়ে গেলাম। আর পড়ে রীতিমতো চমকে গেছিলাম।"

দেবাশিস একটু দম নিল, তারপর বলে চলল, "জার্নালে ডঃ ভি এবং ডঃ হার্বাট ওয়েস্ট নামধারী দুই গবেষক, ভি-এর পুরো নামোল্লেখ পেলাম না, 'এলিক্সির' নামের একটা ওষুধের কথা লিখেছেন। সেটা নাকি তাঁরা মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দুর্দান্ত সব ফল পেয়েছেন। কিন্তু এই ওষুধের মারাত্মক কিছু সাইড এফেক্টস আছে, যেটার জন্য তাঁরা আরও গবেষণা করতে চান। এর বেশি আর একটা শব্দও আমি সারা নেট ঘেঁটে পেলাম না। কিন্তু..." দেবাশিসদা একটু চুপ করে রইলেন, "আমার তখনই সন্দেহ হল, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। তাই তোকে তখনি ফোন করে মানা করলাম। দ্যাখ আমি এটার সাইড-এফেক্টস বা এফেক্টস কিছুই জানি না। তবে এই নামে ওষুধ যে দোকানে বা আমাদের কোম্পানির ডেটাবেসে নেই, সেটা আমি ভেতর ভেতর খোঁজ নিয়ে জেনেছি। অন্য কোম্পানির থেকেও খবর নিয়েছি। তাই বলছিলাম ব্যাপারটা ডেঞ্জারাস হতে পারে। সাবধানে থাকিস।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেবাশিসদা কিন্তু কিন্তু করে একটা কথা বলে গেলেন, "আমি ওই জার্নালের পাবলিশারকে ফোন করেছিলাম। অথরদের কোনও কন্ট্যাক্ট ডিটেইলসের জন্য। ওরা আমাকে মেল আইডি দিল— তা-ও ডঃ ভি-এর। হার্বাট ওয়েস্টের কোনও আইডি ছিল না। আমি তোর মেসেঞ্জারের ফোটোটা দিয়ে একটা মেল পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখি কী উত্তর দেয়।"

রুক্মিনীর মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। সে তড়িঘড়ি

শাম্বকে ফোন করল, "তুই এখুনি একবার বাড়ি আয়।"

"আরে অফিসে মিটিং চলছে। মগের মুলুক নাকি! দাঁড়া রাতের দিকে যাব। এখন রাখছি।" শাম্ব ফোন ডিসকানেক্ট করে দিল।

রুক্মিনী ওষুধের ভায়ালটা ভালো করে চেক করল। প্রথম বিভাজিকাটি ক্ষয়ে

এসেছে কিছুটা। কাগজে লেখা আছে, যেদিন প্রথম বিভাজিকাটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাবে, সে দিনই দ্বিতীয় ডোজটা খেতে হবে। তার আগে নয়।

শাম্ব এল না সেই রাতে। ফোনও সুইচড্ অফ। রুক্মিনীর খুব একটা যে খারাপ লাগল তা-ও নয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রুক্মিনী শুয়ে পড়ল। সেদিন রাতে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল।

চতুর্দিকে লাল রক্তের স্রোত বইছে। তার মধ্যে দিয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছে সে আর শাম্ব। শাম্বর মুখটা যেন আপেল-রাঙা হয়ে উঠেছে। আহ্ ঠোঁটটা কী টকটকে লাল! রুক্মিনী শাম্বর কাছে আরও ঘন হতে চাইছে, আর তখনই তারা দেখতে পেল— রাস্তায় কয়েকটা নারী-পুরুষ উবু হয়ে বসে রয়েছে। কী যেন করছে তারা। শাম্ব এগিয়ে গেল তাদের কাছে। রুক্মিনীর বুক যেন কী একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সে চিৎকার করে মানা করল শাম্বকে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, লোকগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাদের দিকে। ওদের মুখ থেকে ঝরে পড়ছে টকটকে লাল রক্ত। যে মানবদেহটি রাস্তায় পড়ে রয়েছে— সেটি রুক্মিনীর মা-এর। সেই শরীর থেকেই এরা ছিঁড়ে নিচ্ছিল মাংসের দলা!

রুক্মিনী বিষম আতঙ্কে পাগলের মতো ছুট লাগাল। কিছু দূর গিয়ে সে যখন পিছন ফিরে চাইল, তখন দেখল শাম্বর কাটা মুন্ডুটা শুধু তার দিকে চেয়ে রয়েছে, তার ঠোঁটটা তখনও টকটকে লাল।

রুক্মিনী যখন প্রচণ্ড ভয়ে বিছানায় উঠে বসল, তখন তার শরীরটা ঘামে জবজব করছে।

***

নেভাদা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভোর সাড়ে ছটা।

হার্বার্টকে ফোনটা করার জন্য সবেমাত্র ফোনটা খুলেছেন ডক্টর ভি— টুং করে একটা মেল ঢুকল তাঁর পুরানো মেল ইনবক্সে। ধ্যাত্তেরি এই অ্যাডের জন্যই তাঁর মেল খুলতে ইচ্ছে করে না। কতদিনে ভেবেছেন এই আইডিটা

উড়িয়ে দেবেন বা নিদেনপক্ষে নোটিফিকেশন অব করে রাখবেন। রোজ ভুলে যান।

কিন্তু মেল বক্সটা খুলেই চমকে গেলেন তিনি। একটা মেল এসেছে— দেবাশিস বলে একজনের থেকে। ইন্ডিয়ান এবং কলকাতা বলে একটা জায়গা থেকে সে লিখছে। তাঁর আবিষ্কৃত 'এলিক্সির'-এর ব্যাপারে বিশদে জানতে চেয়েছে। মেলটা বার বার পড়লেন ডঃ ভি। তাঁর যা বোঝার তিনি বুঝে নিয়েছেন। পুরো জিনিসটাই তাঁর কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার।

নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন ডক্টর। নিজের হাতে তৈরি পুত্রসম মানুষ যদি

তাঁকে এভাবে ধোঁকা দেয়, তা হলে তিনি কার কাছে যাবেন? হার্বাটকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন, নিজে কাজ শিখিয়েছেন। 'এলিক্সির' গায়েব হওয়ার পর তাঁর মনে একটা সন্দেহ এসেছিল বটে কিন্তু তা তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই।

সারাদিন ডক্টর কারো সঙ্গে কথা বললেন না। বিকেলে সারাহ যখন কল পেয়ে ডক্টরের কেবিনে ভয়ে ভয়ে ঢুকল, তখন তাঁর চোয়াল শক্ত।

"সারাহ, কল দ্য টিম। আমাদের ভীষণ জরুরি কিছু কাজ করতে হবে। ক্যানসেল এভরিথিং ইউ আর ডুয়িং রাইট নাউ। আই ওয়ান্ট অল অব দেম হিয়ার অনলি।"

তিনি জানেন পৃথিবীর মানবসভ্যতা এখন ভয়ানক সঙ্কটে। কিন্তু তার আগে, কলকাতাকে বাঁচাতে হবে।

***

দেবাশিস দেখল সকালে তার মেলবক্সে একটা মেল এসেছে। যদিও সেটা জাঙ্কে পড়েছিল, কিন্তু জাঙ্কে মেল দেখার অভ্যেসটা সে অনেকদিন আগেই বানিয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অনেক কাজের জিনিস জাঙ্কে পড়ে থাকে। কিন্তু সকালে মেলটা খুলে সে চমকে গেল। ডঃ ভি-এর থেকে এসেছে মেলটা।

কোথাও কিছু নেই, একটা নাম্বার দেওয়া আছে আর লেখা আছে— "কল মি।"

দিনের অ্যাপয়েনমেন্ট সেক্রেটারিকে ডেকে ক্যানসেল করে দিল দেবাশিস। তারপর ফোন করল ওই নাম্বারে। দু-বার রিং হতেই একটা কণ্ঠস্বর মার্কিন টোনে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

"ডঃ ভি আস্কড টু কল হিম। দিস ইজ দেবাশিস ফ্রম ইন্ডিয়া।"

"হি উইল কল ইউ ব্যাক।" এটা বলে বেশ অভদ্রভাবেই ফোনটা মুখের ওপর রেখে দিল লোকটা।

দেবাশিস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আইএসডি ফোনটা রিং হতে শুরু করল। দেবাশিস ফোনটা তুলতেই ওপ্রান্ত থেকে একটা নরম ও মার্জিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল "অপেক্ষা করানোর জন্য দুঃখিত। লাইনটা সিকিওর করতে কিছুটা টাইম লাগল। বলুন কী জানতে চান।"

দেবাশিস পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। ডক্টর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আপনি আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে খবর দিন। মারাত্মক বিপদ আসতে চলেছে কলকাতার ওপর। পুলিশি সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। আমেরিকান এমব্যাসিকে বলে পুলিশ চিফের সঙ্গে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করাতে বলুন। যদি আমেরিকান এমব্যাসি পাত্তা না দিতে চায়, তাহলে বলবেন— প্রোজেক্ট আলফা-থ্রি, কোড রেড। মনে হয় এতেই কাজ হবে। পারলে কাজগুলো আজকেই করুন প্লিজ, সময় হাতে একদম নেই।"

আমেরিকান এমব্যাসিতে ফোন করে কোড বলতে চকিতে কাজ হল। ওরা তাকে বলল এক্ষুনি এসে দেখা করো। অফিস থেকে বেরিয়ে দেবাশিস সোজা চলে গেল এমব্যাসিতে। ওরা ততক্ষণে ফোন-টোন সব সেরে রেখেছে। দেবাশিস গিয়ে দেখল সবাই বেশ টেন্সড হয়ে আছে। সে বুঝল, ব্যাপার গুরুতর।

মিঃ পরিমল রুদ্র, এসিপি সবেমাত্র দ্বিতীয় বারের জন্য কমোডে বসেছেন, শুনতে পেলেন তাঁর ঘরের স্পেশাল লাইনটা বেজেই চলেছে ক্রমাগত। বেশ কদিন ধরেই মিঃ রুদ্রের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বিচ্ছিরি ধরনের গা ম্যাজম্যাজ, মাথা এবং গলায় ব্যথা এসব হয়েই চলেছে। কাজ থেকে ফুরসত পান না ডাক্তার দেখানোর। তাই বাজার চলতি কিছু ওষুধ খেয়েই আপাতত দিন কাটাচ্ছেন তিনি। কিন্তু বড্ড কষ্ট হচ্ছে তাঁর। মেজাজটাও তিরিক্ষে হয়ে থাকে সবসময়।

প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে তিনি বাথরুম থেকেই তাঁর বউকে বললেন, "ধরো তো লাইনটা। বলে দাও বাথরুমে আছে, পরে ফোন করতে।"

বউ দরজার বাইরে থেকে খবর দিল, "কমিশনার সাহেব লাইনে আছেন।"

তড়িঘড়ি বেরিয়ে মিঃ রুদ্র ফোন ধরলেন, "বলুন স্যার... হ্যাঁ স্যার...

আমেরিকান এমব্যাসি? আবার কী হল স্যার? জঙ্গি অ্যাটাক নাকি? অ্যাঁ? তার থেকেও ভয়ানক? এখুনি আসছি স্যার।"

পেটে যন্ত্রণা নিয়েই ইউনিফর্ম পড়তে থাকলেন মিঃ রুদ্র। পুলিশের চাকরিতে কোনও শান্তি নেই। বাপ-মা পইপই করে বলেছিল আইএএস পড়তে, কিন্তু পরিমলের তখন গুন্ডা ঠ্যাঙানোটা খুব মাচো লাগত! এখন ঠেলা বোঝো!

সিপির অফিসে এসে মিঃ রুদ্র দেখতে পেলেন আমেরিকান হাই-কমিশনার ঘরে জাঁকিয়ে বসে রয়েছেন। সঙ্গে আরও একটি মুশকো মতো ভদ্রলোক। এঁকে ঠিক চিনলেন না পরিমল।

সিপি গম্ভীর গলায় বললেন, "পরিমল, আমিও ব্যাপারটা ডিটেইলসে জানি না। আমরা দুজনেই শুনব। যেহেতু আমি কাল সিএম-এর একটা উদ্বোধনে যাব, তাই খুব এমার্জেন্সি কিছু হলে তুমি সামলে নিও। ব্যাপারটা যতক্ষণ না সিএম-এর গোচরে আনতে পারছি, ততক্ষণ আমার সরাসরি ইনভলভড হওয়া মুশকিল। তবে আমার ফুল সাপোর্ট থাকবে।"

সিপির টেবিলের সামনে একটা কন-কল করার মেশিন রাখা। ঘরের দরজা আঁট করে বন্ধ করা। পরিমল বুঝলেন, ব্যাপারটা টপ সিক্রেট।

কিছুক্ষণ পরে মেশিনের ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, "হ্যালো স্যার'স— আশা করি আপনারা সবাই আছেন।"

"হ্যাঁ আপনি যাদের চেয়েছিলেন তারা আছে। বলুন কী বলতে চান। তার আগে আপনার একটু পরিচয় দিলে ভালো হয়।" সিপি বলে উঠলেন।

"অফকোর্স। আমার নাম ডক্টর ভি। আসলে আমি আমেরিকান বায়ো-ওয়েপন ডিপার্টমেন্টের হেড সায়েন্টিস্ট। সে কারণেই পুরো নামটা বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনাদের যে কথাগুলো বলতে চলেছি, সেগুলো মন দিয়ে শুনুন। এর ওপর নির্ভর করছে পুরো কলকাতা মায় ভারতের ভবিষ্যৎ।

আমি বেশ কয়েক বছর আগে একটি মলিকিউল আবিষ্কার করি, যেটা যুগান্তকারী বললেও ভুল হবে না। মলিকিউলটি মানব দেহের বেশ কিছু ভয়ঙ্কর রোগ লহমায় সারিয়ে দিতে পারে। আবিষ্কারটা খুবই চমকপ্রদ ছিল এবং সেটির ব্যাপারে আরও ডিটেইল গবেষণার জন্য আমার একজন ভালো অ্যাসিস্টেন্টের দরকার পড়ে। তখন ডঃ হার্বার্ট ওয়েস্ট নামে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আমার সঙ্গে কাজে যোগ দেয়। ভীষণ বুদ্ধিমান ছেলে ছিল হার্বার্ট।

ওকে আমি নিজের ছেলের মতো কাজ শিখিয়েছিলাম এবং ভীষণ চটপট কাজ বুঝে নিতে পারত সে। অচিরেই সে আমার প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠল। ওকে আমি আমার সব গোপন গবেষণার কাজে রেখেছিলাম। এমনকী, যখন আমি নিজে আমেরিকান সরকারের এই গোপন কাজে জয়েন করি, তখনও সে আমার সঙ্গেই ছিল।

আমার তৈরি মলিকিউল-টার নাম রাখি 'এলিক্সির'! কিন্তু তখনও অনেক পথ চলা বাকি ছিল। ওষুধের কার্যকারিতা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ি। দেখি ওষুধটা ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস এবং ভেন্ট্রোমেডিকেল নিউক্লিয়াসকে মারাত্মকভাবে স্টিমুলেট করছে। সহজ ভাষায় বলি, আমাদের খাওয়া, ঘুম, তৃষ্ণা এসবই হাইপোথ্যালামাস দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। ওষুধটি সেবনের পর, সাবজেক্টের খিদে সাংঘাতিক বেড়ে যায় আর ভেন্ট্রোমেডিকেল নিউক্লিয়াস অ্যাফেক্টেড হওয়ার জন্য, সে খিদে কন্ট্রোল করতে পারে না।

পুরো ব্রেন এভাবে অ্যাফেক্টেড হওয়ার পর সাবজেক্ট একজন চলতা-ফিরতা জোম্বিতে পরিণত হয়। সে শুধু খেতে থাকে, এবং এই সর্বগ্রাসী খিদের কবলে পড়ে সে সমস্ত মানবিক অনুভূতি খুইয়ে এক কিলিং মেশিনে পরিণত হয়। এই কিলিং মেশিনের লালায় তৈরি হয় এক মারাত্মক টক্সিন। সে যাকে কামড়ায়, সে দিন পাঁচেকের মধ্যেই আরও একটা জোম্বিতে পরিণত হতে থাকে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে আমি মলিকিউলটা পুরো চেপে যাই, কিন্তু পরে বুঝেছি হার্বার্টের এর ওপর লোভ ছিল মারাত্মক।

ক'দিন আগে আমার ল্যাবে এক সায়েন্টিস্ট ভাইরাসের আক্রমণে মারা যান। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা পুরো সাজানো। হার্বার্টই আগের দিন রাত্রে আমার ল্যাবে ঢুকে 'এলিক্সির'-এর ভায়ালটা সরায়, এবং ডিফ্রস্টারে একটা ভাইরাসের বুবি-ট্র্যাপ পেতে রাখে। ডঃ শিনের স্পেশাল ল্যাব-কোট সরিয়ে রেখে দেয় যাতে উনি কাজের চাপে ল্যাবকোট ছাড়াই ঘরে ঢুকতে বাধ্য হন এবং মারা যান। ডঃ শিনের সঙ্গে আইএস-এর যোগসাজশ দেখানোর জন্য কৌশলে তাঁর বাড়িতে অনেকগুলো সন্ত্রাসবাদী ডকুমেন্ট প্ল্যান্ট করে।

এবার সে মাস্টার স্ট্রোক দেয়। যে ভাইরাসটা হার্বার্ট সরিয়েছিল, সেটা এইচওয়ান, এনওয়ান ভাইরাসের একটা মোডিফায়েড রূপ। ওটার প্রতিষেধক পৃথিবীর মানুষের এখনও জানা নেই— জিন মডিফিকেশন করে ওটি বানানো হয়েছে। ওটা সরানোর কারণে প্রথমে আমার মারাত্মক ধোঁকা লাগে, কারণ ও দিয়ে সামান্য জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা ছাড়া আর কোনও রোগ

হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পরে যখন শুনি 'এলিক্সির'ও সরানো হয়েছে, তখন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

কিন্তু তখনও আমি চিন্তায় ছিলাম, কে, কীভাবে, কেন ওগুলোর ব্যবহার করতে চাইছে। কেন-র উত্তর এখনও পাইনি। তবে কে আর কীভাবের উত্তর পেয়ে যাই দেবাশিসের মেল থেকে।

হার্বাট মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কলকাতা এসেছিল ওর আন্ট-এর শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে। তারপর থেকে ওর ফোন বন্ধ। ও জানত যে, ফোন বন্ধ থাকলে আমি নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করব। তাই বুবি-ট্রাপ পেতে রাখল যাতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে ল্যাব বেশ কিছুদিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন থাকে এবং কী কী চুরি গেছে সেটা কেউ চট করে ধরতে পারবে না। তাতেও অনেকটা সময় হাতে পাবে ওর শয়তানি প্ল্যান কার্যকর করতে।

আমি নিশ্চিত এই কাজে আইএস যোগ আছে। আমি ইন্টারপোল এবং সিআইএ-কে খবর দিয়েছি। তারা এতক্ষণে হার্বাটের সব খুঁটিনাটি বের করতে শুরু করে দিয়েছে। এই কল শেষ হওয়ার পরেই আশা করি ওর ব্যাপারে সমস্ত ডিটেইলস আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারব।

যাই হোক হার্বাট একটা মারাত্মক প্ল্যান করল। একটা জেনোসাইডের ছক কষল অত্যন্ত নিপুণভাবে। জ্বর-সর্দির ভাইরাসটা কোনওভাবে ছড়িয়ে দিল কলকাতার বুকে। যেহেতু ওই ভাইরাসগুলোকে আমরা মহাকাশে পাঠিয়ে জিন মোডিফিকেশন করিয়েছিলাম, তাই ভাইরাসগুলোর গায়ে একটা করে ট্র্যাকার লাগানো ছিল। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটা সত্যি। হার্বাট খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারল কাদের কাদের ভাইরাস অ্যাফেক্ট করেছে। যেহেতু এটা অল্টারড ভাইরাস, তাই চট করে ব্লাড টেস্টে ধরা পড়বে না, কিংবা কোনও সাধারণ ওষুধে কাজ হবে না। এইভাবে রোগটা যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন আপনি ওর দেওয়া এলিক্সির খেতে বাধ্য হবেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে পরিণত হবেন এক-একটা কিলিং মেশিনে।"

একটানা বলে কণ্ঠস্বরটা একটু থামল। পরিমল বেশ বুঝতে পারল, তার হাত-

পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। জ্বরটা যেন আবার ফিরে আসছে, সঙ্গে অসহ্য মাথা ব্যথা!

"কিন্তু এত কিছু থাকতে ওই জ্বরের ভাইরাসই কেন? অন্য কোনও মারণরোগের ভাইরাস ছড়ালেই তো ল্যাঠা চুকে যেত", সিপি বলে উঠলেন।

তাঁর গলাও কেমন যেন কেঁপে উঠল।

"বুঝলেন না? মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সরকার যে কোনও মূল্যে সেগুলো দমন করার পন্থা নেয় এবং সে সব ভাইরাসের অ্যান্টিডোট বের করতে আপনারা ইউনাইটেড নেশনস অবধি ধাওয়া করবেন। কয়েকটা মানুষ মরলেও সেটা খুব একটা এফেক্টিভ হবে না। এবং কে ভাইরাস ছড়িয়েছিল তার তদন্তে হাজারো নাম উঠে আসবে।

এর থেকে সামান্য জ্বর-সর্দির প্রাদুর্ভাব ট্রপিকাল অঞ্চলে খুব স্বাভাবিক। কেউ তেমন গা করে না। তাই লোকে বুঝতেও পারবে না, অজান্তে তারা কীসের শিকার হতে চলেছে।"

"কিন্তু ভাইরাসটা ছড়াল কী দিয়ে?"

"এ প্রশ্নটা খুব ক্লিশে মনে হলেও এটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। এই ভাইরাসের একটা স্পেশালিটি আছে। এরা বায়ু মাধ্যমে খুব এফেক্টভলি ছড়াতে পারে না, এদের জন্য চাই জল। আপনাদের ওখানে দেখলাম দিন পনেরো আগে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। মনে হয়, কোনওভাবে ড্রোনের মাধ্যমে ভাইরাসগুলো মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আসা হয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে তারা বৃষ্টির সঙ্গে নেমে এসেছে। যারা যারা ভিজেছিল তাদের সবার মধ্যে রোগটা ছড়িয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।"

পরিমল প্রচণ্ড জোরে হেঁচে বলল, "হ্যাঁ, স্যার আমি এসিপি পরিমিল রুদ্র। আমিও সেদিন বাড়ি ফেরার মুখে ভিজে গেছিলাম।"

ঘরের বাকি সবাই তটস্থ হয়ে পিছিয়ে গেল কিছুটা। "রোগটা কি ছোঁয়াচে?" সিপি সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"একবারেই না, আর সেটাই যা আশার কথা।" ডঃ ভি বলে চললেন। "এবার আমাদের কিছু কাজ করতে হবে জেন্টেলমেন। এলিক্সিরের একটা অ্যান্টিডোট আমি বের করেছি গত কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে। তবে যারা ডোজ বেশি নিয়ে নেবে, তাদের জন্য কাজ নাও করতে পারে। তবে এখুনি ওটাকে আমি স্পেশাল ফ্লাইটে কলকাতা পাঠাচ্ছি। যারা এলিক্সির নিয়েছে, তাদের খাইয়ে দেবেন বা ইনজেক্ট করে দেবেন। দেরি করবেন না প্লিজ। আমি জানি না কতজন ওটার ওভারডোজ খেয়ে নিয়েছেন অলরেডি। বেশি দেরি করলে, কলকাতা শ্মশান হয়ে যাবে।"

"কিন্ত ওদের এফেক্টেড-দের ট্র্যাক করব কী করে?" মিঃ রুদ্র আসল প্রশ্নটা করে বসলেন।

“ভাইরাসগুলো যখন ট্র্যাকযোগ্য তখন তার একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস আমার কাছে আছে। সাধারণ গাড়ি ট্র্যাক করার মতো না, একটু জটিল। আমি ডিভাইসটা সঙ্গে নিয়েই আসছি। তাতে কতজন ভাইরাস এফেক্টেড হয়েছে, সেটা বোঝা গেলেও তাদের মধ্যে কতজন এলিক্সির খেয়েছে সেটা তো বোঝা যাবে না। তবে যারা এফেক্টেড, তাদের সব্বার দিকে নজর রাখতে হবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।”

***

রুক্মিনীর অফিস যাওয়া বন্ধ হয়েছে আজ দিন তিনেক হল। তার এখন সর্বগ্রাসী খিদে। সারাক্ষণ আকাশ খাই, পাতাল খাই অবস্থা। ভেজিটেবল আর মুখে রোচে না, তার ইন্টারেস্ট মাংসে। মায়ের রান্না করা মাংসে তার আর সেরকম রুচি নেই। সে এখন লুকিয়ে কাঁচা মাংস খায়। তাতে যেন মনে হয় তার খিদেটা একটু হলেও শান্ত হয়েছে।

শাম্বর ফোন অনেক দিন আসে না। তাতে রুক্মিনীর কিছু যায় আসে না। তার অনুভূতিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে পুরোপুরি। সারাক্ষণ সে কিছু না কিছু খেতে থাকে। তার শরীরে লালিত্যের জায়গায় এসেছে একটা ভোঁতা ভাব, চোখে একটা চরম উদাসীনতা এবং প্রচণ্ড ক্রোধ। সেদিন খাবার দিতে দেরি করায় মায়ের দিকে একটা কুকার ছুড়ে মেরেছিল রুক্মিনী। সেদিন থেকে ওর মা প্রচণ্ড আতঙ্কে থাকে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব শেষ হয়ে গেছে তার। ওষুধটার দ্বিতীয় ডোজ খাবার পরে যেন সে আরও কীরকম হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো সারাদিন করমচার মতো লাল, মুখে বিড়বিড় করে কী বলছে সে নিজেও জানে না।

তারে ঘুম আসে না আর কেবল রাতের বেলা প্রচণ্ড খিদে পেলে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে। প্রথম প্রথম তার লোলুপদৃষ্টি তাকিয়ে দেখত জীবন্ত প্রাণীদের সমারোহ। দু-এক দিনের মধ্যে যা কিছু পেল যেমন কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর সবই প্রচণ্ড পরিতৃপ্তির সঙ্গে ছিঁড়ে খেতে থাকে সে। তখন তার ক্ষুধা মেটার যা আরাম হয়, সে আর কিছুতেই হয় না।

আগের দিন রাতে এরকমই কিছু একটা তৃপ্তিদায়ক ডিনারের পর ঘুমিয়ে পড়েছিল রুক্মিনী। কি আরামের সে ঘুম! ঘুম থেকে উঠতেই শুনতে পেল কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকছে। ঘরে ঢোকার পর মানুষটার মুখ দেখে

মনে হল, রুক্মিনী যেন একে চেনে। কিন্তু কিছুতেই তার স্মৃতির ওপর চেপে থাকা জগদ্দল পাথরটা নাড়িয়ে মানুষটার পরিচয় মনে করতে পারল না সে।

শুধু সেই নয়, ঘরে ঢুকে এল আরও কয়েকটি মানুষ। একই রকম পোশাক পরা। এবার প্রথম মানুষটা তার হাত ধরার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড রাগে সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনের মানুষটা এর কম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটেই। সে ছিটকে মাটিতে পড়তেই, রুক্মিনী তার ঘাড়ে উঠে বসল। তার হাত চেপে বসে আছে মানুষটার নরম গলায়। আহ্ আজ সকালবেলাতেই কত খাবার এসে হাজির!

অকস্মাৎ একটা বিশাল শক্ত কিছু তার চোয়ালে আছড়ে পড়ল আর সবকিছু মুছে গেল তার চোখের সামনে থেকে।

মিঃ পরিমল রুদ্র হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "দেখুন দেবাশিসবাবু, মহিলাদের গায়ে হাত তোলা আমি একদম পছন্দ করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়েছে এ তো ভাবতেই পারিনি। ম্যাডামকে দেখেই তো আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল।"

দেবাশিস কোনও ক্রমে উঠে বসতে বসতে বললেন, "শিগগিরি, অ্যান্টিডোটের ভায়ালটা দিন। আর আপনাদের মধ্যে কেউ দয়া করে 'এলিক্সির'-এর শিশিটা খুঁজে বের করুন এখুনি।"

হসপিটালের বেডে শুয়ে শুয়ে রুক্মিনী সমস্ত কিছু শুনেছে দেবাশিসের মুখ থেকে। মাঝে মাঝে ভীষণ আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠেছে সে।

শাম্বকে বাঁচানো যায়নি। তার অবস্থা ছিল সবচাইতে খারাপ। তার বাড়িতে ঢুকে সবাইকে নাকে হাত চাপা দিতে হয়েছিল। নিজের মা-বাবাকে ক'দিন আগেই হত্যা করে তাদের পচা মাংস খাচ্ছিল শাম্ব আর সেই অবস্থায় তাকে ধরতে যায় এক বিশাল পুলিশবাহিনী। অ্যান্টিডোট দেওয়াতে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেই প্রবল খিঁচুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল ওর। সেই অসহ্য যন্ত্রণা তার হার্ট নিতে পারেনি।

রুক্মিনীর বেডের পাশ থেকে দেবাশীস উঠে যাওয়ার খানিক পরে ঢুকলেন এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সাহেব। তিনি রুক্মিনীর পাশে বসে অনেকক্ষণ তার চুলে হাত দিয়ে বিলি কেটে দিলেন। তারপর খুব মৃদু স্বরে ইংরেজিতে বললেন, "ঠিক তোমারই মতো সেই মেয়েটি ছিল, যাকে আমি প্রথম জীবনে এক্সপেরিমেন্টের জন্য ধরে এনেছিলাম। মেয়েটির রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আমি আর হার্বাট ওকে হাসপাতাল থেকে তুলে আনি। সেবা করি,

আমার তৈরি ওষুধ ওকে দিই। কী আনন্দে ছিল সে, তুমি ভাবতে পারবে না সিস্টার! তখনও কি ঘুণাক্ষরেও জানি, তার এই পরিণতি হতে চলেছে।” সাহেবের চোখের কোল দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

***

মিঃ পরিমল রুদ্র এখনও হেঁচে চলেছেন দিনে প্রায় কুড়ি বার। মাথা ধরাটা কিছুতেই কমছে না।

“স্যার, আপনার ওপর আমার একটা অভিযোগ আছে।” মিঃ রুদ্র ডঃ ভি-কে উদ্দেশ করে বললেন।

“কী শুনি।” স্মিত হেসে ওর দিকে তাকালেন ডক্টর।

“আমার এই শরীর খারাপটা কমাতে পারছেন না? আমি যে পাগল হয়ে যাব এবার।” মিঃ রুদ্র বললেন।

ডক্টর হাসতে হাসতে বললেন, “আপনারটার বা বলা ভালো আপনার মতো আরও অনেকের জন্য অ্যান্টিডোটের কাজ চলছে। আশা করি খুব শীঘ্র আমি আপনাকে সুস্থ করতে পারব। তা, আলির খোঁজ পেলেন মিঃ রুদ্র?”

“পেয়েছি, তবে সে পাখি পালিয়েছে। ডঃ হার্বার্ট ওয়েস্টই এখানে আলি নাম নিয়ে বেনামে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলেন। মনে হয় সে এখন আফগানিস্তানে।” মিঃ রুদ্র আবার একটা হাঁচি দিলেন।

নিজের পকেটের রুমালটা এগিয়ে দিয়ে ডক্টর বললেন, “আমি জানি সে কোথায়। একটা শেষ হিসেব বাকি আছে। আমি আসি এখন। ক’দিন পর আবার দেখা হবে। আমার নাম্বারটা লিখে রাখতে পারেন। ও, ভালো কথা। আমি বায়ো ওয়েপন ডিভিশন থেকে রিজাইন দিয়েছি। আপনাদের জন্য তৈরি ওষুধটাই হবে আমার শেষ কাজ। চলি।”

মিঃ রুদ্র বললেন, “একটা কথা ডক্টর, আপনি গোয়েন্দা হলে ভালো করতেন। যেভাবে কেসটা সলভ করলেন একা হাতে তাতে ভবিষ্যতে আর আমাদের দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। তবে একটা খটকা, হার্বার্ট ডঃ শিনকে মারল কেন? ও যখন জানত যে আপনি ওর পথের একমাত্র কাঁটা, তাহলে আপনাকেই সরিয়ে দিতে পারত।”

ডক্টর মাথা নাড়লেন, “সরাসরি আমাকে মারতে পারত না। কারণ আমার অনেক চোরাগোপ্তা সিকিওরিটি ছিল, যেটা আমিও অনেক ক্ষেত্রে জানতে পারতাম না। তাই সে সব রিস্ক নিতে যাওয়ার থেকে অ্যাক্সিডেন্ট দেখানোটা সহজ ছিল। আসলে আমাদের ল্যাব দুর্ঘটনার আগের রাতে ডঃ শিনের

ইউনিফর্মে এসে হার্বার্ট সিকিউরিটি ক্যামেরাকে ধোঁকা দেয়। এবং আমারই ইউনিফর্ম চুরি করে। সঙ্গে আরও অনেকেরই করে, যাতে ব্যাপারটা কাকতালীয় না মনে হয়। পরের দিন সকালে এসে আমার ইডিফ্রস্টারটা খোলার কথা ছিল। কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাওয়ায় ডঃ শিন গিয়ে ওটা খোলে।"

***

আফগানিস্তানের এক প্রত্যন্ত এলাকাঃ

মুখে মুচকি হাসি নিয়ে ইন্টারনেটে বাংলা খবরটা পড়ছিল আলি, "কলকাতার বুকে নৃশংস খুন। ছেলে হত্যা করল তার বাবা-মাকে।"

"এক্সেলেন্ট" মনে মনে বলল সে, "কাজ শুরু হয়ে গেছে দেখছি।"

আরামে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরাল সে। এখানে বড্ড গরম! বৃষ্টি বড় একটা হয় না। জলের কষ্ট খুব। তবে আল্লাহ-এর কাজে এসব ভাবতে নেই। এখানে চারদিকে সব্বাই হয় তালিবান না হয় আইএস।

হঠাৎ বাইরে একটা শোরগোল শোনা গেল, "বারান, বারান— বৃষ্টি বৃষ্টি।"

সিগারেটটা বুজিয়ে চাতকেমত আলি ছুটে গেল বারিধারা উপভোগ করতে। আহ্ কী আরাম!

মিনিট পনেরো ধরে ভালো করে চান করে আলি যখন ঘরে এল, তখন তার মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে,

"প্রিয় হার্বার্ট, অ্যালিয়াস, আলি,

আমি একটা দানব তৈরি করেছিলাম। আক্ষরিক অর্থেই দানব, আর সেটা তুমি। বিজ্ঞানের বই-এর বাইরে আমি তো কিছু পড়িনি বিশেষ। তাই তোমার ছদ্মনামের আড়াল থেকে তোমার স্বরূপ বুঝতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল। তোমার জারিজুরি আমি জেনে গেছি শয়তান। তুমি পালাবে কোথায়? তবে তোমার জন্য রইল আমার একটা ছোট্ট উপহার— আ ভেরি পোটেন্ট ডোজ অব এলিক্সির। মাইলাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ক্রিয়েশন ফর ডেমনস লাইক ইউ। বাইরে বৃষ্টি হল না এইমাত্র? চান করে নাও হার্বার্ট। কারণ আমার এই ডোজ খেতে হয় না। স্কিনের ওপর থেকেই কাজ শুরু করে। দুনিয়ার ধ্বংস দেখতে চেয়েছিলে না? আমি দেখে যাব— তোমাদের মতো রক্তবীজের দল কীরকম নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে ঝাড়েবংশে নিপাত যায়।

মনুষ্যত্ব আছে ও থাকবে। সে তোমাদের মতো দানব যতই থাকুক না কেন।

ইতি,
ডক্টর ভি, অ্যালিয়াস, ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।



শ্রীমতী

রণেন ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি আনন্দপুর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। অবশ্য এটা জানতাম যে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে আনন্দপুর বলে একটা গ্রাম আছে। আর না জানার কারণ আছে। আমি বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যার ফলে গ্রামবাসীদের আমাদের মানে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে।

সেদিন সকালে অফিসে ঢুকতেই দেখি একটা খাম পড়ে আছে আমার টেবিলে। ছাপ দেখে বুঝলাম হেডকোয়ার্টার থেকে আসছে। চিঠি পড়ে কিন্তু কিছুই মানে বুঝলাম না। শুধু লেখা আছে আনন্দপুর গ্রাম সম্বন্ধে যেন সতর্ক থাকি। অনেককিছু অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে সেখানে।

কোনও কিছু বলার আগে আমাদের পরিচয় দেওয়া ভালো। আমি সম্প্রতি এই থানায় বদলি হয়ে এসেছি। এখানে এসে দেখলাম আমার বন্ধু তরুণ সেন এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর। তরুণ সেনের একটু পরিচয় না দিলে তার চরিত্রের অনেকটা বাদ থেকে যাবে। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, বলিষ্ঠ গড়ন। মাথার চুল কোঁকড়ানো। গায়ের রং ফর্সা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা কল্পনাপ্রবণ। এক কথায় বলা যায় সুপুরুষ। অবশ্য তার একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে। জীব জন্তুদের অসম্ভব ভালোবাসে সে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখলেই বলে, 'এদের যারা কষ্টে রাখে, আইন করে তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার।' তাই ওর বন্ধু-বান্ধবদের মতে চারটে পা এবং কিছু লোম দেখলেই তরুণ মুগ্ধ হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখলে মনে হয় তারাই তরুণের প্রকৃত বন্ধু।

সুতরাং চাকরি ছাড়াও তার একটা কাজ হচ্ছে জীবজন্তুদের পরিচর্যা করা এবং যদি আইনের মধ্যে পায় তো জীব-জন্তুদের যারা কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি দেওয়া।

যাক্, কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দপুর থেকে কয়েকজন লোক এল আমার কাছে। তরুণ তাদের বসতে বলল।

একে একে তাদের বক্তব্য শুনতে লাগলাম। আর তরুণ নোট বইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলো টুকতে আরম্ভ করলো।

প্রথমে নৃপেন বোস বললেন, 'সেদিন খুব ভোরে আমি দুধ নিয়ে পাশের গ্রামে যাচ্ছি। তখনও চাঁদ ডোবেনি। পুবের আকাশ অল্প অন্ধকারে লাল হচ্ছে। স্পষ্ট দেখলাম আমার রাস্তার কিছু দূরে কি যেন দুটো দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। না, দেখতে কোনও ভুল হয়নি। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা ঠিক শেয়ালের মতো। অথচ স্পষ্ট দেখলাম লেজ নেই। আবার দু-পাশ থেকে হাতের মতো ও যেন কি দেখা যাচ্ছে। উচ্চতায় বোধ হয় পাঁচ কি ছয় ফুট হবে। তারা হেলে-দুলে হেঁটে এসে রাস্তায় ওপর দাঁড়াল। এবার চোখে পড়লো বুক পেট একদম গোল মসৃণ। মাথায় কোনও চুল নেই। কিন্তু শিং-এর মতো কি যেন রয়েছে। চোখ দুটো গোল গোল, বেশ বড় আর যেন বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তার পরেই আমার দিকে এগিয়ে এল ওরা। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

আরও অনেকে দেখেছে বলল। আর তাদের বর্ণনার সঙ্গে নৃপেনবাবুর পার্থক্যও বেশ। অনেকে বলল যে হাতদুটো ঠিক মানুষের হাতের মতো। আমি বললাম, 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ওইরকম বিদকুটে পোষাক পরে কেউ আপনাদের ভয় দেখিয়েছে।' কিন্তু তারা মানতে রাজি হল না। এর উত্তরে যা বলল তাতে সত্যিই চিন্তিত হলাম। উত্তেজিতভাবে একজন বলল— 'আপনি কি বলছেন? মানুষ ভয় দেখাচ্ছে। এই তো সেদিন রামদা ওদের তাগ করে গুলি ছুঁড়লো। স্পষ্ট সবাই দেখলো গুলি বুক ভেদ করে চলে গেল। মরা দূরে থাক, দৌড়ে ওরা বনের মধ্যে ঢুকে গেল।'

'স্যার, আপনারা একবার নিজের চোখে দেখবেন চলুন। তাহলে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারবেন', একজন অনুরোধ করল।

মোদ্দা কথা হল, এই ভূতুড়ে ব্যাপারে গ্রামের সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে কেউ আর রাস্তায় বেরোয় না। সন্ধ্যেবেলায় যেন গভীর রাত নেমে আসে আনন্দপুরে। গভীর রাতে জানালা দিয়ে তাকালেই ওই দুই

মূর্তিকে প্রায়ই দেখা যায় যেখানে সেখানে সুতরাং গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য চায়।

আমি বললাম, 'কিন্তু তারা যদি কোনও ক্ষতি না করে থাকে তো তাদের বিরুদ্ধে কি করা যাবে তো বুঝি না!' তরুণ এবার মুখ খুলল। জোরালো গলায় বলল, 'আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আনন্দপুরে আমাদের যাওয়া দরকার। গ্রামের লোকেরা দু'দুটো প্রাণীর ওপর সমানে অত্যাচার চালাচ্ছে। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।'

কথা শুনে ভদ্রলোকেরা বেশ রেগে গেলেন। রেগে মেগেই আরও অনেক কথা বললেন। গ্রামবাসীরা একদিন ওই জীবদুটোকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু আনন্দলোকে এসে তাদের আর দেখতে পায়নি।

'কে থাকে ওখানে?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'বাড়ীটা ডাক্তার অনিরুদ্ধ মিত্রের। ডাক্তারবাবু বিয়ে করেননি। একাই থাকেন সেখানে গত চারবছর ধরে', বলল একজন।

এরপরেই সন্তোষবাবু যা বললেন তা মূল্যবান। সন্তোষবাবুর বক্তব্যের সারমর্ম এই: একদিন সন্তোষবাবু আনন্দলোকের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন। তখন বেশ রাত। আকাশে তারা মিটমিট করছে। হঠাৎ তার মনে হল ডাক্তারবাবুর বিরাট নতুন হলঘরটার থেকে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবু আবার একটা কেন নতুন ঘর করলেন। তাই এই সুযোগে তিনি জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন।

'আমি হলপ করে বলতে পারি, প্রথমেই ঘরের একদিকে রাখা একটা বিরাট লোহার খাঁচা ছিল। খুব মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে তৈরি। ভেতরে কি আছে দেখতে পেলাম না। সন্দেহ হল এরকম খাঁচা দিয়ে কী করেন ডাক্তারবাবু। তাই ভালো করে দেখবার জন্যে খড়খড়িটা একটু ফাঁক করলাম। দেখলাম ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল। আর টেবিলের ওপরে— না না সে এক ভয়ানক দৃশ্য। বীভৎস!', নাটকীয়ভাবে চুপ করলেন সন্তোষবাবু।

'কী কী দেখলেন ঠিক করে বলুন?'

'কী করে বলবো আমি বুঝতে পারছি না। টেবিলের ওপর কী যেন একটা পড়েছিল। সাদা, অথচ মনে হচ্ছিল থলথলে। আর, আর সেটা অল্প অল্প করে নড়ছিল। খুব আস্তে আস্তে। ঠিক যেমন করে আমাদের বুক ওঠা-নামা করে।'

'ব্যাস, এই— আর কিছু নয়?'

'নানা, আরও আছে।' সন্তোষবাবু যেন উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠছেন, 'কোনও বিশেষ আকৃতি নেই সেটার। কিন্তু তা থেকে বেরিয়েছিল ঠিক যেন একজোড়া হাত। আঙুলও আছে তাতে। আর সেই বীভৎস হাত দুটো অল্প অল্প করে নড়ছিল।'

উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাসে গ্রামবাসীরা বিদায় নিল। পাশ ফিরতেই দেখলাম তরুণ যেন কিছু বলতে চায়। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছে সে।

'শান্ত হও। শান্ত হও। উত্তেজনার কি আছে এতে?', বললাম আমি। মনে হল আমার কথায় সে আশ্বস্ত হল না।

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুব সাধারণ। কেউ বোধ হয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে তামাসা করেছে। অথবা কোন অচেনা জন্তুকে দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেছে।'

'কিন্তু সবাই এক বাক্যে বলে সে হাত-পাগুলো ঠিক মানুষের মতো।', তরুণ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি সবাই বলল। কিন্তু...?'

তরুণ নানা কারণ দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমি একটা বিরাট ভুল করছি। শেষকালে বলল, 'আমি কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই আনন্দপুর সম্বন্ধে কানাঘুষো শুনেছি।'

'বেশ তো, কি শুনেছ বলই না।'

'না, অবশ্য খুব নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু যা রটে তার মধ্যে কিছু সত্যি আছে নিশ্চয়ই।', বলল তরুণ।

'বেশ ভালো কথা, তোমার কি মনে হয় বলো।' আমি তাকে বলার জন্য উৎসাহ দিলাম।

বেশ অনেকক্ষণ ভেবে সে ধীর গলায় বলল, 'আমার মনে হয় আমরা একটা বিরাট রহস্যের জালে পড়েছি। বৈজ্ঞানিক রিসার্চের আড়ালে ডাক্তার এমন একটা কিছু করেছে যাতে গ্রামের সমস্ত লোক ভয় পেয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি আমি?'

'না, কিছুই তো বুঝলাম না?'

'আমরা মানে আমাদের 'আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো'র মতো এক ডাক্তারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তরুণ।

'না, না, তুমি বড় বেশি চিন্তা করো। ওসব কোনও কিছু নয়।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হেসে উঠল তরুণ। বলল, 'আমি বলতে চাইছি যে আমরা এমন এক ডাক্তারের দেখা পাব যে প্রকৃতিকে মানে না, খোদার উপর খোদকারি করে। জীবজন্তুর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে নিজের খুশি মতো যা খুসি বানায়। জীবজন্তুদের অসীম কষ্ট দিয়ে ভগবান সাজতে চায় সে।'

এতক্ষণে তরুণের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তরুণ যে প্রাণ দিয়েও জীবজন্তুদের কষ্ট লাঘব করতে চায়। সুতরাং তরুণের এদিক দিয়ে চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। হেসে বললাম আমি, 'তুমি কি মনে করে আমরা আনন্দপুর গেলে প্রথমেই অভ্যর্থনা জানাবে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে এক ঘোড়া-মানুষ। অথবা এক কুকুর-মানুষ দরজা খুলে আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করবে?' আরও বললাম, 'নিতান্ত মন্দ কল্পনা করেনি তরুণ। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন আমাদের জগৎ নিতান্তই বাস্তব। অবশ্য অভিযোগ যখন এসেছে তখন তদন্ত আমরা করবোই। কিন্তু আমার বিশ্বাস শেষকালে তুমি নিরাশ হবেই হবে। আরে, সবসময় কল্পনা করলেই কি সব হয়? বাস্তবের কথা চিন্তা করো।'

কিন্তু তরুণকে বোঝানো গেল না। সে গোঁজ হয়ে বসে রইল। কল্পনাই যে তার জীবন। জীবজন্তুর কল্যাণ সাধনই তার জীবনের যেন সব। বেশ বুঝতে পারলাম মনে মনে সে গভীর চিন্তা করে চলেছে।

'কিন্তু হাত— হাত কেন? আঙুল কেন? জন্তুর হাত কি মানুষের মত হত?', উত্তেজনা তার চোখে-মুখে প্রকাশ পেতে থাকে।

'যাক, যখন যাব তখন দেখা যাবে। এখন ওসব ভাবনা ছাড় তো!', বললাম আমি।

যাই হোক, আমার মনেও কিন্তু অস্বস্তির রেশ জেগে রইল।

পরের দিন। ভোর বেলা। আমি আর তরুণ আনন্দপুরে গেলাম। একটিমাত্র বড় বাড়ী আছে। আনন্দলোক।

আনন্দলোকের সামনে দাঁড়াতেই বেঁটে খাটো একটা লোক বেরিয়ে এল। আমার পরিচয়পত্র দিলাম হাতে। সে আমাদের এক লম্বা-চওড়া বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। তরুণ তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো! চোখে-মুখে তার সন্দেহের আভাস। বেশ ছিমছাম ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা বড় টেবিল ও তার চারপাশে কিছু চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। তরুণকে বললাম সে যেন সব সময় সজাগ থাকে। সবকিছু যেন ভালো করে দেখে। কেননা আমি হয়তো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে

বলতে সব দেখতে পাব না। অবশ্য তাকে সতর্ক করে দিলাম যেন কোনও বিষয়েই সে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে। ডাক্তার যেন কোনও সন্দেহ না করে তার ব্যবহারে।

সেই লোকটি ঘরে ঢুকলো, 'আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। ডাক্তারবাবু নতুন ঘরে রয়েছেন— সেখানেই আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

নতুন ঘর। সেখানেই সন্তোষবাবু যেন কী সব দেখেছিলেন?

নতুন ঘরটা বিরাট বড়। কিন্তু একতলা হলেও এই ঘরটা এত উঁচু যে দোতলাকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। শেষের দিকে একটা দরজা খোলা রয়েছে। আমরা সেই দরজা দিয়েই ঢুকলাম ঠিক আমাদের সামনেই ডাক্তার অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেশ লম্বা ঢিলে-ঢালা পোষাক পরা। মুখে বেশ বড় দাড়ি। সৌম্য শান্ত চেহারা। আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

তাই তো। একি! এইজন্যেই কি আমরা দেখা করার অনুমতি পেলাম। 'তোমার কথা মনেই হয়নি যে তোমার নামও অনিরুদ্ধ। আর কী করেই বা মনে পড়বে বলো?' রীতিমত অবাক হয়ে বললাম আমি।

'এতে অবাক হবার কি আছে? আমি কিন্তু জানতাম তুমি বদলি হয়ে এই থানায় এসেছো।'

তরুণকে ডেকে বললাম, 'তরুণ, এসো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি ডক্টর অনিরুদ্ধ মিত্র। জান তরুণ, ছোটবেলায় এই অনিরুদ্ধই আমাকে প্রাণীবিজ্ঞান শেখাবার অনেক চেষ্টা করত।'

তরুণ কিন্তু বেশ সন্দেহের চোখে অনিরুদ্ধের আপাদ-মস্তক দেখে নিলে। ও ভাবছিল শত্রুতা করতে এসে এতখানি মাখামাখি করার কী দরকার? হাবভাব দেখে মনে হল বন্ধুবর আমার ওপর ও বিরূপ হয়ে উঠেছে।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এসো।' অনিরুদ্ধ সাদর আমন্ত্রণ জানাল।

পিছু পিছু ঘরের মাঝখানে এলাম। চেয়ার টেবিল দিয়ে সুন্দর করে সাজান। একটা মূল্যবান কোচের উপর আমি ও তরুণ বসলাম।

'কাজের কথায় আসা যাক্। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমাদের আগমনের হেতু,', বললাম আমি, 'সুতরাং কাজের কথাবার্তা সেরে নিয়ে বরং গল্পগুজব করা ভালো। কি বল? তরুণ তোমার মত কী?'

অনিরুদ্ধ একবার তির্যক দৃষ্টিতে তরুণের দিকে তাকালো। তরুণের অবস্থা
দেখে তার মনে বোধহয় সন্দেহ জেগেছে।

আমরা যা শুনেছি সবই বললাম। শিয়ালমুখো মানুষের কথা শুনে মনে হল অনিরুদ্ধ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানোয়ারগুলোর কোনও ক্ষতি হয়েছে নাকি?'

আমাকেই প্রশ্ন করল অনিরুদ্ধ।

'এতক্ষণে বোঝা গেল। আপনারই এই কাজ। কতকগুলো নিরীহ জীবকে আপনিই এইরকম করে কষ্ট দিয়েছেন?', উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল তরুণ।

অনিরুদ্ধ শুধু অবাক বিস্ময়ে একবার তাকাল তরুণের দিকে। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'কী কাজ করেছি আমি? কিন্তু আমি যতদূর জানি তারা তো অসুখী নয়! তাদের দুঃখের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

তরুণ কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এটাই চাইছিলাম। উনি স্বীকার করেছেন যে...'

'তরুণ তুমি চুপ করবে কি? বেশি উত্তেজিত হয়ো না। আমাকে বুঝতে দাও।' প্রায় ধমক দিয়েই চুপ করালাম ওকে।

কিন্তু তরুণ যেন কিছুই শুনলো না। নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে সে অস্থির হয়ে পড়েছে।

'আপনি হাতগুলো পেলেন কোথা থেকে?' বেশ জোরের সঙ্গে প্রশ্ন করল তরুণ।

'তোমার বন্ধুটি দেখছি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কি ব্যাপার বলতো?' অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল আমাকে।

'তরুণ, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? আমাকে কিছু বুঝতে দেবে, না, তুমিই সবকিছু করবে? তোমার যা প্রশ্ন করার তা শেষ কালে করো, এখন চুপ কর দেখি।' জোর করে থামাবার চেষ্টা করলাম ওকে।

তরুণের হয়ে অনিরুদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, 'ওর ব্যবহারের জন্য সত্যিই দুঃখিত আমি। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ আমাদের অবস্থা। নালিশ এলে তদন্ত করাই আমাদের কাজ। সমস্ত গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি তুমি আমাদের কাছে সব খুলে বলবে। আর তরুণ'— আমি তরুণের দিকে ঘুরে বললাম, 'তুমি তোমার প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। কিন্তু মনে রেখো ইনি আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ, ডক্টর মোরো নয়।'

কিন্তু তরুণ যেন কোনওকিছুই মানবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বলতে চাইছি। অনিরুদ্ধবাবু

প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করছেন কেন? আমি জানতে চাই কোন অধিকারে সাধারণ জীব জন্তুদের উনি কিম্ভুত আকৃতি দিচ্ছেন?'

ডাক্তার অনিরুদ্ধ ভরাট গলায় আস্তে আস্তে বললেন, 'আগে আমার সব বক্তব্য না শুনলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না তরুণবাবু। কি করে আপনি ধরে নিলেন যে আমি প্রকৃতির ওপরে চালাকি করছি? নতুন করে কোনও জীব বা জীবনের সৃষ্টি করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?'

'কিন্তু আপনার অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে সবাই ভয় পেয়ে গেছে আর তাই নয়...'

তরুণের কথায় কর্ণপাত না করেই অনিরুদ্ধ বলে যেতে লাগল, 'আপনারা আমাকে আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন। আপনারা বলতে চাইছেন যে আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার আড়ালে জীবজগতের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাইছি। আপনি শুধু সাধারণ গবেষণাই করছেন না। ভয়ানক রকমের ব্যবচ্ছেদ করে কয়েকটি নিরীহ জীবকে কি স্তূতাকার দিয়েছেন। আর তারা গ্রামের লোকেদের হাতে কষ্ট পাচ্ছে।'— এতক্ষণে মনে হল তরুণ যেন সব কথা বলতে পারল, 'অবশ্য আপনার গবেষণা করার অধিকার আছে। কিন্তু এখানে এমন কতকগুলো অপ্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটছে যার ফলে আমাদের আর চুপচাপ বসে থাকা যায় না।'

অনিরুদ্ধ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক ঠিক। আগে আমার তাই মনে হয়েছিল। আমি ঠিক করেছি আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি গবেষণার ফল সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবে! কিন্তু আমি অন্তত দুই কি তিন মাস শান্তিতে থাকতে চাই। ইতিমধ্যে আমার গবেষণার পুরো ফল পাব। নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারছেন না? সব খুলে বলছি— আশা করি এতে আপনাদের বোঝার সুবিধে হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে তরুণের দিকে চেয়ে রইল। তরুণের মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। তার পর অনিরুদ্ধ নিজেই বলতে আরম্ভ করল —

'আসল কথা হল, আপনারা যা সন্দেহ করছেন আমি তা করিনি বা একের সঙ্গে অন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়াও দিইনি। আমিই তাদের সৃষ্টিকর্তা।'

কয়েক মুহূর্তবোধ হয় হবে আমি কিছুই যেন বুঝতে পারলাম। কিন্তু তরুণ আবার মুখ খুলল—

'হ্যাঁ সবাই এরকম বলে। কিন্তু কোনও কিছু তৈরি করার তো একটা

পটভূমিকা দরকার। আপনি নিশ্চয়ই কোনও জীবন্ত প্রাণী দিয়ে আরম্ভ করেছেন আর তারই ওপর ব্যবচ্ছেদ করে এক বীভৎস ভয়ানক জীবে পরিণত করেছেন।'

'না, না' অনিরুদ্ধ বলল— 'আমি তা বলিনি, বলব না। আমি বলছি, আমিই ওদের তৈরি করেছি। একদম গোড়া থেকেই তারা আমারই সৃষ্টি। এক টানি প্রাণ বস্তুকে আমি প্রাণ দিয়েছি। আর এই প্রাণ বা জীবন আমারই সৃষ্টি। ধার করা জীবন নয়।'

বলে কি অনিরুদ্ধ? মানুষ কি প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে? বললাম, 'মানে, তুমি কি সত্যি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছ বলে দাবী কর নাকি?'

'আরে সেটা তো তুমিও পার আমিও পারি, সবাই পারে। জৈবিক নিয়মে তা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে আমি এক জীবনী শক্তিকে আবিষ্কার করেছি। এই 'জীবনী শক্তি' ইনজেকসান করেই আমি ওদের জীবন্ত করে তুলেছি।'

অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়ে রইলাম। এ বলে কী? এ কী পাগলের প্রলাপ উক্তি!

বহুক্ষণ পরে তরুণ কথা বলল বেশ জোরেই, 'আমি এসব বিশ্বাস করি না। আপনি একজন সামান্য ডাক্তার হয়ে জীবনী শক্তিকে আবিষ্কার করে ফেললেন? ভয়ের চোটে আবোল তাবোল বকছেন দেখছি।'

অনিরুদ্ধ কিন্তু মৃদু হেসেই বলল—

'আবার বলছি, আমি এক জীবনীশক্তিকে আবিষ্কার করেছি। বুঝতে পারছি আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কেন? কেউ না কেউ একদিন জীবনীশক্তিকে আবিষ্কার করবেই। আর সেটাই যদি আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় তো অবাক হবার কি আছে?'

তরুণ কিন্তু নিজের গোঁ নিয়ে রইল।

বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না, করি না, করি না। কোনও প্রমাণ দিতে পারেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই,' অনিরুদ্ধ বলল, 'আর প্রমাণ না দিলে কেই বা বিশ্বাস করবে! প্রথম অবস্থায় হয়তো আপনাদের ঘেন্নাই করবে। কিন্তু তা ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই। অবশ্য তোমার বন্ধু হাত সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তিত। ওঁর বিশ্বাস হাতটা সত্যিই মানুষের, অবশ্য যদি কোনও সহৃদয় ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে হাত দুটো উইল করে দিয়ে যায় তবে সে হাত নিয়ে কাজ করতে

মোটেই দ্বিধা করব না আমি। তাতে আমার কাজের অনেক সুবিধে হবে। কিন্তু চাইলেই তো সব পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়নবিদ্যা আর বুদ্ধির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অবশ্য কাছ থেকে দেখলে মানুষের হাতের সঙ্গে অনেক তফাৎ ধরা পড়বে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যে দিন নিখুঁত মানুষের মতো হাত তৈরি করতে পারব।

‘তরুণবাবু, আমার তৈরি জীব দুটি সম্বন্ধে আপনার ধারণা সত্যি অমূলক! ওদের তৈরি করতে আমার প্রচুর সময় আর অর্থ ব্যয় হয়েছে। সুতরাং তাদের হাবভাব, স্বভাব না জেনে অবলা জীবের প্রতি কষ্ট দিচ্ছি বলে আপনার অভিযোগের কোনও মানে হয় কি?’

‘আমি এখনও আপনার কথা বিশ্বাস করছি না।’ তরুণ বলল।

বেশ বুঝতে পারলাম তরুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সত্যিই তার অভিযোগ ভিত্তিহীন নয় তো?

‘তাহলে প্রমাণ দিতে হবে, কেমন?’ অনিরুদ্ধ বলল, ‘বেশ, আসুন আমার সঙ্গে।

***

সন্তোষবাবু যা দেখেছিলেন তা খুবই সামান্য। অনেক কিছুই তিনি দেখতে পাননি। অনেক কিছুর মধ্যে সেই ঘরে ছিল একটা অদ্ভুত গন্ধ। বেশ অস্বস্তিকর সেই গন্ধ।

ডাঃ অনিরুদ্ধ অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, ‘গন্ধটা সম্বন্ধে তোমাদের আগেই বলা উচিত ছিল আমার।’

‘না, না, আমাদেরই সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল’— কাশতে কাশতে বললাম আমি।

ঘরটা সত্যি খুব বড়। প্রায় ১০০ ফুট লম্বা আর উচ্চতা বোধ হয় ৩০ ফুট। প্রচুর ছোট-বড় যন্ত্রপাতিতে প্রায় ভরতি। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিও প্রচুর। আমি অবাক-বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম। অবশ্য দুভাগে সাজান আছে যন্ত্রগুলো। একদিকে আছে রসায়নবিদ্যার যন্ত্রপাতি আর অপর দিকে টুল, বেঞ্চি, লেদ-মেশিন ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি একদম শেষে থরে থরে সাজান আছে। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য নানা আকারের মিটার শোভা পাচ্ছে। ঘরের একধারে একটা অপারেশন টেবিল ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। তরুণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। ঘরের আর একদিকে বড় বৈদ্যুতিক চুল্লীও রয়েছে।

‘সাইক্লোট্রন, ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্‌কোপই শুধু নেই দেখছি।’ রহস্য করেই বললাম আমি।

‘আরও কিছু বল না? আরে, তোমার বন্ধু কি দেখছে বলতো?’

তরুণ ততক্ষণে অপারেশন টেবিলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, টেবিলের ওপর নীচ কোনও জায়গায় বাকী রাখলে না সে। যদি কোনও রক্তের ছিটে ফোঁটা নজরে আসে। আমরা আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

‘তরুণবাবু, এদিকে দেখুন। আপনার কল্পনার উৎস বোধহয় এটাই—’ অনিরুদ্ধ বলল।

ড্রয়ার খুলে একটা হাত বের করে টেবিলের ওপর রাখল অনিরুদ্ধ।

‘দেখুন অরুণবাবু ভালো করে দেখুন।’

কিরকম একটা হলদেটে রং হাতটার। প্রায়ই মোমের মতন দেখতে। গোটা হাত নয়। ঠিক কাঁধ আর কনুয়ের মাঝখান থেকে কাটা, তবে দেখতে ঠিক মানুষের হাতের মতো। কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম— না, মানুষের হাতের মতো নয়। মসৃণ, কোনও চিহ্ন নেই লোম কূপের। আর হাতের আঙুলে কোনও নখের চিহ্ন নেই।

‘এখন একে ওরকম করে দেখার কিছু নেই’, আমাদের অবস্থা দেখে অনিরুদ্ধ বলে উঠল।

হাতের কাটা অংশ থেকে একটা লোহার নল বেরিয়ে আছে। সেটাকে দেখিয়ে
তরুণ জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা আবার কি?’

‘স্টেনলেস স্টিল’, অনিরুদ্ধ বলল, ‘সবচেয়ে সোজা আর অল্প খরচে এই দিয়েই কেমন হাড়ের কাজ হয়। অবশ্য পরে আমি এর বদলে প্লাস্টিকের হাত ব্যবহার করবে। আর প্লাস্টিক ওজনেও হালকা।’

তরুণের চোখে মুখে যেন হতাশার ছায়া ঘনিয়ে এল। এটা তো সত্যি কোনও জীবন্ত প্রাণীর অংশ নয়।

‘কিন্তু শুধু হাত কেন? আর সব কোথায়?’ নিজের জেদ বজায় রাখতেই যেন জিজ্ঞাসা করল সে।

‘কোনও জীবন্ত প্রাণীর কাছে হাতের মতো প্রয়োজনীয় আর কিছুই নেই। আর, ‘আর সব’-এর কথা যে বলছেন সেটার সম্বন্ধে বলছি মূল বস্তু যখন আবিষ্কার করতে পেরেছি তখন প্রমাণ করার জন্য আমি এক সম্পূর্ণ জীব তৈরি করেছি। শিয়াল-মানুষ অবশ্য এর প্রথম ধাপ। বেঁচে থাকার মতো

তাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। কিন্তু গঠনমূলক কোনও কিছুই ওরা চিন্তা করতে পারবে না। অবশ্য তার দরকারও নেই ওদের।'

'তোমার স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবটি তাহলে গঠনমূলক চিন্তা করতে পারে বলো?', আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের মাথায় যতটুকু মস্তিষ্ক আছে তারও ঠিক ততটুকু আছে। তবে আমাদের চেয়ে ওর মাথাটা একটু বড়। অবশ্য তার অভিজ্ঞতা দরকার— দরকার শিক্ষার। কিন্তু মোটা মগজ থাকার জন্য সবকিছুই শিশুদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সে শিখতে পারবে।'

'কোথায় সে?' উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলাম। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বলল, 'সবাই দেখছি একেবারে প্রথমেই তৈরি জিনিস দেখতে চায়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু তার আগে মনে হয় আরও কিছু প্রমাণ দেওয়া ভালো। কারণ তোমার বন্ধুর চোখে মুখে এখনও দেখছি অবিশ্বাসের ছাপ।'

এরপর অনিরুদ্ধ সার্জিকাল যন্ত্রপাতির আলমারিটা খুলে ফেলল। ভেতর থেকে আকার বিহীন সাদা এক তাল পাকানো বস্তুকে হাতে করে টেবিলের ওপর রাখলো। পাশের একটা সুইচ টিপে দিল। ওই বস্তুটিকে নিয়ে টেবিলের ওই অংশটি ঘুরতে আরম্ভ করল।

নিজের চোখে বোধ হয় ভুল দেখছি মনে হল। তাল পাকানো ৰস্তুটা থেকে ঠিক হাতের মতো কি একটা বেরিয়ে আসছে না?

'সর্বনাশ! এযে ঠিক হাতের মতো।' মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে এল কথা কটা।

'হ্যাঁ ঠিক হাতের মতো। আর এই জিনিসটাই আমার এত দিনের সাধনার ফল। এদিয়ে সব কিছুই হয়। একটা দেহ তৈরি করতে যা যা দরকার, সবই এ থেকে পাওয়া যায়। যেমন, খাদ্যনালী, রক্তবাহী শিরা, উপশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী, শ্বাসযন্ত্র ইত্যাদি। আসল কথা এই বস্তুটা জীবন্ত ভাবে বাঁচতে পারে।'

এরপর অনিরুদ্ধ পাশের সুইচ বোর্ড থেকে কয়েকটি তার এনে জিনিসটার সঙ্গে লাগিয়ে দিল।

'তরুণবাবু, ভালো করে দেখুন এর মধ্যে কোনও প্রাণের স্পর্শ নেই।'

তরুণ ভালো করে বস্তুটাকে পরীক্ষা করল। আঙুল দিয়েও স্পর্শ করল। না, ক্ষুন্ন মনেই ফিরে এল সে।

'তাহলে ইলেকট্রিক আসল জিনিস বলো', প্রশ্ন করলাম আমি।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অনিরুদ্ধ বোতল থেকে ফিকে নীল রংয়ের তরল

পদার্থ একটি বিকারে ঢেলে নিল।

'হতে পারে ইলেকট্রিক। আবার কেমিক্যালও হতে পারে। তুমি কি মনে করো আমার গোপন কথা সব তোমাকে বলব নাকি?' অনিরুদ্ধ হেসে বলল।

তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি দেখলেন? জীবজন্তু নয় নিশ্চয়ই?'

তরুণের বলার কিছুই নেই। চুপ করে রইল সে।

বেশকিছু ইলেকট্রোড লাগান হল ওটার গায়ে। তারপরে ভালো করে ওই বস্তুটার ওপর তিনটে জায়গা বেছে নিয়ে অনিরুদ্ধ সিরিঞ্জে করে ফিকে নীল আর এক ইনজেকসান করল। তারপর জিনিসটার সারা গায়ে দুবার বেশ ভালো করে ছড়িয়েদিল ওই আরকটা। শেষকালে চার-পাঁচটা সুইচ একসঙ্গে টিপে দিল।

মৃদু হেসে এবার অনিরুদ্ধ বলল, 'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

কিন্তু তিন মিনিটও গেল না। ওই বস্তুটা মৃদু কাঁপতে আরম্ভ করল। আস্তে আস্তে কাঁপুনি বাড়তে লাগল। বেশ একটা ছন্দ আছে এই কাঁপুনির। তারপর টেবিলের ওপর গড়াতে আরম্ভ করল। হাতদুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। স্পষ্ট দেখলাম হাতের আঙুলগুলো বেশ টানটান হয়েছে। তারপর টেবিলের ওপরটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল সেই আঙুলগুলো। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার।

গলার ভেতরটা মনে হল শুকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। নিজের চোখে কি ভুল দেখছি? একি সম্ভব? স্বপ্ন! দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এল। হঠাৎ মনে হল বিরাট এক সম্ভাবনার কথা। আনন্দে লাফিয়ে উঠে অনিরুদ্ধের হাত চেপে ধরলাম। 'তাহলে, মৃত দেহে ইনজেকসান করলে তো...!'

কিন্তু, না। অনিরুদ্ধ মাথা নাড়ল। 'না, কোনও কাজই হয় না সেখানে। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। এটাকে আমি 'জীবনী শক্তি' বলেছি বটে, তবে প্রকৃতিদত্ত জীবনী শক্তি থেকে এর অনেক পার্থক্য। কিন্তু এর কোনও মানেই আমি বুঝতে
পারি না।'

তফাৎ যাই থাক না কেন এর মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনা আছে। মানুষের

সমস্ত চিন্তাধারা পাল্টে যাবে। বিরাট এক বিপ্লবের সূত্রপাত যেন দেখতে পেলাম। অকল্পনীয় সেই সম্ভাবনা।

কিন্তু তরুণ যেন ম্যাজিক দেখছে। সারাক্ষণই অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে আছে ওদিকে। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে তরুণ আঙুল দিয়ে বস্তুটা ছুঁলো! তারপরেই 'বাপ রে' বলে ছিটকে এল— যেন হাজার ভোল্টের শক লাগল তার হাতে।

***

এতক্ষণে বোধ হয় তরুণের ভুল ভেঙে গেছে। বললে, 'এবার আপনার সম্পূর্ণ জীবটিকে দেখান তো ডাক্তারবাবু।'

এখনও সন্দেহ? আসল জিনিসটা না দেখে যেন স্বস্তি নেই তরুণের।

'ভালো কথা' অনিরুদ্ধ বলল— 'আগেই বলে রাখি ওকে আমি শ্রীমতী বলে ডাকি। কোনও বিশেষ নামই মনে হয় ওকে মানায় না। কিন্তু নাম যাই হোক সে আমারই তৈরি মানুষ!— জীবন্ত মানুষ।'

অনিরুদ্ধর পেছন পেছন গেলাম আমরা। পাশের ঘরে বিরাট এক খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মোটা লোহার রড দিয়ে তৈরি। অনিরুদ্ধ খাঁচার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

খাঁচার ভেতর কি বস্তু যে আছে তা অনুমান করতে পারিনি। তরুণের অবস্থাও তথৈবচ। গভীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাদের বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনও বর্ণনাই বোধ হয় ওর উপযুক্ত নয়। কি বলবো অনিরুদ্ধের 'পরিপূর্ণ' জীবটিকে দেখে? ভয়ানক, বীভৎস, অকল্পনীয়, অস্বাভাবিক... তবে যতদূর পারি তার রূপ বর্ণনা করছি। জানি না কতদূর প্রকাশ করতে পারবো তার প্রকৃত রূপ।

কালো, ত্রিকোণাকৃতি চকচকে পদার্থ দিয়ে তৈরি দেহ। ওপরের দিকে গম্বুজাকৃতি মাথা। মাটি থেকে প্রায় ছয় ফুট উঁচু। পেটের কাছটা বোধহয় চার ফুট থেকে ছয় ফুট মোটা। আর এই সমস্ত দেহটা দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ছোট ছোট গোলাকৃতি পাথরের ওপর। চারটে হাত বেরিয়ে আছে দেহ থেকে। ঠিক মানুষের হাতের মতো। মাথা থেকে ছয় ইঞ্চি নীচে চোখ দুটো। চোখের পাতাটা শক্ত কিছু দিয়ে তৈরি। বড় বড় গোল গোল চোখ। ড্যাবড্যাব করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নেও বোধ হয় কেউ এমন বীভৎসতা দেখেনি। কল্পনা করতেও আমার এখন ভয় হয়।

অনিরুদ্ধ কিন্তু গর্বের সঙ্গে 'শ্রীমতী'র দিকে চেয়ে রইল!

'শ্রীমতী, এরা তোমাকে দেখতে এসেছেন।' সস্নেহে বললে অনিরুদ্ধ।

বেশ দেখতে পেলাম শ্রীমতী আমার দিকে তাকাল। তারপর এক দৃষ্টে তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা বন্ধ করার সময়ে 'ক্লিক' করে একটা ধাতব আওয়াজ হল। শ্রীমতীর গলা দিয়ে গুরুগম্ভীর স্বর বেরিয়ে এল।

'এতদিন পরে! কত দিন ধরে আপনাকে বলছি!'

'আরে মোলো যা,' তরুণ বলল, 'এ যে দেখছি কথা বলতে পারে।'

ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো তরুণকেই দেখছে। ধাতব গলায় বলল, 'একজন হলেই আমার হবে। ওর কাচের মতো চোখগুলো আমার খুব ভালো লাগছে।'

'শান্ত হও শ্রীমতী, তুমি যা ভাবছ এরা তা নয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের কথা আর বলো না,' অনিরুদ্ধ তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্রীমতীর কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, কিন্তু ও পুরুষ মহিলার পার্থক্য বোঝে। আর নিজের সম্বন্ধেও অহংকার আছে। অল্পতেই রেগে ওঠা ওর স্বভাব। সুতরাং এমন কিছু করবেন না যাতে ও রেগে ওঠে। ওর চেহারা দেখে অবাক হচ্ছেন তো? খুলে বলছি শুনুন।'

এবার ডাক্তার বক্তৃতার সুরে বলতে আরম্ভ করল, 'আবিষ্কারের পরে আমার কর্তব্য হল একটি দু'পেয়ে জীব সৃষ্টি করা। পরে অনুকরণ করাই শ্রেয় মনে করলাম। আমার মনে হল মানুষের মধ্যে অনেক অঙ্গ বেশ দুর্বল। আর কয়েকটা অঙ্গ বেশি হলে খুব ভালো হয়। অবশ্য যান্ত্রিক কারণে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে।'

তরুণ ভালোভাবে জীবটিকে দেখছে। শ্রীমতীও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।অবশেষে তরুণ মুখ খুলল—

'এত বড় একটা জীবকে এত ছোট খাঁচায় রাখা মোটেই উচিত হয়নি আপনার।'

ক্লিক!

'আমার বেশ পছন্দ হয় ওকে। খুব ভালো কথা বলে ও। এতেই আমার হবে।' শ্রীমতী বলে উঠল।

তরুণ একটু বিচলিত হল। বহুকাল থেকেই সে জীবজন্তুদের ভালোবেসে এসেছে। কথা বলে এই প্রথম এই জীবটাই ওকে সমর্থন করল।

অনিরুদ্ধ কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই বলতে আরম্ভ করল, 'প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমতীর আলাদা মাথা বলে কিছুই নেই। সাধারণ মাথাটি সবটাই প্রায় বাইরে বেরিয়ে আছে আর দেখতেও বিদকুটে। চোখ দুটো

বাইরের দিকে অনেকটা বার করা আছে। দেখার অনেক সুবিধা হয় এতে।'

'মাথা যেহেতু ঘোরাতে পারে না সেই জন্য আরও কিছু যোগ করতে হয়েছে। আমি শ্রীমতীকে এর জন্য তিনটি চোখ দিয়েছি। দুটোতো আপনারা সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। আর একটি চোখ আছে ঠিক পেছনে। সুতরাং শ্রীমতীর পেছন দিক বলে কিছু নেই। এর ফলে শ্রীমতী যে কোনও দিকে যখন খুশী তাকাতে পারে। মাথা ঘোরানোর কোনও দরকার হয় না। ওর মাথাটি শকপ্রুফ। তাই মাথার প্রধান কয়েকটি অংশ শ্রীমতীর পেটের ভেতরে রাখতে হয়েছে। পাকস্থলী আছে অনেক ওপরে।'

'সবই তো বুঝলাম, শ্রীমতী খায় কিরকম করে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'শ্রীমতীর খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা আছে পিছন দিকে। চারটে হাতের প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় মানুষের হাতই প্রধান যন্ত্র। যদি অবশ্য সেটা সত্যি হাতের মতো হয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমতীর ওপরের দুটি হাত বেশ সরু আর অনেক যত্ন নিয়ে তৈরি করতে হয়েছে। কিন্তু নিচের দুটি হাত বেশ মোটা আর ভারী কর্মক্ষম।

'শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এবার কিছু জানতে চাইবেন। এখানে আমি প্রবাহমানতা (flow) সূত্রের আশ্রয় নিয়েছি। শ্রীমতী নিঃশ্বাস নেয় এখান দিয়ে আর শ্বাস ত্যাগ করে ওইখান দিয়ে। অবশ্য পরের বারে এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে।

'এমনিতে মনে হতে পারে শ্রীমতীর দেহটা ভীষণ মোটা আর ভারী, ওজন প্রায় এক টন। আর এত ভারীকে ধরে রাখার জন্য আমার পূর্বের পরিকল্পনা একটু পাল্টাতে হয়েছে। সেইজন্য পা আর পায়ের পাতা হাতীর পায়ের অনুকরণে করতে হয়েছে। কিন্তু পরেরবারে এই ব্যবস্থারও সংশোধন করতে হবে।'

'তিনটি পায়ের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। মানুষের দুপায়ের উপরে ভর রাখার জন্য অনেক মাংস পেশির প্রয়োজন আছে। এখানে অত মাংসপেশি যোগ করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রীমতীকে তিনটি পায়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। অসমতল জমিতে দুপায়ের চেয়ে তিন পায়ের সুবিধে অনেক বেশি।

'প্রজনন ব্যাপারে আমি বলতে পারি...'

'আমি বুঝতে পারছি না প্লাষ্টিক আর স্টেনলেস স্টীলের মধ্যে কি করে প্রজনন সম্ভব হবে'— আমি না বলে থাকতে পারলাম না।

'কেন সম্ভব নয়? প্রজননের প্রয়োজনীয় সমস্ত গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি ওর মধ্যে

আছে। পরের বারে এসমস্তেরই আরও উন্নতি করতে হবে। এর জন্য আমাকে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। যাই হোক শ্রীমতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার জন্য একজন শ্রীমান তৈরি করে দেবো।' মুচকি হাসল অনিরুদ্ধ।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হবে' ধাতব কণ্ঠ আবার বাধা দিল অনিরুদ্ধকে। শ্রীমতী আবার এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তরুণের দিকে।

অনিরুদ্ধ কিন্তু বলে চলল— 'অবশ্য শ্রীমতী নিজের চেহারা কেমন তা জানে না। সে হয়ত মনে করে...'

'আমার প্রয়োজন আমি যথেষ্ট বুঝি', গম্ভীর গলায় শ্রীমতী বলল, 'আমি...'

ডাক্তার বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হবে হবে, আমি যখন বলছি সব হবে।'

'নানা আমার ওকে চাই' শ্রীমতী ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে।

'শান্ত হও শ্রীমতী, নইলে—' ধমকে উঠল অনিরুদ্ধ।

বিদকুটে অঙ্গভঙ্গি করে উঠল শ্রীমতী।

তরুণ এবার বেশ জোরে বলে উঠল, 'এ কিছুতেই মানতে পারি না। স্বীকার করি শ্রীমতী আপনার সৃষ্টি। কিন্তু এভাবে ওকে রাখা মোটেই উচিত নয়। আপনি শ্রীমতীকে মানুষ করতে গিয়ে এক বিকট দৈত্যে পরিণত করছেন।'

'যাই হোক, শ্রীমতীকে এখন দুঃপ্রাপ্য জীব বলা যায়। আর সেই জন্য তাকে এত ছোট খাঁচায় কষ্ট দিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। আর ওর কথা থেকেই বোঝা যায় যে ওর চাহিদা আছে। কেন ওর চাহিদা মেটাচ্ছেন না, অনিরুদ্ধ বাবু?'

'তরুণ, ভুলে যেও না ও তোমাকে চায়।' আমি সাবধান করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী বলে উঠল—

'কি সুন্দর! কি সুন্দর ওর চোখ! ওকে আমার চাই-ই-চাই!' শ্রীমতী এবার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আর শ্রীমতীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে মনে হল তরুণ বিচলিত হল।

'এতেও যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় ও অসুখী তবে...' বলতে বলতে খাঁচার অনেক কাছে এগিয়ে গেল তরুণ।

'কি করছেন কি?' বলেই ডাক্তার ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণকে ধরে ফেলল। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে শ্রীমতী শিকের ফাঁক দিয়ে একটা

হাত বের করে তরুণকে ধরবার চেষ্টা করছে।

'কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন বলুন তো?'

মুখ দেখে মনে হল তরুণ বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

'মানে...' কি যেন তরুণ বলতে গেল। কিন্তু তার কথা ডুবে গেলে শ্রীমতীর গলার আওয়াজে। ভয় দেখানো কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, 'ওকে আমার কাছে আসতে দাও। ওকে আমি চাই।'

চারটে হাত দিয়ে শ্রীমতী সামনের লোহার রড জোর করে ধরে রয়েছে। দুটো শিক হাতের চাপে ভেঙে গেল। মোটা রডটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে শ্রীমতী। ড্যাবড্যাবে দুচোখ দিয়ে যেন লেহন করছে তরুণকে। রাগে গরগর করে উঠল শ্রীমতী।

'ওকি! ওকি...' আর কিছু শোনা গেল না।

'জিমি! জিমি!' বিকট আর্তনাদে ঘর ভরে উঠল। তিনটে পা মাটির উপরে সজোরে ঠুকছে। আর তার ফলে সমস্ত বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ডাক্তারের মুখ ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে।

'বুঝতে পারছি না। হরমোন ইনজেকসান কি খুব বেশি হয়ে গেছে?' অজান্তে প্রশ্ন করল নিজেকে।

তরুণ এতক্ষণে সচেতন হয়েছে। কয়েক পা পিছনে এল সে। কিন্তু তাতেও
শ্রীমতীর উত্তেজনা কমলো না।

বিকট আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠল শ্রীমতী, 'জিমিজিমিজিমি!' বুক ফাটা আর্তনাদ, সারা ঘর গম গম করতে লাগল।

সেই ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

'আমার মনে হয়, ওর সামনে থেকে আমাদের সরে যাওয়া দরকার।' বললাম আমি।

ডাক্তার আমার কথায় সম্মতি দিল। তরুণ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো সেই ভালো।'

আমরা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পেছনে শ্রীমতীর গলার আওয়াজ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।খাঁচাটা ঝনঝন করে উঠল। পা ঠোকার দুমদুম আওয়াজ শোনা গেল।

'তরুণ তরুণ, যেও না তরুণ। তোমাকে আমার চাই।' কাতর স্বরে আকাশ বাতাস চিরে গেল।

তরুণ পেছনে চেয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। শ্রীমতী সজোরে বারংবার ধাক্কা মারতে লাগল খাঁচার গায়ে। অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক মনে হল না। ডাক্তার দরজা বন্ধ করে দিল।

দড়াম! বিকট আওয়াজ হল ঘরের মধ্যে। দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে গেল। খাঁচার শিকগুলো চারপাশে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। আর শ্রীমতী বিকট চেহারা নিয়ে দরজার দিকে ছুটে আসছে।

'সর্বনাশ হয়ে গেল' বলল অনিরুদ্ধ।

তরুণের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। অল্প অল্প ঘাম চিক চিক করছে কপালে।

'আমরা চলে গেলেই সব ঠিকহয়ে যাবে...' তরুণ বলল।

'না তা হয়না। বাইরের দিকে জানালা দিয়ে ও আপনাকে দেখতে পাবেই।'

'তাহলে'— তরুণের স্বরে এবার আতঙ্ক।

ডাক্তারের পিছুপিছু আমরা বসবার ঘরে চলে এলাম। ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশের কাছে ফোন করে তাড়াতাড়ি সাহায্য চাইল অনিরুদ্ধ। ফোন রেখে বলল, 'ওরা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারি না। ল্যাবরেটারী ঘরটা খুব শক্ত। মনে হয় ভাঙতে পারবে না। তবে ওর শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানি না।'

ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠছে আমাদের। ডাক্তার আরও বলল 'সৌভাগ্যের কথা শ্রীমতী এ বাড়ীর দরজা জানলা সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ল্যাবরেটারীর সবকিছু বোধ হয় গুঁড়িয়ে ফেলছে। শুনুন আওয়াজ শুনুন।' দূর থেকে মড়মড় আওয়াজ আসছে। কাচ ভাঙার শব্দও শোনা গেল। মাঝেমাঝে অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে আসছে। আর থেকে থেকে 'তরুণ, তরুণ' চীৎকার শোনা গেল।

অনিরুদ্ধের চোখে মুখে ক্রমশ হতাশার ভাব ফুটে উঠছে। অসহায় অবস্থায়
পায়চারী করতে আরম্ভ করল সে।

'সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল। কত দামী ফরমুলা। সারাজীবনের সাধনা নষ্ট হয়ে গেল। আর এর জন্য গ্রামবাসীদের হয়ত প্রচুর ক্ষতি হবে। কিন্তু আমার যা গেল তা আর ফিরে পাব না। তরুণবাবু তাকে উত্তেজিত না করলে সে কখনই উত্তেজিত হত না। আগে কোনওদিনও এরকম হয়নি।'

তরুণ বোধ হয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা কানফাটা আওয়াজ সবকিছু ডুবে গেল। কোনও কিছু ভাঙার শব্দ। আর তারপরেই শোনা গেল— 'জিমি। তরুণ, তরুণ আমার।'

তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠেই আবার বসে পড়ল। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'পেয়েছি পেয়েছি' অনিরুদ্ধ হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয় আমি শ্রীমতীর শরীরের ওজন অনুযায়ী হরমোন দিয়ে ফেলেছি। কি মারাত্মক ভুল! হাড়ের ওজন যে বাদ যাবে। ছিঃ ছিঃ। এ আমি কি করলাম, ইস!'

একটা বিকট আওয়াজে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

শ্রীমতী দরজা ভেঙে ফেলেছে। পাগলা হাতীর মতো ধেয়ে আসছে এদিকেই। যেখান দিয়ে শ্রীমতী আসছে সেখানকার সবকিছু ভেঙে পড়ছে দেহের ভারে। পা ফেলার বিকট আওয়াজ উঠছে প্রতি মুহূর্তেই।

অনিরুদ্ধ আর দেরী করল না। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি সামনেই সিঁড়ি আছে।'

সেই মুহূর্তেই শ্রীমতী আমাদের দেখতে পেল। বিকট চিৎকার করে উঠল সে। আমরা সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলাম। দ্রুত গতি একমাত্র আমাদের সম্বল। শ্রীমতী কিন্তু তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না দেখলাম। আমি আর ডাক্তার একসঙ্গেও পরে উঠে এলাম। আমার মনে হল তরুণ ঠিক আমার পেছনেই আছে। সঠিক কিছু বলতে পারবো না। হয়ত তরুণ সিঁড়ির ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অথবা ভয়ে কাঁপছিল। কিন্তু আমরা যখন দেখলাম তখন তরুণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। আর তার পেছনে ধেয়ে আসছে মূর্তিমান যমদূতের মতো শ্রীমতী।

তরুণ ওপরে উঠে আসছে। আর শ্রীমতীও ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু সিঁড়ির ধাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকায় শ্রীমতীর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কোনও বাধাই শ্রীমতীর কাছে বাধা নয়। পাঁচটা কি ছয়টা সিঁড়ি উঠেছে এমন সময় পায়ের চাপে মরমর করে সিঁড়ি ভেঙে পড়ল। শ্রীমতী ইঁট, বালি পাথরের সঙ্গে নীচে পড়ে গেল। আর তরুণও টাল সামলাতে না পেরে চীৎকার করে প্রায় শ্রীমতীর গায়ের ওপরই আছড়ে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী চার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তরুণকে।

'কি অপূর্ব বিচার-বুদ্ধি!' বিড়বিড় করে বলল অনিরুদ্ধ।

'বাঁচাও, বাঁচাও,'— তরুণের গলা দিয়ে শুধু এই শব্দই শোনা গেল।

'আঃ' শ্রীমতী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হারান প্রিয়কে যেন ফিরে পেয়েছে শ্রীমতী।

তরুণকে জড়িয়ে ধরে শ্রীমতী কয়েক পা এগিয়ে গেল।

'অধীর হয়ো না।' ডাক্তার বলল তরুণকে, 'এমন কিছু করো না যাতে শ্রীমতী ক্ষেপে ওঠে।'

তরুণকে তিন হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শ্রীমতী আর এক হাত দিয়ে আদর করছে।

আমরা দু'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি বললাম, 'একটা কিছু আমাদের করতে হয়। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই হবে না।'

'কোনও স্ত্রীলোককে এই সময়ে বাধা দেওয়া কি উচিত হবে? হয়ত আরও ক্ষতি হবে তাতে।' ডাক্তারের গলায় চিন্তার আভাস।

'বাঁচাও বাঁচাও। পারছি না।'

'শান্ত হও তরুণ। মনে হয় তোমার কোনও ক্ষতিও করবে না। মোটের ওপর শ্রীমতী স্ত্রীলোক। অতএব...'

বহুদিন আগে মাকড়সার শিকার করা দেখেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তরুণ সত্যি স্ত্রী-মাকড়সার হাতে পড়েছে।

'আচ্ছা, কোনও লোভনীয় খাবারের লোভ দেখালে হয় না?' আমি বললাম।

তিনটি হাতেই শ্রীমতী তরুণকে দোলাতে আরম্ভ করেছে। ছটফট করছে তরুণ।

'তরুণ, ছটফট করো না,' বললে ডাক্তার। তারপর, 'ভালো। ভালো বলেছ। কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ পেলে...'

বাইরে কয়েকটা গাড়ী থামার আওয়াজ শোনা গেল। ডাক্তার ছুটে জানলায় চলে গেল। আমি শুনতে পেলাম সে বাইরের লোকদের ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলছে। তারপরেই অনিরুদ্ধকে আসতে দেখলাম। দমকলের একজন অফিসারও একজন কর্মী তার পেছনে পেছনে এল। নীচের দিকে তাকিয়েই তাদের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।

'ওর অজান্তে ওকে ঘিরে ফেলতে হবে।'

'কাকে ঘিরে ফেলতে হবে? ও কি মানুষ না দৈত্য?', কেঁপে উঠল অফিসারের গলা।

'ও কথা পরে ভাবলেও চলবে।' অধীরভাবে ডাক্তার বলল, 'যদি

কতকগুলো শক্ত দড়ি পেতাম...'

'বাঁচাও।'

তরুণের গলা আবার শোনা গেল। শ্রীমতী জোরে চেপে ধরল তরুণকে। শ্রীমতীর মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ উঠছে। সেই বীভৎস আওয়াজে অন্তরাত্মা
পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

'উঃ কি ভয়ানক দৃশ্য।' অফিসারটি বলল।

'তাড়াতাড়ি করুন। একটা দড়ির ফাঁস এখান দিয়ে ফেলে দিলেই হবে।' আদেশ দিলে ডাক্তার।

দমকল কর্মীটি তাড়াতাড়ি একটা দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এল। অফিসার নানাভাবে বোঝাতে লাগল কেমন করে ফাঁসে ধরতে হবে শ্রীমতীকে। আস্তে আস্তে ফাঁসটি নামিয়ে দিল। দুটো হাতের নীচে দিয়ে শরীরের ওপর চেপে বসল দড়ির ফাঁস।

শ্রীমতীর এতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও সে আদর করে চলেছে তরুণকে। এমন সময়ে নীচের সামনের দরজা দিয়ে কয়েকটা মুখ উঁকি মারল। কয়েকজন দমকলকর্মী ও পুলিশের লোকজন উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সেই বীভৎস দৃশ্য। ওপর থেকে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা দড়ির ফাঁস নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ আর একটা দড়ির ফাঁস নামাতে গিয়ে ঝুলন্ত আলোটা ঝনঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন শ্রীমতীর সম্বিৎ ফিরল। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠল।

'না। এ আমার। একে আমি ছাড়বো না।' বীভৎস গলায় চীৎকার করে উঠল শ্রীমতী।

ওপর থেকে দমকলের লোকজন ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

কোনওদিন দৃকপাত না করেই শ্রীমতী সোজা চলতে আরম্ভ করল। দড়ি ক্রমশঃ শক্ত হয়ে বসছে। আমাদের হাতে দড়ির প্রান্ত ভাগ ধরা রয়েছে। তাড়াতাড়ি দড়িগুলো একটা থামের গায়ে বেঁধেদিলাম। কিন্তু মড়মড় করে সেই থাম ভেঙে পড়ল। তরুণ চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সজোরে ধরে রেখেছে শ্রীমতী। চলন্ত বুলডোজারের মতো বাইরের দরজার দিকে চলল। দেহের চাপে দরজা ভেঙে পড়ল।

'আমার আমার। একে ছেড়ে দেবো না আমি।'

আমরা জানলার কাছে ছুটে গেলাম। শ্রীমতী ইতিমধ্যে সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠেছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম মত্ত জলহস্তীর মতো থপথপ করে চলেছে বাগানের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী। তরুণ তার বুকে ঝুলছে। আর পেছনে প্রায় ১২জন দমকলকর্মীও পুলিশ দড়ির প্রান্ত ভাগ ধরে তার গতিবেগ কমাতে পারছে না। ওদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে শ্রীমতী। বাগানের গেটটা মালী ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছিল। গেটের দিকে শ্রীমতী এগিয়ে আসতে দেখে মালী ভয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। গেট বন্ধ থাক বা থাক শ্রীমতীর কিছু এসে যায় না। তার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। অল্প বাধা পেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই গেটটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। রাস্তায় উঠে পড়ল শ্রীমতী। তরুণ ঠিক এক অবস্থায় ঝুলছে। ছটফট করছে সেই লৌহবাঁধনের মধ্যে।

বাইরে কোনও গাড়ীর ইঞ্জিন সচল হয়ে উঠল। ডাক্তার ওপর থেকে তাদের থামতে বলল। আমরা কোনও রকমে সেই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। দমকলের গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

সিকি মাইল যাওয়ার পর রাস্তাটা ক্রমশঃ সরু হওয়াতে গাড়ী আর যেতে পারল না। আমরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। প্রায় দৌড়েই চললাম পথ ধরে। শ্রীমতীর যাওয়ার চিহ্ন পথে রয়েছে। পায়ের ছাপগুলো প্রায় ৬ইঞ্চি বসে গেছে মাটিতে।

আমরা নদীর কাছে এসে পড়লাম। সামনেই পুরানো কাঠের ব্রীজ। তারই ওপর দেখলাম শ্রীমতীকে। সেই একই অবস্থায় তরুণ রয়েছে। হঠাৎ ব্রীজটা মড়মড় করে উঠল। শ্রীমতীর ভার সহ্য করতে পারল না ব্রীজ। শ্রীমতীর পায়ের নীচেটা ভেঙে গেল। শ্রীমতী নিজেকে সামলাতে গিয়ে তরুণকে ছেড়ে দিল। তরুণ আর শ্রীমতী একই সঙ্গে নদীতে পড়ে গেল। তরুণকে একজন পুলিশ সাঁতরে ডাঙায় তুলে নিয়ে এল। আর শ্রীমতী? খরস্রোতা নদীর জলের বিরাট আবর্তনে নীচে তলিয়ে গেল। ‘তরুণকে দেবো না, কিছুতেই দেবো না তরুণকে’ বলে শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠেছিল শ্রীমতী। কিন্তু এখন আর কোনও চিহ্নই নেই তার। জলের ঢেউ আস্তে আস্তে বড় হতে হতে পাড়ের কাছে এসে মিলিয়ে গেল।

সর্বহারার মতো নদীর পাড়ের ওপর ডাক্তার অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের সমস্ত সাধনার ফল তার চোখের সামনেই বিসর্জিত হয়ে গেল। পায়ের তলার শক্ত মাটি সরে গেছে ডাক্তারের। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে

বসে পড়ল সে। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আর আমার? কেন জানি না শ্রীমতীর জন্যে মনটা হুহু করে উঠল।তার সমস্ত বীভৎসতা, অপরাধ আর কিছুই মনে পড়লনা। শুধু মনে ভেসে উঠল কি অসীম আকুতি তরুণকে পাওয়ার জন্যে। নাই বা হল প্রাকৃতিক সৃষ্টি। নাই বা হল আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ। তবুও কি তার হৃদয়ের আর্তিকে ভোলা যায়? মৃত্যু মুহূর্তেও সে ভোলেনি তরুণকে। এক অভিশপ্ত জীবের এই অমানুষিক ভালোবাসার কোনও মূল্যই কি নেই? কোনও দাম কি নেই শ্রীমতীর মিলনের সেই ব্যর্থ প্রয়াসের?

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীমতীর আত্মার মঙ্গল কামনা করলাম। অবশ্য যদি তার আত্মা বলে কিছু থেকে থাকে।

মেরি শেলির কাল্পনিক সাক্ষাৎকার



ক্রিস্টি ফার্ন

অনুবাদঃ সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশ্নকর্তা আর ড্যানিল অলিভো (আইজাক আসিমভের ফাউন্ডেশন এবং রোবট সিরিজে বর্ণিত যন্ত্রমানব)

ড্যানিল: শুভ সন্ধ্যা মেরি। এই সাক্ষাৎকারের জন্য রাজি হওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে।

মেরি: শুভ সন্ধ্যা।

ড্যানিল: যে প্রশ্নটা প্রথমেই মনে আসে সেটা হল বায়রন আর শেলি ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন?

মেরি: ওঁরা দুজনেই অনেকটা একই মেজাজের মানুষ। যদিও কিছু কিছু ব্যাপারে একেবারে আলাদা ছিলেন। বায়রন ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সফল কিন্তু কুখ্যাত। আর শেলির রচনা খুবই গভীর বলে মনে করা হত যদিও সমকালের সাহিত্যের মানদণ্ডের নিরিখে বেশ বিপজ্জনক ছিল ওঁর লেখালেখি। তখন ওঁরা দুজনেই নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে কী, আমাদের পুরো দলটাই তখন সেভাবে ছিলাম। আমি, ক্লেয়ার ক্লেমন্ট, বায়রন আর শেলি আমরা সবাই যেন ওই সমাজের কাছে একটা আস্ত বিপদ ছিলাম সেই সময়।

ড্যানিল: সেটা কেন?

মেরি: শেলি ছিল একজন নাস্তিক, নিরামিষাশী এবং মনে প্রাণে এক বিপ্লবী। বায়রনের প্রেমপর্ব চলছিল ওঁর নিজেরই সৎ বোনের সঙ্গে, যাই হোক সেই সময় আবার তাঁর নজর গিয়ে পড়ে আমার সৎ বোন ক্লেয়ারের দিকে। আমি ক্লেয়ারকে বুঝিয়েছিলাম নিজের জীবনকে এভাবে বায়রনের জন্য সঁপে না দিতে। কিন্তু ওর তখন একজন কবিকে চাই। আসলে আমার মতো হতে চাইত ক্লেয়ার।

ড্যানিল: আপনিও কি নিজের জীবনকে এভাবেই শেলির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন?

মেরি: একেবারেই না। বরং ওই এগিয়ে এসেছিল শুরুতে। প্রথমদিকে

একজন অতিথি হয়ে আমার বাবার বইয়ের দোকানে এসেছিল শেলি। আমি জানতাম সে বিবাহিত, কিন্তু এটা বুঝিনি যে ও কতটা অসুখী জীবন কাটাচ্ছে বা হয়তো ও একই সঙ্গে দু'জন নারীকে ভালোবাসতে পারে।

ড্যানিল: সত্যি? এ যেন সেই 'তোমার আমার এই আকর্ষণের কথা আমার বউ বুঝতে পারে না' গোছের হয়ে গেল শুনতে!

মেরি: একদমই নয়। আমাদের কথাবার্তা প্রাথমিকভাবে সাহিত্যের প্রসঙ্গেই হত আর সেসব একেবারে নির্দোষ ছিল প্রথম দিকে।

ড্যানিল: উনি কি আপনার ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিমত্তার আকর্ষণেই মজেছিলেন আর তার সঙ্গে ছিল আপনার পরিবারের সুনাম?

মেরি: ও আমার বাবার সব লেখা অবশ্যই পড়েছিল, 'পলিটিক্যাল জাস্টিস', 'ক্যালেব উইলিয়ামস' সবকিছু। আর আমার মায়ের 'রাইটস অফ উইমেন'-এর যে কোনও জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারত, যেমন পারত ক্লেয়ার।

ড্যানিল: আপনার বাবা ছিলেন উইলিয়াম গডউইন আর মা মেরি উলস্টনক্রাফট। একজন নারীবাদী হিসেবে তাঁর জীবন কেমন ছিল একটু বলবেন কি?

মেরি: এই শব্দটা আধুনিক। তখন এমন কোনও কিছুর ধারণা ছিল না। আমার মনে হয় তিনি মেয়েদের জীবনের মুক্তি চেয়েছিলেন বিয়ে আর শ্রেণিগত চেতনার এই বেড়াজাল থেকে। প্রকৃতপক্ষেই যে জীবন হবে স্বাধীন।

ড্যানিল: নারীবাদ নিয়ে আপনার নিজের ধারণা কী?

মেরি: মেয়েদের মর্যাদা এই যুগে বেশ কিছু দেশের সমাজ ব্যবস্থায় যতটা বেড়েছে তা হয়তো আগে কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু তাও তারা নির্যাতিত বহু ক্ষেত্রেই।

ড্যানিল: কোনও কোনও দেশে এখনও মেয়েদের গাড়ি চালানোতে বাধা আছে। এমনকী, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা ব্রাত্য!

মেরি: খুবই খারাপ লাগল আমার সময় থেকে দুশো বছর পরেও এমন অবস্থার কথা শুনে। এমনকী, তথাকথিত স্বাধীন সমাজের মেয়েদেরও প্রায়ই চিন্তাহীন শরীরসর্বস্ব করে তুলে ধরা হয়। এও এক ধরনের দাসত্ব, যাকে আমার মা ঘৃণা করতেন, আমিও করি।

ড্যানিল: শেলির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে ওঁর কী প্রতিক্রিয়া হতো বলে

আপনার মনে হয়?

মেরি: মনে হয় উনি ভালোভাবেই নিতেন। আমি বিশ্বাস করি, মা খুশিই হতেন এটা দেখে যে, উনি আর বাবা আদর্শগতভাবে যে জীবনের কথা ভেবেছিলেন ঠিক তেমনই জীবন কাটাচ্ছিলাম আমরা।

ড্যানিল: আপনার বাবা কি এটা ভালোভাবে মেনে নিয়েছিলেন?

মেরি: একেবারেই না। ওঁর রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন, একজন বিবাহিত, নাস্তিক কবির সঙ্গে পালিয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে তাঁর খুবই সমস্যা হয়েছিল।

ড্যানিল: ক্লেয়ারও গিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে?

মেরি: ও গিয়েছিল এটা ভেবে যে, ও ফরাসিতে কথাবার্তা চালাতে পারবে। তবে আমরা যখন বায়রনের সঙ্গে জেনিভায় ছিলাম তখন এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে শেলি আর ক্লেয়ারের মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণ আছে।

ড্যানিল: সেই সময় আপনার সঙ্গে শেলির বিয়ে হয়ে গেছে, সেটা জেনেও?

মেরি: আমি শেলিকে বিয়ে করেছিলাম যাতে ও ওঁর প্রথম সন্তানের অভিভাবকত্ব পেতে পারে। ওঁর প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেছিলেন লেক সার্পেন্টাইনের জলে ঝাঁপ দিয়ে। তবে আমাদের বিয়েটাই যথেষ্ট ছিল না এই সম্পর্কের জন্য। শেলি ছিল একজন নাস্তিক, অবিশ্বাসী। আর এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা।

ড্যানিল: আপনার নিজেরও সন্তান ছিল তো?

মেরি: পার্সি ফ্লোরেন্স ছাড়া আমার সব সন্তানেরাই মারা গিয়েছিল অকালে। তার জন্য বুকফাটা কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। আমার সবসময় ভয় হতো যে মায়ের মতোই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মরে যাব আমি।

ড্যানিল: যাই হোক না কেন, আপনার উপন্যাস 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' কি আসলে এমন একজনের জীবনের কথা, যিনি সন্তান পেয়েছিলেন একজন নারীর উপস্থিতি ছাড়াই।

মেরি: বেশ গভীর একটা উপলব্ধির কথা বললেন। ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এক আধুনিক 'প্রমিথিউস'। তিনি যেন সৃষ্টি রহস্যকে চুরি করে তৈরি করেছিলেন আস্ত একটা মানুষ। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল পরে। তাঁর সৃষ্ট ওই জীব বুঝতে পারল মানুষের মনের গূঢ় আলোছায়া। স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতা।

সে শুধু চেয়েছিল সেইটুকুই যা তার সৃষ্টিকর্তার আছে। একজন স্ত্রী আর একটা পরিবার।

ড্যানিল: সবাই জানতে চায় ওই উপন্যাস অবলম্বনে করা চলচ্চিত্র দেখে দেখে আপনার কী মনে হয়?

মেরি: চলচ্চিত্রের ওই দানব কখনওই নিজের কথা বোঝাতে পারে না। কেউ যদি ছায়াছবিটা দেখার পর মূল বইটা পড়ে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে এটা জেনে যে আসলে ওই জীব অনেক পড়াশুনা করেছিল। কতটা বুদ্ধিদীপ্ত আর সহানুভূতিশীল ছিল সে। মনে রাখতে হবে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সে তার সারা জীবন কাটিয়েছিল যার মধ্যে কোনও শৈশব ছিল না।

ড্যানিল: ঠিক যেন 'ব্লেড রানার' ছায়াছবির রেপ্লিক্যান্টরা। তারাও আসল মানুষকে হিংসা করত, তাদের চেয়ে দীর্ঘ জীবন কাটাতে পারার জন্য। আপনার উপন্যাস 'দ্য লাস্টম্যান' এমন এক মানুষকে নিয়ে যে এক অজানা ভয়ঙ্কর মহামারীর থেকে বেঁচে ফেরে। এর থেকেও কতগুলো চলচ্চিত্র প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে চার্লটন হেস্টন অভিনীত 'দ্য ওমেগা ম্যান' বা ২০০৭ সালে উইল স্মিথ অভিনীত জনপ্রিয় ছায়াছবি 'আই অ্যাম লেজেন্ড'। যদিও আপনার বইয়ের কথা স্বীকার করা হয়নি এই ছবিগুলোতে, তবে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতোই জীবন আর মৃত্যুকে নিয়ে প্রশ্ন করে এই আখ্যান।

মেরি: হ্যাঁ। আমার উপন্যাসে মানুষের ওই শেষ প্রতিনিধি কথা বলে মূর্তির সঙ্গে। সে তাদের চুমু খায় আর পিগম্যালিয়নের মতোই প্রার্থনা করে তারা যেন জীবন্ত হয়ে যেতে পারে।

ড্যানিল: 'আই অ্যাম লেজেন্ড' ছায়াছবিতে উইল স্মিথের চরিত্র কথা বলে দোকানে রাখা ম্যানিক্যুইনের সঙ্গে। আর চার্লটন হেস্টন অভিনীত ছায়াছবিতে ওই চরিত্র উডস্টকের রক ফেস্টিভ্যালের ভিডিও দেখতে থাকে। যার মধ্যে সে দেখতে পায় জনসমুদ্রের জোয়ার, যা আর নেই এ পৃথিবীতে।

মেরি: এর পুরোটাই এখন স্পষ্ট আমার কাছে।

ড্যানিল: আপনি বলেছেন যে। আপনার লেখালেখি শুরু এটা ভেবে যে আপনি যেন মেঘের মধ্যে কল্পনার প্রাসাদ গড়তে চলেছেন। আপনি কি মনে করেন আধুনিক যুগেও এটা প্রযোজ্য? মানে আমোদ প্রমোদের যে নতুন রকম ধারণা তৈরি হয়েছে তাতে এই কল্পনার কি কোনও জায়গা আছে?

মেরি: আধুনিক বিনোদনের জগতে অবশ্যই কল্পনার একটা বড় ভূমিকা আছে। সেটা যে কোনও সৃষ্টিরই একটা সোপান। চলচ্চিত্রে দেখছি দুর্দান্ত সব

দৃশ্যগত বিস্ময়। প্রাচীন পুরাণে পড়া অলৌকিক বিবরণগুলো আমাদের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে রয়ে গেছে। তবে আমিও এখনও মনে করি আসল বিস্ময় রাখা আছে আমাদের মনের গহীনে যেখানে আমরা ওই সব কল্পনার দানবদের লুকিয়ে রাখি। আমরা যখন পড়ি বা লিখি ওই কল্পনার জীবদের নিয়ে, আমরা যেন তাদের দুনিয়াটা সৃষ্টি করি নতুন ভাবে।

ড্যানিল: মেরি শেলি, অসংখ্য ধন্যবাদ!



ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মি

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

৭ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮
স্থানঃ রবার্ট ওয়াল্টনের জাহাজ, যা ব্যর্থ উত্তর মেরু অভিযানের শেষে ফিরে চলেছে লন্ডনের দিকে

রবার্ট ওয়াল্টন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই দানবের দিকে, যে নিজের সৃষ্টিকর্তার এবং তার পরিবারের নির্মম ধ্বংসের জন্য দায়ী। দানবের থেকে অদূরে শোয়ানো রয়েছে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মর দেহ। রবার্ট ওয়াল্টন এবং ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মাঝে যে দূরত্ব, সেখানে জমাট বেঁধেছে তমিস্রার কুয়াশা ও অন্ধকার, সেই অন্ধকার, যাকে বল ভয় পেতে শেখায়। যা জাগতিক সজীবতাকে নির্মম, ভয়াবহ ধ্বংসের অভিমুখে ঠেলে দেয়।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল ওয়াল্টন। বলল, 'তাহলে কী ভাবলে? এইভাবে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে খুন করে তুমি তোমার জন্মের সার্থকতা অর্জন করবে?'

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানব গর্জন করে বলে ওঠে, 'মানুষ মেরে আমি কোনও আনন্দ পাই না। আমি কোনও মানুষের থেকে আজ অব্দি কোনও সহানুভূতি পাইনি। তারা কেবল আমায় দিয়েছে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা। ক্রমাগত ঘৃণার পাত্র হতে হতেই আমার মধ্যে জন্মেছে প্রতিশোধস্পৃহা। তাই আজ আমি রক্তপিপাসু খুনী।'

'কিন্তু ধর, কেউ যদি তোমায় ভালোবেসে আপন করে নেয়, তবে?'

'এই পৃথিবীতে এমন উদারতা দেখাবার মতো লোক আছে নাকি?'

'ধরে নাও, যদি আমি, আমিই ভালোবাসি তোমায়?'

'তুমি! সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি। কিন্তু বিনিময়ে একটা জিনিস তোমার কাছ থেকে আমি চাই। আমি অভিযান করতে ভালোবাসি। যেমন এবারে উত্তর মেরুতে এসেছিলাম, এমনি করে ছুটে যাব আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায়। তোমাকে আমি

দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করব। তুমি এই সব অভিযানে বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করবে। তার বদলে তোমায় খেতে পরতে দেব। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তোমার রাগ ও খুনে মনোভাবকে দেখব। আর তোমায় ভালোবাসব।'

'কিন্তু, লোক সমাজে আমি বের হলেই যে আমাকে মানুষ পাথর ছুঁড়ে মারবে, গুলি করবে।'

'আমার লন্ডনের কাছে একটা ব্যক্তিগত খামার বাড়ি আছে। সেখানে তোমায় লুকিয়ে রাখব। আর জনসমক্ষে যখন বেরোবে তখন মুখ ভরতি ব্যান্ডেজ করে বেরোবে। লোকে ভাববে যে তুমি কোনও দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়েছ। কোনও সমস্যা হলে আমি তার ব্যাখ্যা করে দেব।'

'স্বীকার না করে পারছি না যে প্রস্তাবটা... প্রস্তাবটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো। আজ রাতটুকু সময় দাও। কাল সূর্যের আলো ফোটার পরে তোমায় জানাব।'

এই কথা বলে দানব জাহাজের পাশে থাকা সেই বরফের ভেলাতে লাফাতে গেল, যে ভেলায় করে সে এসেছিল। লাফাবার আগে একবার শুধু পেছনে ফিরল ক্যাপ্টেন রবার্ট ওয়াল্টনের উদ্দেশ্যে। তারপর বলল, 'আর হ্যাঁ, অন্যদের মতো তুমি আমায় দানব বলে ডেক না। যে বংশের লোকেদের আমি হত্যা করেছি, সেই বংশের অভিশপ্ত পরিচয় আমি একাই বহন করে যাব। আজ থেকে আমার নাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন!'

৪ মে, ১৯৪৫
স্থানঃ বার্লিন শহর

মিত্র বাহিনীর ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার স্যার র‍্যালফরেইনার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ধ্বংসের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। পাশের অট্টালিকার থামগুলো ভেঙে পড়েছে। রাস্তায় এক ফোয়ারার কাছে এক দেবদূতের প্রতি মূর্তির ভগ্নস্তূপ। দেবদূতের মুখও পাখনাগুলো গোলাগুলির লড়াইয়ে উড়ে গেছে। ফোয়ারার জল বন্ধ। রাস্তায় অদূরে তিনটে নাৎসি সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। কেউ সরায়নি। সোজা রাস্তার শেষ প্রান্তে আগুন জালিয়ে লাল ফৌজের সৈন্যরা নাচছে, গান করছে। রেইনার সেই দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। কে?

একটা বিশাল বড় ছায়ামূর্তি ভাঙা থামের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এল।

ছায়ামূর্তিটা প্রায় আট ফুট লম্বা হবে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। এবার ছায়ামূর্তিটা কথা বলতে শুরু করল।

—শুভ সন্ধ্যা, মি. রেইনার।

—শুভ সন্ধ্যা, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

—আজকে সারাদিন তুমি কী করলে?

—ওই যা আপনি বলেছিলেন। প্রায় একশোর ওপর জার্মান সৈন্য সমেত বার্লিনের সাধারণ মানুষদেরও নিকেশ করেছি।

—বেশ।

—একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার।

—বল।

—আগামীকালও কি আমায় এই কাজ করে যেতে হবে?

—না, থাক। আর দরকার নেই। আমাদের বার্লিন বিজয় সপূর্ণ হয়ে গেছে। তুমি এবার দেশে ফিরতে পার। আমি তোমার লন্ডনে যাত্রার জন্যে একটা গোপন বিমানের ব্যবস্থা করেছি।

—আর আমার দাবিটার কথা মনে আছে তো স্যার? আপনি বলেছিলেন যে আপনার কথা মতো কাজ করলে আপনি আমার দাবি নিয়েও ভাববেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। তোমার দাবি হল যে তোমার আরও সঙ্গী বা সঙ্গিনী তৈরি করতে হবে, তাই তো?

—হ্যাঁ।

—হবে হবে, সব হবে। তুমি বুঝতেই পারছ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের কী বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেসব আগে একটু সামাল দেওয়া যাক। তারপর না হয়...

—আচ্ছা। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না।

—না, না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, আমি তো তোমায় বলেইছি যে ব্রিগেডিয়ার স্যার র‍্যালফরেইনার কথার খেলাপ করে না।

—বেশ। আমি চললাম তবে। কাল আবার এখানে দেখা করব। গোপন বিমানে ওঠার জায়গাটুকু জানাবেন।

রেইনারের মনে হল যে একটা কালো জাগুয়ার অন্ধকারে নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেল। রেইনার প্রবল সাহসী হলেও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে কথা বলার সময় তার ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে। এই দানবের কথার খেলাপ হলে সে আক্রোশে জ্বলে উঠবে। তারপর রেইনার পৃথিবীর যেখানেই আত্মগোপন করে

থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে বের করবে আর নির্বংশ করে ছাড়বে।

১৪ মে, ২০৩৮
স্থানঃ উত্তর কলকাতার একটা বাড়ি

টিভি চ্যানেলে সন্ধ্যেবেলা ব্রেকিং নিউজ দেখানো শুরু হল।

'কলকাতা শহরে মাত্র তিন দিন আগে এক জিবোলা আক্রান্তের দেখা মিলেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি মাদ্রিদ গিয়েছিল ঘুরতে। সেখানেই রাস্তায় ঘোরবার সময় জিবোলা আক্রান্ত কেউ তাকে কামড়ে দেয়। প্রাথমিক জ্বর টুকু নিয়ে সে ফিরে এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই জিবোলা রোগের প্রভাব তার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে। শরীরের স্বাভাবিক চামড়া একটু একটু করে খসে পড়ছে। প্রকট হয়ে পড়ছে হাড়, মাংস আর চাপ-চাপ জমাট রক্ত। আচার-আচরণে জান্তর প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। আর.জি.কর. হাসপাতালের যে বিশেষ কেবিনে তাকে রাখা হয়েছে সেখানে সে জিনিসপত্র ভাঙচুর করবার চেষ্টা করছে। আমাদের প্রতিনিধি শঙ্কর পাল জানিয়েছে যে গতকাল রাতে একজন নার্স ঘুমের ইঞ্জেকশান দেবার সময়, আক্রান্ত ব্যক্তি নার্সকে আঙুলে কামড়ে দেয়। নার্সের শরীরে জিবোলা নামক জোম্বি ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। অবস্থা সামাল দিতে দুজন পুলিশকর্মী সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন ডাক্তার পার্থ সেনগুপ্ত। উনি ভারতের একমাত্র জিবোলা বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার সেনগুপ্ত, যদি জিবোলা রোগটা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলেন...'

ডাক্তার সেনগুপ্ত বলতে শুরু করল, 'প্রথম কথা, এই জোম্বি রোগটা ভারতে প্রথম। এই রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা করবার মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আমাদের নেই। আমি যতদূর জানি আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে সেপটিসেমিয়া তার সেপসিসের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এতে কোনও সুফল মিলবে না। কারণ জিবোলা আর সেপসিস এক নয়। আর এই রোগ সম্পর্কে এটুকু বলে দিই, কোনও ব্যক্তি যদি জিবোলায় আক্রান্ত হয়, তবে সাতদিন মাত্র বেঁচে থাকবে। এক্ষেত্রে আমাদের আক্রান্ত ব্যক্তির পঞ্চম দিন চলছে। এই সময়ে যদি জিবোলা রোগের অ্যান্টিভেনম ইঞ্জেকশন শরীরে না দেওয়া হয়, তবে লোকটি মারা যাবে এবং পুরোদস্তুর জিবোলা দানবে পরিণত হবে। তখন মৃত ব্যক্তির ভাইরাস তার মস্তিষ্কের দখল নেবে। অন্য মানুষও জীব-জন্তুকে সেই মৃত শরীরে সে কামড়ে তাদের মাংস খেতে চাইবে, তাদের

মেরে ফেলতে চাইবে। দুঃখের কথা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে জিবোলার অ্যান্টিভেনম ইঞ্জেকশন নেই। আমেরিকার কাছে ভারত এই মুহূর্তে অ্যান্টিভেনম ইঞ্জেকশন চেয়ে পাঠিয়েছে, যা জুনের আগে সম্ভবত আসবে না। কারণ বিপুল চাহিদার জন্যে আমেরিকার নিজের কাছেই স্টক তেমন নেই। সুতরাং আমি অত্যন্ত হতাশ। আর একটা কথা, জিবোলা কিন্তু বাতাস বাজলের মাধ্যমে ছড়ায় না। একমাত্র আঁচড় বা কামড়ের মাধ্যমেই এটা ছড়ায়।'

৩ অক্টোবর, ২০৩৮
স্থানঃ আর্মি হেড কোয়ার্টার, নিউ দিল্লী

'স্যার, জিবোলা ভাইরাস আমাদের বোকা বানিয়েছে। আমরা যা আশা করেছিলাম, তার থেকেও দ্রুততার সঙ্গে এটা ছড়িয়ে পড়ছে। কলকাতার উত্তর অংশ এই ভাইরাসে ছেয়ে গেছে। আর দেরী করলে দক্ষিণ কলকাতাও জিবোলা আক্রান্ততে ছেয়ে যাবে। পুরো শহরটাতে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। আমরা কি উত্তর কলকাতায় সেনা অভিযান করব?' কথা গুলো এক নিঃশ্বাসে বলে একটু থামল সিনিয়র আর্মি অফিসার রিচা প্যাটেল।

ভারতীয় সেনা প্রধান শ্রীনিবাসরাও উত্তর দিল, 'চব্বিশ নম্বর ও পঁচিশ নম্বর ব্যাটেলিয়নকে আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রায় কুড়ি লক্ষ আক্রান্তের সঙ্গে হ্যান্ড-টু-হ্যান্ড কম ব্যাটে পেরে ওঠা যাবে না। আমাদের ওখানে বোম ফেলতে হবে। কিন্তু তাতে রাজনৈতিক বাধা আসছে। বোম ফেললে কলকাতার সব ঘর-বাড়ি-উড়ালপুল ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। জনগণের সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি হবে। তাই রাজ্য সরকার আপত্তি করছে। যদি শেষ মুহূর্তে ফেলাও হয়, তবে তার আগে আমাদের আক্রান্ত জায়গায় গিয়ে দেখতে হবে যে কেউ বেঁচে আছে কিনা। থাকলে তাদের উদ্ধার করে দক্ষিণ কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে।'

—স্যার, উত্তর কলকাতা থেকে সাধারণ মানুষদের উদ্ধার কাজের জন্য কি স্পেশাল কমান্ডো বাহিনীকে পাঠানো হবে?'

—না, স্পেশাল কমান্ডো ফোর্সও এত দানবের মধ্যে উদ্ধারকার্য চালাতে পারবে না। এর জন্য দরকার অন্য শক্তি।

—শক্তি! কী ধরণের শক্তি?

—দানবীয় শক্তি। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের সেনাপ্রধানের সঙ্গে

আমার কথা হয়েছে। আগামীকালই ব্রিটেন থেকে এক বিশেষ আর্মি ব্যাটেলিয়ান ভারতে এসে পৌঁছচ্ছে। সদস্যসংখ্যা ১০০০ জন। এরা উত্তর কলকাতায় সেনা অভিযান চালাবে। আর আমাদের সেনাবাহিনী এদের পেছন থেকে ব্যাক-আপ দেবে। মিশনের উদ্দেশ্যই হবে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা। মিশন চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে রাজি করাবে যে অপারেশন সম্পূর্ণ হলেই যাতে বোম ফেলা যায়।

—স্যার, এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে কোনও আপডেট ছিল না!

—ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় বলে জানানো হয় নি। যাই হোক, এখন তো জানলে। আর হ্যাঁ, আমাদের অতিথিরা কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ নয়। সুতরাং ওদের থেকে আমাদের অফিসারদের দূরে থাকতে বলবে। শুধু কাজ নিয়ে কথা হবে। আর অপারেশন শুরুর আগে পর্যন্ত রোজ ওদের দিনে দু'কিলো করে মাংস খেতে দিতে হবে। বুঝেছ?

—দু-কিলো করে রোজ মাংস! মানুষ না অন্য কিছু?

—ধরে নাও অমানুষই।

—আচ্ছা। একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে, স্যার। আমাদের সেনা শক্তি বিশ্বসেরা। কিন্তু তাহলে আমরা ব্রিটেন থেকে সেনা সাহায্য নিচ্ছি কেন?

—কারণ যারা আসছে, তারা জিবোলা রোগে আক্রান্ত হবে না। আমাদের সেনারা হবে।

—সে কী! এই বিশেষ সেনারা কারা? এদের কি অ্যান্টিভেনোম ইঞ্জেকশান আগে থেকেই নেওয়া আছে?

সেনা প্রধান শ্রীনিবাসের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সেনা প্রধান বলল, ‘এদের কোনও অ্যান্টি-ভেনমের দরকার নেই। এরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মি।’

৫ অক্টোবর, ২০৩৮
স্থানঃ উত্তর কলকাতা

শহরের আকাশের দিকে ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। বাতাসে মাংস পচে যাওয়ার গন্ধ। জিবোলা আক্রান্ত এক গৃহবধূ বাড়ির ছাদে বসে পায়রার মাংস খুঁটে খাচ্ছে। তার নিজের কাঁধের কাছে খানিকটা মাংস নেই। সম্ভবত কেউ আগেই কামড়ে তুলে নিয়ে গেছে সেই মাংস। গৃহবধু জানেই না যে সে এক

জীবন্মৃত লাশ। সে মহানন্দে কাঁচা পায়রার রক্তাক্ত মাংস খেয়ে চলেছে। বাড়ির নিচের সরু গলির রাস্তায় রক্ত শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। সেখানে পাঁচটা জিবোলা আক্রান্ত নেড়ি কুকুর একটা মানুষের পচা-গলাশরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

শহরের বিভিন্ন রাস্তা জুড়ে গাড়িগুলো ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় হোক বা উল্টোডাঙার মোড়— সর্বত্রই একই দৃশ্য। গাড়িগুলো দোমড়ানো। কাঁচ ভাঙা। গাড়ির ভেতরে বা বাইরে মানুষ মরে পড়ে আছে। কেউ কেউ জিবোলা দানবে পরিণত হয়ে টলতে টলতে ইতস্তত ঘুরছে। কোনও কোনও জিবোলা দানব গাড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে শরীরগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে বের করছে। তারপর দাঁত দিয়ে বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাংস ছিঁড়ে মুখে পুরছে। কম বেশি সব রাস্তাতেই গোঁ-গোঁ, গর-গর শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওগুলো জিবোলা দানবের চাপা কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রসদনের কাছেও বারাসাতের কাছে প্রচণ্ড ভিড়। এখানে সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যে সামান্য কিছু মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে, তাদেরকে চেকিং করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে সব নিয়ে ঝামেলাও চলছে। যেমন কোনও এক পরিবারে মা-ছেলের সংক্রমণ নেই, বাবার জিবোলা সংক্রমণ ঘটেছে। ছ'দিনের পুরোনো সংক্রমণ। সেনাবাহিনী মা-ছেলেকে ছেড়ে দিল। কিন্তু বাবাকে ধরে জিবোলা দানবদের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কারণ সংক্রমিত হওয়া কাউকে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ঢুকতে দিলে রোগটা নিরাপদ জায়গাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। মা-ছেলে চোখের সামনে দেখল যে একটা শরীরের ওপর কিছু জিবোলা দানব উপুড় হয়ে শরীরটাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটা দানব সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার হাতে ধরা মৃত শরীরের হৃৎপিণ্ড। দানবটা গোগ্রাসে কামড়ে কামড়ে হৃৎপিণ্ড খেতে লাগল। নিজের আপনজনের ওই হাল দেখে মা অজ্ঞান হয়ে গেল, আর ছেলে বমি করতে লাগল। এই ধরণের নৃশংস, অমানবিক ঘটনা
নিত্যদিন হয়ে চলেছে।

৬ই অক্টোবর, ২০৩৮
স্থানঃ নলিনী সরকার স্ট্রীট, উত্তর কলকাতা

হাতিবাগানের কাছে একটা রাস্তা। নাম নলিনী সরকার স্ট্রীট। সেখানে একটা

ভাঙা চোরা বাড়ির ভেতরের দৃশ্য। খাটের নীচে প্রিয়া বলে একটা দশ বছরের মেয়ে লুকিয়ে আছে। গতকাল রাতে কিছু জিবোলা দানব তাদের বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি, ধ্বস্তা ধ্বস্তির মধ্যেও প্রিয়ার বাবার চিৎকার করে বলেছিল, 'প্রিয়া, শিগগির খাটের তলায় ঢুকে যাও। শিগগির...'

এরপরে প্রিয়া বাবা-মায়ের কানফাটা আর্তনাদ ছাড়া কিছু শুনতে পায়নি। দানবগুলো তার ঘরেও ঢুকেছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, খাটের তলাটা খুঁজে দেখেনি। সেই সময়ের পর থেকে প্রিয়া আর বেরোতেই পারছে না।

দুপুরের দিকে প্রিয়া বেশ অনেকগুলো হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল। হেলিকপ্টার থেকে বাংলা-হিন্দী-ইংরেজিতে বলতে বলতে যাচ্ছে, 'নগরবাসীগণ, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এখনও বেঁচেথাকেন, এবং সংক্রমণমুক্ত হন, তবে অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে হাতিবাগান এবং শোভাবাজার মোড়ের দিকে আসুন। আমরা আপনাদের উদ্ধার করতে এসেছি।'

প্রিয়া ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া ছাত্রী। বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি– সে তিনটে ভাষাই বলতে এবং বুঝতে পারে। ফলে তার বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হল না। আস্তে আস্তে গুটিসুটি মেরে সে খাটের তলা থেকে বের হয়ে এল। ঘর থেকে বের হতে গিয়ে তার চোখ আটকে গেল মেঝের দিকে। মেঝেতে তার মায়ের মরদেহ পড়ে। একটা হাত নেই। পায়ের দুপাশে কালচে লাল জমাট রক্ত। মুখটা থ্যাঁতলান, চোখ দুটো যেন খুলে বেরিয়ে আসবে। বীভৎস দৃশ্য। প্রিয়ার মাথাটা ঘুরে গেল। সে জোরে জোরে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করেছে। এমন সময় ধুপ-ধুপ-ধুপ শব্দ শুনে তার কান্না থেমে গেল। নিজের হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল প্রিয়া। নিজের চোখের জলকে অবশ্য সে চাপতে পারছে না।

চারদিকে তাকিয়ে প্রিয়া বুঝতে পারল যে ধুপ-ধুপ-ধুপ শব্দটা আসছে রান্নাঘর থেকে। পা টিপে টিপে প্রিয়া এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। আস্তে আস্তে করে উঁকি মেরে যা দেখল তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল প্রিয়ার। দেখল যে এক জিবোলা দানব তার বাবার ছিন্ন নরমুন্ডটা টেবিলে আছড়ে ফেলে ভাঙবার চেষ্টা করছে। যেন নারকেল ফাটাচ্ছে! দৃশ্যটা দেখে প্রবল ভয়েও ঘৃণায় প্রিয়া আর্ত চিৎকার করে উঠল। দানবটা সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ার দিকে তাকাল। তার কুঁচকে যাওয়া চামড়ার রক্তাক্ত মুখ ভারী ভয়ঙ্কর। দানবটা প্রিয়ার দিকে তেড়ে এল। প্রিয়া অবশ্য ততক্ষণে ছুটতে শুরু

করেছে। নিজের অবস্থা বাবা-মায়ের
মতো যেন না হয়, তা ভাবতে ভাবতেই ছোট্ট মেয়েটা শিউড়ে উঠছে।

রাস্তায় কিছু জিবোলা দানব তার দিকে তেড়ে এল। কিন্তু প্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে তাদেরকে কাটিয়ে দৌড়তে লাগল। বিভিন্ন ভাঙা গাড়ির আড়াল দিয়ে প্রিয়া ভালোই দৌড়চ্ছিল কিন্তু তার স্বাভাবিকভাবে দৌড়নোর দৃশ্য দেখে বিভিন্ন দিক থেকে জিবোলা দানবরা তাকে ঘিরে ধরল। প্রিয়া একটা গাড়ির সামনের দরজায় সেঁটে দাঁড়িয়েছিল। সে আর কোনও আশা দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ করে দুটো হাত তাকে পেছন থেকে চেপে ধরল। প্রিয়া ছটফট করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো বলছি!' কিন্তু বিশাল হাতের পাঞ্জা দুটো তাকে ছাড়ল না। বরং এক ঝটকায় তাকে গাড়ির ওপর টেনে তুলল। তার পর হাতের পাঞ্জার অধিকারী ইংরেজিতে বলল, 'আমি না বললে তুমি গাড়ি থেকে নিচে নামবে না। বুঝেছ?'

প্রিয়া একটু ধাতস্থ হয়ে এটুকু বুঝল যে গাড়ির মাথার ওপর যে দাঁড়িয়ে আছে, সে আসলে উদ্ধারকারী দলের অংশ। কিন্তু লোকটাকে দেখতে দানবের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। বিরাট লম্বা। তার সারা মুখ ব্যান্ডেজ। এক হাতে মেশিন গান। আর এক হাতে বিশাল বড় কুঠার।

এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল প্রিয়া। যতদূর দৃষ্টি যায় হাতিবাগানের দিকের প্রতিটা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধারকারী দলের কেউ না কেউ। যেমন এক জনতার সঙ্গেও আছে। এরা ইচ্ছাকৃত গর্জন করে জিবোলা দানবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দানবরা তাদের দিকে ছুটে আসছে আর মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক লড়াই চলল। তারপর সেই দৈত্যাকার, মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা লোকটা প্রিয়াকে একরকম বগলদাবা করে গাড়ি থেকে নিচে নামল। প্রিয়া ততক্ষণে অজ্ঞান। লাশও জিবোলা দানবের স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সে প্রিয়াকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

৭ অক্টোবর, ২০৩৮
স্থানঃ শ্যামবাজারের কাছে একটা পুরানো অট্টালিকা, উত্তর কলকাতা

রাতটুকু তার কোথায় কেটেছে, তা প্রিয়া জানে না। সকাল হতে তার চেতনা ফিরে এল। প্রিয়া দেখলো তার গায়ে চড়া রোদ এসে পড়েছে। উঠে দেখে যে তার পাশে কে যেন একটা শুকনো পাঁউরুটি আর জলের বোতল রেখে

গেছে। প্রিয়ার খুব খিদে পেয়েছিল। সে গ্রোগ্রাসে খেতে খেতে তার মা-বাবার কথা মনে পড়ল। প্রিয়া হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। এমন সময় একটা গম্ভীর স্বরে একজন ইংরেজিতে বলল, 'কী হয়েছে?'

প্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে দেখল যে প্রশ্নকর্তা কালকের সেই লোকটা যেকালকে
তাকে জিবোলা দানবদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। প্রিয়া ইংরেজিতে বলল, 'আমার মা-বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে কাকু। তুমি না এলে ওরা আমাকেও...'

প্রিয়া দেখল, মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা লোকটার দৃষ্টি কেমন অসহায় হয়ে গেল। লোকটা তবু গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, 'যা হয়েছে, তা আমি বদলাতে পারব না। কিন্তু আর কিছু হবে না। তোমাকে আমি সুস্থ শরীরে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।'

'তুমি খুব ভালো কাকু', এই বলে প্রিয়া ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে জড়িয়ে ধরল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আবেগে চোখ বন্ধ করল। আজ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাকে ঘৃণার চোখে দেখেছে। সেনাবাহিনী তাকে স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই ছোট্ট, নিষ্পাপ মেয়েটা একটু হলেও তাকে আপন করেছে। মেয়েটা এখনও জানেনা যে জিবোলার দানবের মতো না হলেও সে-ও তো আসলে দানবই। বহু নৃশংস হত্যা সে করেছে। জানলে সে হয়তো অন্যদের মতোই তাকে ঘৃণা করবে। কথাটা মনে আসতেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দুর্বলতাকে আর মনে জায়গা দিল না। চোখ খুলল। তারপর প্রিয়ার শরীরটাকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিল। প্রিয়া অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

প্রিয়া বলল, 'প্রিয়া... প্রিয়া কর।'

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলল, 'আমার নাম... থাক, নাম জেনে কাজ নেই।'

এবার একটু থেমে যোগ করল, 'মন দিয়ে শোন প্রিয়া। এখানে আমি এবং আমার সহকর্মীরা একটা মিশনে এসেছি। মিশনটা হল তোমার মতো সাধারণ লোকেদের এই জিবোলা কবলিত এলাকা থেকে উদ্ধার করা। কাল দুপুর থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা কয়েকশো লোককে উদ্ধার করতে পেরেছি। আমরা তোমাদের উদ্ধার করে বাগবাজার বা নিমতলা ঘাট নামক জায়গায় পৌঁছে দেব। আমি যতদূর জানি এই জায়গাগুলো নদীর কাছে। সেখান থেকে লঞ্চ বা হেলিকপ্টারে করে তোমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবে।

বুঝেছ? সুতরাং এখন কান্নাকাটির সময় না। চটপট উঠে পড়। আর মাথায় রাখবে কোনও অবস্থাতেই রাস্তায় চলা থামাবে না।'

৭ অক্টোবর, ২০৩৮
স্থানঃ শ্যামবাজার মোড় থেকে বাগবাজার যাওয়ার পথ, উত্তর কলকাতা

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দেখল যাওয়ার পথ প্রায় বন্ধ। হাজার হাজার জিবোলা দানব পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বেলগাছিয়া, গ্যালিফ স্ট্রীট, বাগবাজার সবদিকেই থিক থিক করছে জীবন্মৃত শয়তানের দল। এদেরকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ করতে হবে। ভয়ানক প্রাণঘাতী যুদ্ধ। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পেছন ফিরে বলল, 'আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে কী ভয়ানক প্রতিরোধ রয়েছে। এদের সবাইয়ের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারবনা। তাই আমরা রাস্তার বাঁদিকটা ফাঁকা করতে করতে এগিয়ে যাব। সুতরাং সাধারণ মানুষদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে চলবেন। কেউ ডানদিকে ভুলেও যাবেন না।'

এই বলে সামনে তাকিয়ে একটা হুঙ্কার দিল। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে মেশিন গান থেকে গুলি করতে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরোচ্ছে। সামনের প্রতিরোধ ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। দলটা একটু একটু করে সামনে এগোচ্ছে। কারুর কার্তুজ খতম হয়ে গেলেই সে পেছনে সরে যাচ্ছে এবং ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির অন্য কেউ এসে তার জায়গা নিচ্ছে। দেখতে দেখতে জিবোলা দানবদের প্রতিরোধ খানিকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এই সুযোগে পুরো দলটা সাধারণ মানুষদের নিয়ে বাগবাজারের দিকে চলল। প্রিয়া মাটির দিকে চোখ দিয়ে হাঁটছে। কারণ চারদিকের রক্ত দেখলেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার জীবনের সব চেয়ে দুঃখের, বিস্ময়ের আর ভয়ের অনুভূতি প্রিয়া একই সঙ্গে অনুভব করছে।

গিরীশ অ্যাভেনিউয়ে পৌঁছে দেখা গেল যা কারুরই মেশিন গানের গুলি আর অবশিষ্ট নেই। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তার কোমর বন্ধ থেকে একটা কুঠারও ছুরি বের করল। এরপর ধেয়ে আসা শত্রুদের দিকে তেড়ে গেল। খপ-খপ-খপ-খপ করে শব্দ হচ্ছে। এক এক কোপে এক এক দানবের ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দিচ্ছেসে। কারুর কারুর কুঠার দিয়ে হাত-পা কেটে ফেলছে। ফোয়ারার মতো একেকটা শরীর দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বাগবাজার অঞ্চলে রক্তের হোলি খেলা চলছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির সকলেই প্রায় আট ফুটের

কাছাকাছি লম্বা হওয়ায় তারা শারীরিক সুবিধে নিচ্ছে। হাতের মুঠো-কনুই দিয়ে মারছে, পা দিয়ে লাথি মারছে।

এমনিভাবে চলতে চলতে অবশেষে গঙ্গা দেখা গেল। সেখানে ভারতীয় আর্মির জওয়ানরা ইতিমধ্যেই অন্য দানবদের মেরে পথ তৈরি করে রেখেছিল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির সবাই ততক্ষণে হাঁপাচ্ছিল। জিবোলা দানবের কামড় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির অনেকেই খেয়েছে। তাতে সংক্রমণ না হলেও, বিভিন্ন জায়গায় মাংস উঠে গেছে, পোষাক ভেদ করেও সারা শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র আঁচড় আর মাংস খোবলানোর চিহ্ন।

সব আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির সবাই নিরীহ লোকেদের হেলিকপ্টার এবং স্টিমার-লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। প্রিয়াকে কাঁধে চাপিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নিজে হেলিকপ্টারে তুলে দিল। প্রিয়া শেষবারের মতো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বিশাল ডান হাতটা ছুঁয়ে বলল, 'তুমি আমাদের সবাইকে বাঁচালে। তুমি খুব ভালো লোক, কাকু।'

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আমি ভালো লোক নই... আমিও... আমিও এক দানব।'

হেলিকপ্টারটা প্রিয়া এবং আরও বেশ কিছু সাধারণ লোককে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। যাবার আগে সেনাবাহিনীর থেকে জানিয়ে দেওয়া হল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মিকে এখান থেকে সরিয়ে আবার সল্টলেক বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কিছু মানুষকে উদ্ধার করা বাকি। তার জন্য নতুন করে অস্ত্র ও রসদ দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা কাল সকালের আগে সম্ভব নয়। আজ রাতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মিকে এই গঙ্গানদীর পাড়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

হেলিকপ্টার ও লঞ্চগুলো ধীরে ধীরে বিদায় নিল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন শহরের দিকে তাকিয়ে দেখল যে জিবোলা দানবদের একটা নতুন বড়সড় দল জড়ো হয়েছে এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। সেই দলে রয়েছে লোহার রড, ক্রিকেট ব্যাট এবং রান্নার ছুরি হাতে দানবেরা। এবং সঙ্গে রয়েছে শহরের বিভিন্ন বাড়ির পোষা কুকুর গুলো, যেগুলো এখন দানবে পরিণত হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ও সহযোগীরা তীব্র আক্রোশে ছুটে গেল সেই দলের দিকে। আবার যুদ্ধ শুরু হল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মির এক একজনের জন্য দানবেরা সংখ্যার অনুপাতে

পাঁচ-ছ'জন এবং সশস্ত্র। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নিজে দশ-বারো জনের সঙ্গে একা লড়ে যাচ্ছে। সবাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের শরীর লক্ষ করে লাফ দিচ্ছে ও জাপ্টে ধরে তাকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করছে।

দানবদের ভারে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বিশাল শরীরটা অবশেষে নেমে আসছে মাটিতে। দুটো কুকুর দানব ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের পাকা মড়ে ধরেছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ঘোলাটে চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। তার কুঠারটা তিন-চারটে হাত চেপে ধরে আছে। সে অন্ধের মতো সমানে বড় ছুরিটা ভিড়ের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। আর দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর্মিকে কোনও দানব এত সহজে খতম করতে পারবে না। আমরা বেঁচে থাকব... কাল সকালের সূর্য দেখব... দেখবই...'

কিন্তু যে কথাটা আসলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মাথার ভেতরে ঘুরছিল সেটা হল যে জিবোলা দানবদের বিরুদ্ধে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে যাতে প্রিয়ার মতো অসংখ্য নিরীহ মানুষের জন্যে আগামীকালের পৃথিবীটা নিরাপদ ও বাসযোগ্য থাকে।

একটা ছোট্ট মেয়ের নিষ্পাপ, সরল ভালোবাসায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো দানবের ভেতরেও মনুষ্যত্ব জেগে উঠেছিল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন : কল্পনার অন্তরালে বাস্তবের বিজ্ঞান



সন্তু বাগ

১৮১৮ সালে প্রকাশ পায় মেরি শেলির লেখা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অর মডার্ন প্রমিথিউস' এর প্রথম খসড়া। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র এক ডাক্তার, যিনি বিভিন্ন মনুষ্যদেহাংশ জুড়ে এক দানব তৈরি করেন। তারপরে সেই দানবদেহটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকরেন। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় এক আধিভৌতিক দানব। মেরি শেলির এই অনবদ্য কল্পনা কিন্তু শুধুই আকাশকুসুম নয়, এর পিছনে ছিল তৎকালীন বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়।

তিনি সেই সময়ের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সমকালীন বিজ্ঞানের দুই বিখ্যাত জীবন ও মৃত্যুর সীমানা-অন্বেষক আবিষ্কার তাঁর লেখায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমটা হল কখনও সখনও জলে ডুবে আপাতমৃত মানুষের পুনর্জীবন প্রাপ্তি আর দ্বিতীয়টা হল প্রাণীকোষের উপর ইলেক্ট্রিসিটির প্রভাব।

১৭৯৫ সালে মেরি শেলির জন্মের দুবছর আগে, তাঁর মা, দার্শনিক মেরি ওলস্টনক্রাফট, লন্ডনের এক ব্রিজ থেকে টেমস নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তিনি প্রচণ্ড অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটা চিঠিতে লিখে রেখেছিলেন যে 'আমাকে যেন মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে না আনা হয়'। মৃত্যুর পথ থেকে কি কাউকে ফিরিয়ে আনা যায়? যে একবার মৃত, তাঁকে কি করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব!

তবু মেরি ওলস্টনক্রাফটের সুইসাইড নোটে ওই বক্তব্যটা ছিল। কারণ, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যে জলে ডুবে মৃত্যুর মুখোমুখি চলে গেলেও তাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। তৎকালীন মানুষ জলে ডোবা আপাতমৃত দেহগুলিকে মৃত বলেই ধরে নিত, কারণ সেইসময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান এতই অনুন্নত ছিল যে জলে ডোবা মানুষকে বাঁচানোর কোনও প্রক্রিয়া মানুষের জানা ছিল না। সেই ফুসফুস আর পাকস্থলীতে জল ভরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষেরা কিছুক্ষণ পরে এমনিতেই মারা যেত।

কিন্তু আঠার'শ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে জলে

ডুবে মারা যাবার অনতিবিলম্বেই যদি কাউকে তুলে আনা সম্ভব হয় এবং কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া সেই দেহের উপরে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। এই মর্মে ১৭৭৪ সালে দুই চিকিৎসক উইলিয়াম হাওয়েস এবং টমাস কোগান লন্ডনের রয়েল হিউমেন সোসাইটিতে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে একটা বক্তৃতা দেন। তখনও তাঁরা ঠিকভাবে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারেনি। তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের কথাই বলেন। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দু-একটা যেমন আহত ব্যক্তির নাসারন্ধ্র দিয়ে বাতাস ভেতরে পাঠানো কিংবা পেটে চাপ দিয়ে জল বের করা ইত্যাদি বেশ কাজের ছিল। কিন্তু শিরা কেটে রক্ত-ক্ষরণ, তামাকের ধোঁয়া পাঠানো ইত্যাদি পদ্ধতি সেভাবে কাজে লাগেনি। এসবের পরেও কিছু ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এইজন্যেই মেরি ওলস্টনক্রাফট মরার পরে বেঁচে ওঠা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

এভাবে যে মারা যাবার পরেও (আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আপাতমৃত) কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব এটা প্রমাণিত হবার পরে মানুষের মধ্যে নতুন এক উদ্বেগের জন্ম দিল। পুনরুজ্জীবন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মানুষের মনে ভয় দেখা দিল যে তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হবে। এভাবেই কিছু মানুষ তৈরি করে ফেলল 'সেফটি কফিন' যাতে মানুষ যদি কোনও ভাবে বেঁচে ওঠে, সে যেন জানান দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। আস্তে আস্তে তারা ল্যাবোরেটরীতে বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে গবেষণা করে খুঁজে পান যে জলে ডুবে মৃত্যুর আসল কারণ।এই আবিষ্কারই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং প্রাণের গভীর যোগসূত্র খুঁজে দেয়।

যাই হোক, মেরি ওলস্টনক্রাফট ওই মারা গিয়ে আবার বেঁচে ওঠার দলে পড়লেন। তিনি যে সময়ে ঝাঁপ দিয়ে ছিলেন সেই সময়ে কিছু মৎস্যজীবী ওখানে নৌকা নিয়ে মাছ ধরছিলেন। তারা মেরিকে উদ্ধার করেন এবং ওই পদ্ধতি প্রয়োগে বাঁচিয়ে তোলেন। বেঁচে ওঠার পরে তিনি বিলাপ করে লিখেছিলেন 'আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি যখন মৃত্যুর জ্বালা সহ্য করে ফেলেছি, সেই সময়ে আমায় আবার অমানবিকভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এই জীবন যন্ত্রণায়'। এই ঘটনার দু-বছর পর, ১৭৯৭ সালে, মেরিকে জন্ম দেবার দশ দিন পরে তিনি সন্তানপ্রসবঘটিত জ্বরে মারা গেলেন।

মায়ের মারা যাওয়া এবং পুনরায় বেঁচে ওঠার পরের হতাশা অনেকাংশে

প্রতিফলিত হয়েছে মেরি শেলির ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে। একজন মানুষকে জোর করে মৃত্যুর দ্বার থেকে ছিনিয়ে আনার পরে হয়তো তার মানবিক গুণাবলী ভোঁতা হয়ে যায়, এই ভাবনাই খানিক ছায়া ফেলেছিল ওই গল্পতে। এর সঙ্গে জুড়ে ছিল খোদার ওপরে খোদাকারি করার আশংকা। তৎকালীন মানুষের ধারণা অনুযায়ী পরপার থেকে ফিরে আসা মানুষ সাধারণ হতে পারে না। হয় তারা ভগবান, অথবা খোদ শয়তানের প্রতিমূর্তি। এইভাবেই মেরি শেলি এঁকেছিলেন তার বিখ্যাত গল্পের দানব চরিত্রটিকে। কিন্তু যার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায় বিজ্ঞান, সে কখনওই সাধারণ কুসংস্কারের কাছে মাথা নত করেনা। তাই তার সৃষ্টি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আপাত দানবটিও মানুষের কুসংস্কারের উপরে উঠতে সক্ষম হয়। ভালো মন্দের প্রচলিত ধ্যান ধারণা মিশে গিয়ে তৈরি হয় এক কালোত্তীর্ণ ধূসর চরিত্র।

সেই সময়ের বিজ্ঞানের আর একটা নতুন তত্ত্ব মেরি শেলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে সেই প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। সেই নতুন তত্ত্বটা হল ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি/তড়িৎ-শারীরবিদ্যা। ১৭৮৬ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীকোষের ওপর তড়িতের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। সেই সময়ে এই পরীক্ষা খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না, কারণ বিজ্ঞানীরা জানতেন যে তড়িৎ প্রাণীদেহের মধ্যে দিয়ে গেলে প্রচণ্ড অঙ্গ-বিক্ষেপ সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের এই ধারণা হয় যে এর ফলেই পেশির সংকোচন হয়।

১৭৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারি, একটা স্থির-তড়িৎ যন্ত্রের সামনে গ্যালভানির সহকারী স্ক্যালপেল দিয়ে একটা মৃত ব্যাঙের নার্ভ স্পর্শ করেন এবং আকস্মিকভাবে ব্যাঙের পা-টা লাফিয়ে ওঠে। তা লক্ষ করে গ্যালভানি ওই পরীক্ষাটা আবার করেন এবং একই ফল পান। এরপরে তিনি আরও বিভিন্ন পরীক্ষা শুরু করেন। প্রতিটা পরীক্ষায় তিনি একই রকম পেশি সংকোচনের ফলাফল পান। আরও লক্ষ্য করেন যে ব্যাঙের পা যখন পেতলের হুক থেকে ঝুলছে এবং নিচের লোহার জালি স্পর্শ করছে, সেগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। এবার তিনি পেতল এবং লোহার একটি দ্বিধাতব পাত তৈরি করে এবং দেখেন যে ব্যাঙের পা যখন সেই পাত স্পর্শ করছে, পেশি সংকুচিত হচ্ছে।

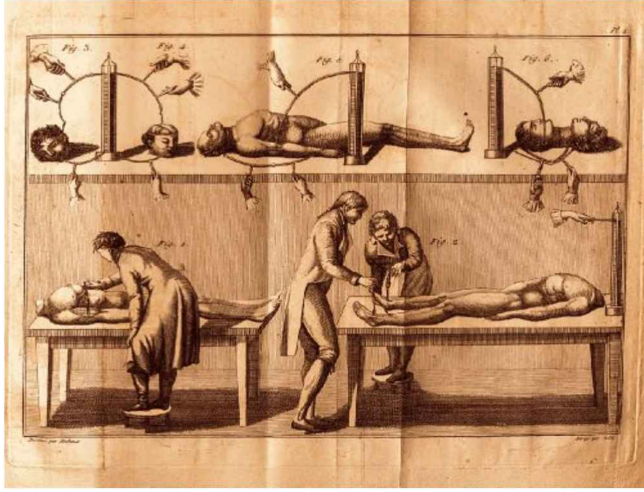
এই পরীক্ষা থেকে গ্যালভানির ধারণা হয় যে এই বিদ্যুৎ ব্যাঙের শরীরের

মধ্যেই রয়েছে। তিনি এই বিদ্যুতের নাম দিয়েছিলেন 'প্রাণী-বিদ্যুৎ'। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই দ্বিধাতব পাতটা কেবলমাত্র ব্যাঙের শরীর থেকে স্নায়ুতে তড়িৎ সঞ্চালনে সাহায্য করছে। ১৭৯১ সালে এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করেন এবং জানান যে প্রাণীর পেশি এবং স্নায়ুতে রয়েছে সুপ্ত তড়িৎশক্তি। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'ব্যাঙ-নাচানে' অধ্যাপক নামেই।

সেই সময়ে ইটালিয়ান পদার্থবিদ ও রসায়ন বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টা গ্যালভানির পরীক্ষা দেখে উপলব্ধি করেন যে, আসলে ওই ব্যাঙের পা দুটো একই সঙ্গে তড়িতের বাহক ও শনাক্তকারী হিসেবে কাজ করছে। তিনি ব্যাঙের পা এর বদলে ব্যবহার করেন লবণাক্ত-কাগজ এবং তড়িৎ প্রবাহ লক্ষ্য করেন। পরে সেখান থেকেই তিনি আবিষ্কার করেন প্রথম স্থির তড়িৎ-ব্যাটারি।

কয়েক বছর পরে, গ্যালভানির ভাইপো জিওভানি আলদিনি তার কাকার আবিষ্কারের সঙ্গে ভোল্টার আবিষ্কার যোগ করে বেশ কিছু নাটকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সমগ্র ইউরোপ ঘুরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তিনি কিছু প্রাণীর শরীরের অংশবিশেষ নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করে সেগুলিকে উদ্দীপিত করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি মৃত মোষের মাথা নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করে চোখ খোলা-বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যা দেখে দর্শক চমকপ্রদ হয়েছিল।

আলদিনির সবচেয়ে কুখ্যাত প্রদর্শন ছিল ১৮০৩ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অফ্ সার্জেনস্'-এ জর্জ ফস্টার নামের এক কুখ্যাত অপরাধীর, যে তার স্ত্রী এবং সন্তানকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছিল। মৃত্যুদণ্ডের পরে তার মৃতদেহের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করা হয়। তার মুখের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণের ফলে চোয়াল এবং চোখ খুলে গিয়েছিল। দর্শকেরা অবাক চোখে দেখছিল যে মৃতদেহে যেন প্রাণ ফিরে আসছে। পরের দিনের সংবাদপত্রে কার্টুন প্রকাশিত হল যে আলদিনি নরকের পিশাচের হাত থেকে ফস্টারকে ফিরিয়ে আনছে। জলে ডুবে মৃত্যুর পরে বেঁচে ওঠার আগের উদাহরণগুলোর মতো, আলদিনির এই প্রদর্শন মানুষের মনে প্রাণ নিয়ে নতুন ধরনের বিজ্ঞান ও দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল।

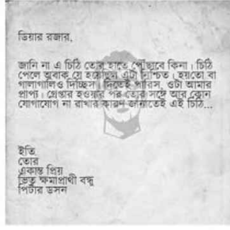


১৮১৮ সালে স্কটিস চিকিৎসক অ্যানড্রু ইউরে একই রকম পরীক্ষা করেন খুনে ম্যাথিউ ক্ল্যাডেসডেল-কে ফাঁসি দেবার পরে তার মৃতদেহ নিয়ে। তিনি দাবি করেন মৃতদেহের মধ্যচ্ছদার স্নায়ুকে তড়িৎ দ্বারা উদ্দীপিত করে মৃত মানুষকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব।

১৮১৬ সালে মেরি শেলি যখন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গল্পের খসড়া তৈরি করেন, তখন ইউরোপের বিজ্ঞান চেতনা ছিল এইরকম প্রায়। মেরি শেলি থাকতেন জেনেভা লেকের সামনে একটি ভাড়াবাড়িতে, তাঁর স্বামী জগতবিখ্যাত কবি পার্সি বিস্ শেলির সঙ্গে। পার্সি বিস্ শেলিও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যামেচার কেমিস্ট। নিজের ল্যাবেরটরি ঘরে সামান্য কেমিক্যাল নিয়ে নানা পরীক্ষা করতেন তিনি।

তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন লর্ড বায়রন এবং তাঁর চিকিৎসক জন পলিডরি। মেরি শেলি বা অন্যান্য প্রতিবেশীদের বাড়িতে মাঝে মধ্যেই আড্ডা বসত। সেখানে আলোচনা হত বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়, বাদ যেত না ওই সময়কার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোও। এর মধ্যে গ্যালভানির পরীক্ষাও ছিল। মেরি শেলির ডাইরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে তিনি লন্ডনে একদিন তড়িৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ে একটি সেমিনার শুনেছিলেন। তাঁর মূল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে তিনি ‘ইলেক্ট্রিসিটি’ কথাটি একবারও ব্যবহার করেননি। কিন্তু ১৯৩১ সালের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে গ্যালভানির পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন মৃতকে প্রাণদানের ক্ষেত্রে।

জেনিভা লেকের পার্শ্ববর্তী বাড়িটায় আড্ডার সময়, একদিন বায়রন সবাইকে একটা করে ভূতের গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। বিজ্ঞান এবং রূপকথা মিশিয়ে মেরি শেলি তৈরি করলেন এমন এক গল্পের যা এর আগে কেউ করেনি। যা পাঠককে মুগ্ধ করল আবার ভয়ও দেখাল পরবর্তী দুশো বছর ধরে। তৈরি হল এক যুগোত্তীর্ণ চরিত্র, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।


ডিয়ার রজার,

জানি না এ চিঠি তোর হাতে পৌঁছাবে কিনা। চিঠি পেলে অবাক যে হয়েছিস এটা নিশ্চিত। হয়তো বা গালাগালিও দিচ্ছিস। দিতেই পারিস, ওটা আমার প্রাপ্য। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তোর সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ না রাখার কারণ জানাতেই এই চিঠি...

ইতি
তোর
একান্ত প্রিয়
ভিতু ক্ষমাপ্রার্থী বন্ধু
পিটার ডসন

ডসনের চিঠি

প্রতিম দাস

১৬ নভেম্বর ২০১৫

অবশেষে সমাধান হল রজার পিটারসন রহস্যের, আজ। ওঁর মৃত্যুর সাত দিন পর। পিটার ডসনের চিঠিটা পাওয়ার পর। না, এভাবে শুরু করলে আপনারা কী করে বুঝবেন? চলুন যাওয়া যাক ওর মৃত্যুর ঠিক পরের দিনটিতে।

৮ নভেম্বর ২০১৫

বিশ্বাস করুন ও আমাকে খুন করেছিল— ধরা পড়ার পর থেকে একটা কথাই সমানে বলে গিয়েছিল রজার। রজার পিটারসন।

গতকাল রাত ১টা বেজে ৫৮ মিনিটে বাথরুম যাওয়ার পথে কোনওভাবে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে রজার। দীর্ঘ ৭২ বছর এই অ্যাসাইলামে থাকার পর। ১৮ এপ্রিল ১৯৪৩— যেদিন গ্রেপ্তার হয় সেদিন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত। যে কথায় কেউ কোনওদিন বিশ্বাস করেনি। আমিও করিনি। আজ ডায়েরিটা পড়ার পরেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

আট বছর আগে শৈল শহরের প্রান্ত দেশে এই মেন্টাল অ্যাসাইলামটায় আমি বদলি হই। রাঁচি থেকে এখানে পাঠান হয় আমাকে। মাত্র ২৯ জন অসুস্থ মানুষ ছিল। আট বছরে সংখ্যাটা বেড়ে ৩৪ হয়েছে। এখন অবশ্য ৩৩। এখানকার সবচেয়ে প্রবীন ছিল রজার। ২০০৭ এ ওঁর বয়েস ছিল ৯০। কেস হিস্ট্রিটা পড়েই আলাদা একটা আগ্রহ তৈরি হয় ওঁর বিষয়ে।

খুন করার দায়ে আজীবন কারাদন্ড— কারাবাসের বদলে পাগলা গারদ। ফাঁসিই হত হয়তো— হয়নি অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং সম্ভবত ব্রিটিশ বলে। রজার যাকে খুন করেছিল, সেই নাকি খুন করেছিল রজারকে। অদ্ভুত এই কথাটির জন্যই আদালত রজারকে পাগল বলে রায় দেয়।

আচার-আচরণ কথাবার্তা একেবারে স্বাভাবিক, শুধু ওই কথাটি ছাড়া।

প্রতিদিন ওঁকে এক নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কষ্টকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হত। রাত ১টা বেজে ১০ মিনিটে। ওই সময় ওঁর গোটা শরীর শক্ত হয়ে যেত। অনেকটা মৃগী রোগীদের মতো। মিনিট ৪৫ স্থায়ী হত অবস্থাটা। তারপর আবার স্বাভাবিক। কোনও মেডিসিনেই এর সুরাহা করা যায়নি।

দেখে মনে হত নারজারের বয়স নয়ের কোঠায়। ৪০ এর বেশি তো মনেই হত না। একবার জানতেও চেয়েছিলাম, রহস্যটা কী রজার? উত্তরে হেসে বলেছিলেন, অভিশাপ। শ্যামলালের অভিশাপ। আমার মৃত্যু নেই ডাক্তার। আই অ্যাম ইমমরটাল। আমি অমর।

গত ৮ বছরে ওঁর সঙ্গে একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ওঁকে দেখলেই আমার বৃদ্ধ বাবার কথা মনে পড়ে যেত। ও কি চোখে আমায় দেখত তা অবশ্য বলতে পারব না। তবে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁর অনেক ব্যক্তিগত কথাই আমি জানতে পেরেছিলাম।

রজারের বাবা জ্যাক পিটারসন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ ছিল কর্মস্থান। সেখানেই বানিয়েছিলেন বাড়ি। ভারতেই শেষ জীবন কাটানোর ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছেপূরণ হয়নি। রজারের কলেজ জীবন শেষ হওয়ার আগেই আকস্মিক হৃৎ-গোলযোগে দেহাবসান হয় তার। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ভাই বোন না থাকায় ঝাড়া হাত-পা স্বাধীন জীবন হয়ে যায় রজারের। এর পরেই বিশেষ কাজে ভারতে আসেন রজার এবং ঘটনা চক্রে আজ সে মানসিক অ্যাসাইলামের চিরস্থায়ী সদস্য।

মাস পাঁচেক আগের একদিন রজার আমাকে বলল, সঞ্চিতা আমাকে একটা পুরানো ডায়েরি আর গোটা কতক কলম দিতে পারবে? আর হ্যাঁ একটা ব্রাউন এনভেলপ যাতে ওই ডায়েরিটা ঢোকান যায়।

ঠাট্টার ছলে বললাম, আত্মজীবনী লিখবেন না কি মিঃ পিটারসন?

শুনে আমার হাতটা চেপে ধরে এমন একটা কণ্ঠস্বরে 'প্লিজ সঞ্চিতা' বলল যে, আর কিছু বলতে পারলাম না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দিলাম একটা ডায়েরি। পুরানো নয় নতুনই। আর কিছু ইউজ এন্ড থ্রো পেন এবং একটা এনভেলপ।

ঘণ্টা তিনেক আগে সেই ডায়েরিটা আমাকে দিয়ে গেছেন ওয়ার্ড মাস্টার। কারণ ওটা ঢোকান ছিল সেই ব্রাউন পেপারের এনভেলপে। ওপরে বড় বড় করে লেখা – ONLY FOR DR. SANCHITA।

ডায়েরিটার মাস ছয়েকের পৃষ্ঠা ব্যবহার হয়েছে। প্রথম দু-মাসের পাতায় কিছুই প্রায় লেখা নেই। নাহ্ ঠিক বলা হল না কথাটা! লেখা আছে ইংরেজি অক্ষর abcd। প্রথম দিকে বাচ্চাদের মতো আঁকাবাকা বড় বড়। তারপর ছোট হয়েছে স্বাভাবিক লেখার আকারে। আসতে আসতে হয়েছে পাঠযোগ্য।

মূল লেখার শুরু এভাবে...

'Almost after a long 70 years...

... প্রায় ৭০ বছর বাদে... লিখতে চেষ্টা করে দেখলাম কিছুই পারছি না। অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য শুধুমাত্র অনভ্যাস নয় নতুন ধরনের এই কলমগুলিও অন্যতম কারণ। তবে অভ্যাসে কী না হয়। দু-মাস ধরে চেষ্টার ফল এই লেখা। অনেকটা আয়ত্তে এসেছে, তবুও হয়তো পড়তে অসুবিধা হবে তোমার।

বিশ্বাস কর সঞ্চিতা যাকে আমি খুন করেছিলাম, সেই আমাকে খুন করেছিল। ভাবছো তো আবার সেই পাগলের প্রলাপ। অনুরোধ একটাই, কষ্ট করে গোটাটা পড়ে তবেই রায় দিয়ো...'

পড়েছি সবটা। কিন্তু আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা আছে লেখাটায়। সেসব বাদ দিয়ে মূল ঘটনা সাজিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সামনে। বিশ্বাস যেমন করতে পারছি না, তেমনি প্রশ্নও জাগছে মনে— একজন ৯০+ বয়সি মানুষ কি শুধু শুধু এক গাদা মিথ্যে কথা লেখার জন্য কষ্ট করে আবার লেখা শিখলেন?

রজার পিটারসন এবং পিটার ডসন। দুজনের নামের মধ্যে পিটার কথাটা থাকা এবং বিভিন্ন পছন্দে মিল থাকায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বন্ধুত্ব জমে উঠতে সময় লাগেনি খুব বেশি। প্রথম জন খাঁটি ব্রিটিশ, দ্বিতীয় জন জন্মসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকান, রক্তে ব্রিটিশ।

দুই বন্ধুরই অন্যতম প্রিয় বিষয় প্রাণ রহস্য। সময় পেলেই ওরা এ নিয়ে আলোচনা করত। এর মধ্যেই ওদের হাতে এসে যায় মেরি শেলির যুগান্তকারী রচনা 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'। পড়ার পর দুজনেরই বিশ্বাস দৃঢ় বদ্ধ হয় যে বৈদ্যুতিক শক দ্বারা মৃত প্রানীকে জীবিত করা সম্ভব। অবশ্য শুধুমাত্র শক দিলেই হবে না, কিছু রাসায়নিক উপাদানও দেহে প্রয়োগ করতে হবে। তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে। একদিন খাতায় কলমে তারা প্রমাণ পায় তাদের ভাবনা একদম সঠিক।

এবার রজারের ডায়েরি থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ:

... ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাওয়ার পর চারটেদিন ধরে অনেক ভাবলাম। খাতায় কলমে যা সত্যি তার বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্রিটেনে সম্ভব নয় অতএব...

ডসনকে জানালাম সে রাজি থাকলে গবেষণার বাকি কাজটা ভারতে গিয়ে করবো। এক কথায় রাজি হয়ে গেলও। শুধু গবেষণা নয় ভারত ভ্রমনের ইচ্ছেও ওর অনেক দিনের।

দু'সপ্তাহ হল এসে পৌঁছেছি ভারতে। খোঁজখবর নিয়ে জোগাড় হয়েছে একটা বাড়ি। বাবার তৈরি বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। কোনও এক মিঃ রবার্ট বানিয়ে- ছিলেন। চারদিকে জঙ্গল। নির্জন। আমাদের গবেষণার পক্ষে আদর্শ। কিনেই নিলাম বাড়িটা।

আগামী সপ্তাহেই এসে যাবে সব সরঞ্জাম। মৃত পশুপাখি জোগাড় করে রাসায়নিক তরলে সংরক্ষণ করছি।

ভারতে আসার পর দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর। একের পর এক পরীক্ষায় সফল আমরা। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হচ্ছে না নবজন্ম। কেবলমাত্র আমরা দুজনে বুঝতে পারি এমন সাংকেতিক ভাষায় লিখে রাখছি গবেষণার খুঁটিনাটি। এই লেখার শেষে সেই সংকেত ও তার মানে লিখে রাখব, মিরাকলের আশায়। যদি কোনওদিন কোনওভাবে নদীর জলে ভেসে যাওয়া গবেষণার নোটস ফিরে পায় কেউ!

১৫ এপ্রিল ১৯৪৩

গতকাল এখানকার এক আদিবাসী যুবকের মাধ্যমে এক ৪৮-৫০ বছরের মানুষের মৃতদেহ জোগাড় করা গেছে। কৃতিত্ব প্রাপ্য ডসনের। ইতিমধ্যেও বেশ ভালো হিন্দী রপ্ত করে নিয়েছে। আমিও কাজ চালান গোছের পারছি।

মৃতদেহটা থেকে গন্ধ ছাড়ছে। শক্তও হয়ে গেছে। দিন দুয়েকের মরা মনে হল। ৩০০ টাকা নিল যুবকটা। ভাবভঙ্গী ভালো লাগল না যুবকের। কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব চোখে। বৃদ্ধটির মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। রক্ত শুকিয়ে চুলে দলা বেঁধে গেছে। খুন বলেই মনে হচ্ছে। আমি সন্দেহের কথাটা ডসনকে বলতেই, ও বলল, ডোন্ট ওরি।

১৬ এপ্রিল ১৯৪৩

রাত ১১টা ৫৬ মিনিটে নবজন্ম দিয়েছি মানুষটাকে। মাথার কাটা দাগ

মিলিয়ে গেছে। চুড়ান্ত শক দেওয়ার ৪১ মিনিট বাদে চোখ খোলে লোকটি। হার্টবিট আরও ১৩ মিনিট সময় নেয় স্বাভাবিক হতে। চেতনা ফিরে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল লোকটি। স্বাভাবিক। আমরাও পৌঁছে গিয়েছিলাম উত্তেজনার চরমে। পরীক্ষার নিশ্চিত সাফল্য দেখে। বাকি ২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট আমি দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তন নোট করে গিয়েছি সমানতালে।

ডসন যখন শ্যামলাল (লোকটির নাম) কে সব কথা জানাল, তখন ভয় অবিশ্বাস মেশানো অভিব্যক্তিতে ছেয়ে গেল মানুষটার মুখটা। বিস্ময়ের রেশ কেটে যাওয়ার পর একটানা অনেক কথা বলে গিয়েছিল শ্যাম। তার ভেতর আসল কথা ছিল একটাই। ভগবানের নিয়মের ওপর হাত চালানো উচিত নয়। কথাটা বুঝতে পেরে হেসে উঠেছিলাম আমি। কারণ আমি জানি, ভগবান-টগবান সব মিথ্যে। আসলে নিয়মমাফিক কিছু জৈবিক ক্রিয়ার একত্রতার ফসল হল প্রাণ। ডসন কিন্তু হাসেনি। উলটে আমাকে ধমকে উঠেছিল— রজার ইউ শুড্ নট লাফ
অ্যাবাউট দ্য ফেইথ অব আ পার্সন।

—মুঝে ছোড় দিজিয়ে সাব। মুঝে ঘর জানা হ্যায়।

প্রাণ ফিরে পাওয়ার ৭ ঘণ্টা ২১ মিনিট বাদে বলল শ্যামলাল।

সম্ভব নয়, জানালাম আমি।

—কিঁউ?

—তোমার আয়ু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

—তো ফির মুঝকো পহেলে জ্যায়সা বনা দিজিয়ে। মার ডালিয়ে হামে।

—সেটাও সম্ভব নয়।

—কিঁউ সাব, কিঁউ?

—আমাদের গবেষণার মানে কাজের স্বার্থে।

—হে ভগওয়ান। ভাগমারি গই হামার। ইয়ে কাহা ফাঁসা দিয়া হামে।

দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছিল শ্যামের চোখ দিয়ে।

আরও ১১ ঘণ্টা পর...

সহসাই কেশে উঠল শ্যামলাল। সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে গেল গালের চামড়া। কিন্তু কোনও রক্ত বের হল না।

ঘর ঘরে স্বরে শ্যামলাল বলল, বহুত তকলিফ হো রহা হ্যায় সাব। বহুত

কষ্ট হো রহা হ্যায়। ভগওয়ান আপকা ভালা করেগা, মুঝে মার ডালিয়ে। ইয়ে মেহেরবানি কিজিয়ে সাব।

ডসনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেও। বললাম, কেন অযথা অনুরোধ করছ শ্যাম। যাকে জীবন দিয়েছি তাকে মারতে পারব না।

শুনতে পেলাম ডসনের গলা, ডু ইট রজার। অ্যাজ হি উইশ।

—আর ইউ ক্রেজি ডসন? দিস ইজ আ ওয়ার রিসার্চ। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল!

—প্লিজ রজার।

—নো মোর ওয়ার্ড ফ্রেন্ড।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় শ্যামলালের দেহের অনেকগুলো জায়গা ফেটে ফেটে গেল, যদিও কোনও রক্ত বেরল না। মাথার পেছনের কাটা দাগটা আবার পরিস্ফুট হয়েছে। শ্যাম সমানে একই আর্জি জানিয়ে চলেছে। আমি সিদ্ধান্তে অনড়। ডসন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

শ্যামলাল আমায় ডাকল, রজার সাব জরা শুনিয়ে।

কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল ওর তখন। জড়িয়ে যাচ্ছিল উচ্চারণ। গেলাম কাছে।

—সাব ইয়ে আখরি বার ক্যাহ রাহা হু, মুঝে মার ডালিয়ে?

—ওহ গড... কী করে যে তোমায় বোঝাই? আমি পারব না।

—সাব মেরা বাত মান লিজিয়ে। উপরবালেকে কানুন মে হাত মত দালিয়ে। নেহিতো একদিন এ্যায়সা আয়েগা জব আপ খুদ মওত কে ভিখ মাগেঙ্গে আউর মওত নেহী মিলেগা।

বুঝলাম আর কোনও উপায় না দেখে মেন্টাল প্রেসার দিতে চাইছে শ্যাম। তাই পাত্তা না দিয়ে সরে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে। ডিয়ার সঞ্চিতা, সে দিন ওর কথা মানলে হয়তো আজ আমাকে এই লেখা লিখতে হত না।

২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার ১০ মিনিট আগে ফিরে এসেছিল ডসন। ততক্ষণে কমে গিয়েছিল শ্যামের হৃৎপিণ্ডের গতি। রক্ত চাপ। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল শরীরের সজীবতা। ভাঙতে পারিনি সময়ের অমোঘ বন্ধন। ঠিক ২৪ ঘণ্টাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সব।

একই দেহে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় কোনও ফল হয় না জেনেও আরও একবার চেষ্টা করেছিলাম জীবন দানের। কোনও লাভ হয়নি।

২৪ ঘণ্টারও বেশি সময়ের টানটান স্নায়ুচাপের পর সারা শরীর অবসন্ন বোধ করছিল। দরকার ছিল বিশ্রামের। গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র সব কালো চামড়ার ফোলিও ব্যাগে পুরে ডসনকে বললাম, আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি সব বন্ধ করে এস।

—এতো রাতে কি না ফিরলেই নয় রজার?

—না বন্ধু, আর পারছি না। শরীর আরাম চাইছে। দীর্ঘপথ চলার শেষের আরাম।

—দেন ওকে, অ্যাজ ইউ উইশ। গুড নাইট।

—গুড নাইট ডিয়ার ফ্রেন্ড। সি ইউ টুমরো।

—ইউ টু।

বাড়ি ফেরার পথটা একটু আঁকাবাঁকা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। জমাট অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ। সঙ্গে অচেনা রাতচরা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। তিন ব্যাটারীর টর্চটা জ্বালিয়ে অভূতপূর্ব ঘটনাটির কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছি। সহসা পেছনদিকে কেমন যেন একটা আওয়াজ শুনলাম বলে মনে হল। দাঁড়িয়ে গেলাম। থেমে গেল শব্দটাও। তবু সন্দেহ হওয়াতে ঘুরে দাঁড়ালাম। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম সেই যুবকটিকে। যে শ্যামলালের মৃতদেহ এনে দিয়েছিল। হাতে একটা লাঠি। গোটা শরীরটা কেঁপে উঠলো অদ্ভুত আশঙ্কায়। অশুভ কিছু একটা যেন হতে চলেছে। ঝোলানো ব্যাগটা বুকের কাছে চেপে ধরলাম। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল টেনিস বলের মতো। নিজের কানে নিস্তব্ধ রাতে শুনতেও পাচ্ছিলাম তার শব্দ।

কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম– হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট... কেয়া চাহিয়ে?

হাত তুলে ব্যাগটা দেখিয়ে বলল – উয়ো থলিয়া।

—ইস্মে কুছ নেহি হ্যায়। অনলি সা...

—বাত মত বাড়াইয়ে। ও দে দিজিয়ে...

গবেষণার সব কাগজ ওই ব্যাগে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ওই ব্যাগ তখন আমার কাছে। বললাম, তুম কাল বাংলো মে আ জাও। যো কুছ বোলনা হ্যায় উহা পর বোলনা।

কর্কশ হিংস্র স্বরে বলল, আপও থলিয়া দেগা কে নেহি? মুঝে আচ্ছি তরাহ সে মালুম হ্যায় উস্মে বহুত সারে রুপিয়া হ্যায়।

—নেহি নেহি তুমকো গলতি হো রহা হ্যায়। ইস্মে থোড়া কাগজাদ...

—ঝুট মত বোলিয়ে! সিধাসিধা দে দিজিয়ে নেহি তো ...

—নেহি তো কেয়া হোগা?

এক পা এগিয়ে এল যুবকটি। লাঠির মাঝখানটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে একবার ঘুরিয়ে টান দিতেই বেরিয়ে এল চকচকে জিনিসটা। একটা সরু লোহার লম্বা ফলা। ভারতে একে বলে গুপ্তি। বুঝে গেলাম কী হতে চলেছে। দু'পা পিছিয়ে ঘুরে পালাতে গিয়ে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই শিরদাঁড়ার পাশে তীক্ষ্ণ ফলাটা ঢুকে গেল বুঝতে পারলাম। টর্চের আলো থাকা সত্বেও আমার চোখে নেমে এল একরাশ কালো অন্ধকার।

রজারের ডায়েরির পরের কিছু পাতার লেখনীর সারমর্ম:

দুর্ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার মিনিট ২৫ বাদে ডসন সব গুছিয়ে গবেষণাগার বন্ধ করে ফেরার পথে রক্তাক্তও মৃত অবস্থায় পায় রজারকে। কালো চামড়ার ব্যাগটা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আবার গবেষণাগারে ফিরে যায় ডসন। অবশ্যই রজারের মৃতদেহ নিয়ে। পর পর নিয়ম মেনে প্রয়োগ করে সঞ্জীবনী শক। জীবন ফিরে পায় রজার। ডসনের কাছ থেকে জেনে নেয় যুবকটির বাড়ির ঠিকানা। কোনও কথা শোনে না ডসনের। ভোরের আলো ফোটার সামান্য পরেই পৌঁছে যায় যুবকটির বাড়ি। প্রথমে সামনে আসতে রাজি না হলেও, রজারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে কথা বলতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। জানায় টাকা পয়সা কিছু না পেয়ে ব্যাগটা নদীতে ফেলে দিয়েছে। এটা শুনেই মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে রজারের। ব্যাগটা পেলে যা হয়তো হত না, সেটাই ঘটে যায়। ভয় দেখাবে বলে নিয়ে আসা রিভলবারটা বার করে সকলের চোখের সামনে গুলি করে মারে যুবকটিকে।

পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে আসার ঘণ্টাচারেক বাদেই রজারকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। ইচ্ছে ছিল না মোটেই, সামান্য এক নেটিভ খুনের দায়ে রজারকে গ্রেপ্তার করার। কিন্তু তখন দেশ জুড়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ। অতিরিক্ত ঝামেলা না বাড়াতেই ওরা এটা করে। কোনও কথা না বলে ধরা দেয় রজার। কারণ সে জানত কেউই তার আর কিছু করতে পারবে না, আইন তো নয়ই। পৃথিবীতে তার মেয়াদ আর কিছু ঘণ্টা।

আবার রজারের ডায়েরি থেকে:

'বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। এক সময় পেরিয়ে গেল ২৪ ঘণ্টা। কোথায় মৃত্যু? কোথায় কষ্ট? আরও বেশি সুস্থ সতেজ মনে হচ্ছিল নিজেকে।

মাঝে মধ্যেই চলছিল মামুলি পুলিশি জেরা। ব্রিটিশ বলেই কোনও

শারীরিক নির্যাতন করেনি ওরা আমার ওপর। একটাই প্রশ্ন ওদের, কেন খুনটা করলাম আমি? কোনও উত্তর দিইনি প্রথম দিকে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টাতেও যখন কিছু হল না, তখন সত্যি কথাই বললাম। ওই যুবকটা আমাকে খুন করেছিল তারই প্রতিশোধ নিতে আমি এই কাজ করেছি। ওদের চোখগুলো প্রথমে বিস্ফারিত হল বিস্ময়ে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই আমি ওই একটা কথাই বলে গেলাম।

একই প্রশ্ন একই উত্তর। সারাদিন চলল একই ঘটনা। ডসন কিন্তু একবারও এল না। ঠিকানা জানিয়ে বললাম খোঁজ নিতে। ওরা জানাল তালা ঝুলছে মিঃ ডসনের বাড়িতে। আমার নিজের বাড়িতেও কেউ আসেনি।

স্বাভাবিকভাবেই ওদের চোখে আমি অপ্রকৃতস্থ সাব্যস্ত হলাম। আদালতও একই রায় দিল। আমার নতুন ঠিকানা হল মেন্টাল অ্যাসাইলাম।

ডসন আমাকে নবজন্ম দিয়েছিল রাত ১টা বেজে ১০ মিনিটে। মাস কয়েক পর থেকে ঠিক ওই সময়ে প্রতিদিন আমার শরীরে এক এমন টানাপোড়েন শুরু হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শ্যামলালের মতোই মৃত্যু কামনা করি ওই সময়টায়। কিন্তু মৃত্যু আমাকে ছুঁয়েও দেখে না। আত্মহত্যা করার মতো মানসিক দৃঢ় আমি নই।

দিন দিন আমার শরীর আরও সজীব হচ্ছে।

সঞ্চিতা যদি তোমার আগে আমার মৃত্যু হয় তবেই এ রহস্য তুমি জানতে পারবে। নচেৎ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও... জানি না সে অপেক্ষা হবে কতদিনের।'

লেখার শেষ এখানেই। এরপরে কিছু সঙ্কেতও তাদের মূল অর্থ লেখা আছে। যা আর কোনওদিনই কাজে লাগবে না।

রজারের মৃত্যুর ২ দিন পর:

কেন বেঁচে গিয়েছিল রজার? কেন বারবার পরীক্ষিত ফলাফল পালটে গিয়েছিল আবিষ্কারকের বেলায়? এসব উত্তর হয়তো কোনওদিনই জানতে পারতাম না, যদি না রজারের কেস হিস্ট্রি ফাইলটা আবার আমার হাতে আসত। ওর মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেটটা রাখতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা পাতা উলটানোর সময় চোখে পড়ল নোটটা। রাঁচির পাগলা গারদে থাকে ২১তম বছরে একটা চিঠি এসেছিল রজারের নামে। কে পাঠিয়েছিল জানা যায়নি। কিন্তু এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা? তবে কী?

খোঁজ নিয়ে জানলাম চিঠিটা এখনও রাঁচিতেই আছে।

আরও ৪ দিন পর।

অপেক্ষার অবসান। ঘণ্টা দুয়েক আগে চিঠিটা হাতে পেয়েছি। সে সময়ে খুলে দেখেছিলেন ওখানকার আধিকারিকেরা। কিছু বুঝতে না পেরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গোয়েন্দা দপ্তরে। তার প্রমাণও আছে। কিন্তু ওরাও বিফল হয়েছিল রজারদের সঙ্কেত ডিকোড করার ক্ষেত্রে।

ডায়েরিতে রজারের লিখে যাওয়া সঙ্কেতলিপি কাজে লেগে গেল এবার।

আমার অনুমান সঠিক, চিঠিটা পিটার ডসনের।

ডিয়ার

রজার

জানি না এ চিঠি তোর হাতে পৌঁছাবে কি না? চিঠি পেলে অবাক যে হয়েছিস এটা নিশ্চিত। হয়তো বা গালাগালিও দিচ্ছিস। দিতেই পারিস, ওটা আমার প্রাপ্য। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তোর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ না রাখার কারণ জানাতেই এই চিঠি লিখলাম। এটাও জানি না একথাগুলো কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে তোর কাছে। সেদিন আমার সাক্ষ্য তোকে পাগলা গারদ থেকে বাঁচাতে পারলেও কারাবাস তোর হতই। কারণ খুন যে তুই করেছিলি এটা তো সত্যি। আরও বড় সত্যি হল, আমি ভয় পেয়েছিলাম। যে সময়ে আমরা ভারতে ওই পরীক্ষা করছিলাম, সে সময়ের পক্ষে ওই গবেষণা অনেক এগিয়ে থাকা সময়ের। যুগে যুগে যা হয়েছে আমাদেরও তাই হত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ হয় ডাইনীবিদ্যা অথবা ঈশ্বরের বিরোধিতা করার অপরাধে আমাদের মেরে ফেলত। কোনও আইনই আমাদের বাঁচাতে পারত না জনরোষ থেকে।

এ ছাড়াও বেআইনিভাবে জোগাড় করা শ্যামলালের মৃত দেহটার পক্ষে কোনও সঠিক যুক্তি ওই সময়ে দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। আরও একটা খুনের দায় চাপত। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ আমি বন্ধুকৃত্য পালন করিনি। ক্ষমা চাইছি তার জন্য। করা বা না করা, তোর হাতে।

অবশ্য আরও একটা যুক্তি আমার আছে, নিজের সাফাইয়ের জন্য। একটা প্রশ্নের সমাধান করা। সেটা হল, তোর জীবন রহস্য। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েও কীভাবে বেঁচে থাকলি তুই? এর উত্তর খুঁজে বের করার আগ্রহও আমার পালিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বিগত বছরগুলোতে আবার কেঁচে

গণ্ডূষ করেছি। গবেষনার সব কাগজপত্র তো ওই হতভাগাটা জলেই ফেলে দিয়েছিল। নাহ্ নতুন করে কাউকে জীবন দেওয়ার চেষ্টা করিনি। অত আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। তাই খাতায় কলমেই শুরু করি উত্তর খোঁজার কাজ। পেয়েছি সম্ভাব্য উত্তর। আর তাই এই চিঠির অবতারণা।

আমরা শ্যামলাল পর্যন্ত যতগুলো পরীক্ষা করেছিলাম সবগুলোই দুই বা তিন দিনের পুরানো মরদেহ ছিল। দেহ এবং মস্তিষ্ক কোষেরা সম্পূর্ণভাবে মৃত। হারিয়েছে কর্মক্ষমতা। আমাদের তৈরি রাসায়নিক তাকে সাময়িক উজ্জীবিত করছিল মাত্র। যার ফলে শক পেয়ে কাজ শুরু করলেও, ওরা পারেনি নতুন করে কোষ গঠন করতে। ফলে নবজন্ম কখনই দীর্ঘায়িত হয়নি।

তোর ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটেছিল সম্পূর্ণ আলদা রকম। মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছিল তোর শরীরে। দেহ ও মস্তিষ্ক কোষেরা তখন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। আমাদের রাসায়নিক অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে দেয় ওগুলোকে। বাকি কাজটা ওরাই করে নেয়। আমার অনুমান সঠিক হলে তোর শরীরে বয়সের ছাপ পড়বে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ধীর গতিতে। কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে, তোর মৃত্যু যে কবে হবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকবে না।

ওকে বন্ধু, এখানেই থামলাম। আরও একবার ক্ষমা চাইছি। সঙ্কেত মাধ্যমেই লিখলাম। আশা রাখছি ভুলে যাসনি।

তোর
একান্ত প্রিয়
ভিতু ক্ষমাপ্রার্থী বন্ধু
পিটার ডসন
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

সমকালীন বিজ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে মেরি উলস্টনক্রাফট শেলির জীবনের তুলনামূলক কালক্রম

সাল	ঘটনাপঞ্জী
১৭৪৫	এভাল্ড ইয়ুরগেন জর্জ ভন ক্লাইস্ট, লাইডেন জার নামে প্রথম ক্যাপাসিটার বা ধারক আবিষ্কার করেন।
১৭৫২	পেন্সিলভ্যানিয়া গেজেট পত্রিকায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন যা প্রমাণ করে যে বজ্রপাত আসলে বৈদ্যুতিক শক্তিরই প্রকাশ।
১৭৬১	মিখাইল লোমোনোসভ শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডল আবিষ্কার করেন।
১৭৬১	জোসেফ ব্ল্যাক লীনতাপের ব্যাখ্যা দেন।
১৭৬৩	টমাস বেইসের উপপাদ্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর দু বছর বাদে। যা থেকে ক্রমে গাণিতিক সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিশার সূচনা হয়।
১৭৭৪	চার্লস মেসিয়েরের মহাজাগতিক নানা বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করেন পরবর্তীকালে যে তালিকায় ছায়াপথ, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নীহারিকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
১৭৭৮	আন্তোয়াঁ ল্যাভয়সিয়র এবং জোসেফ প্রিস্টলি অক্সিজেন আবিষ্কার করেন যার ফলে পুরানো ফ্লজিস্টন মতবাদ বাতিল হয়ে যায়।
১৭৮০	লুইজিগ্যালভানি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে বিশেষ ধাতব বর্তনীর সঙ্গে যোগ করলে মরা ব্যাঙের পা আন্দোলিত হচ্ছে, যাকে পরবর্তীকালে জৈব-বিদ্যুৎ বলা হয়।
১৭৮১	উইলিয়াম হার্শেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন যার ফলে জানা ইতিহাসে প্রথমবার মহাবিশ্বের সীমানা বিস্তৃত হয়।
১৭৮৫	উইলিয়াম উইদারিং শোথের বা জলীয় স্ফীতির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফক্সগ্রোভ (ডিজিটালিস) এর প্রয়োগের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন।
১৭৮৭	জাঁক চার্লস (শার্ল) প্রথম আদর্শ গ্যাসের ধর্ম আবিষ্কার করেন।
১৭৮৯	আন্তোয়াঁল্যা ভয়সিয়রভরের সংরক্ষণ সূত্র লিপিবদ্ধ করেন যা থেকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সূচনা ধরা হয়।
১৭৯৬	জর্জেস কুভিয়ার প্রজাতির পুনরাবৃত্ত বিলোপ বা বিপর্যয়বাদ ধারণার প্রতিষ্ঠা করেন।
১৭৯৬	এডয়ার্ডজেনার গুটি বসন্ত রোগ নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ শুরু করেন।
১৭৯৭	মেরি উলস্টনক্রাফট গডউইন লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন, তারিখটা ছিল ৩০শে আগষ্ট।

১৭৯৭	মেরির জন্মের দশদিন পরে তাঁর মা মেরি উলস্টনক্রাফট মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ছিলেন এক প্রখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক এবং লেখিকা।
১৭৯৯	আলেসান্দ্রো ভোল্টা তড়িৎ-রাসায়নিক সারির আবিষ্কার করেন, যা ব্যাটারির আদি রূপ।
১৮০০	উইলিয়াম হার্শেল অব লোহিত বিকিরণ আবিষ্কার করেন।
১৮০৪	প্রথমবার অস্ত্রপ্রচারের ক্ষেত্রে রোগীকে তার আগে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করেন শল্যচিকিৎসক হানাও কাশেইসু।
১৮০৫	জন ডালটন রসায়নশাস্ত্রে পরমাণুবাদের ব্যাখ্যা দেন।
১৮০৯	প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই বিবর্তন ঘটছে এই ধারণার প্রকাশক রেন বিজ্ঞানী জঁ ব্যাপ্তিস্তে ল্যামার্ক তাঁর লেখা বিখ্যাত 'ফিলোসফি জুলজিক' বইতে।
১৮১১	অ্যামেদিও অ্যাভোগাড্রো নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসের অণুর সংখ্যা সংক্রান্ত বিখ্যাত সূত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮১২	হামফ্রে ডেভির লেখা 'এলিমেন্টস অফ কেমিক্যাল ফিলসফি' প্রকাশিত হয়, এই একই বছরে তিনি নাইটহুড পান।
১৮১৪	মেরি আর পার্সি বি শেলি ইংল্যান্ড থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে চলে যান একসঙ্গে থাকার জন্য, যদিও একমাস পরেই তাদের ফিরে আসতে হয় টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাবার ফলে।
১৮১৫	মেরি তাঁর কন্যাসন্তানের জন্ম দেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে, যদিও সেই সন্তান ছয় সপ্তাহ বয়সকালেই মারা যায়।
১৮১৬	মেরি আর পার্সি শেলির পুত্র সন্তান উইলিয়ামের জন্ম হয় জানুয়ারী মাসে; মেরির মনে তাঁর উপন্যাস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-এর একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়; মেরির বৈমাত্রেয় বোন আত্মহত্যা করেন; পার্সির প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন; বছরের শেষের দিকে মেরি আর পার্সির বিয়ে হয় সামাজিকভাবে।
১৮১৭	মেরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাস সম্পূর্ণ করেন আর তাঁর মেয়ে ক্লারার জন্ম হয়।
১৮১৮	তিন খণ্ডে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অর দ্য মর্ডান প্রমিথিউস উপন্যাস প্রকাশিত হয় লেখকের নাম ছাড়াই, যদিও বইয়ের মলাটে 'শেলি' শব্দটা ছিল যার ফলে একে পার্সি শেলির রচনা বলে অনেকে ধরে নেন; মেরির কন্যা সন্তান ক্লারার মৃত্যু হয়।
১৮১৯	ম্যালেরিয়ার কারণে পুত্র উইলিয়ামের মৃত্যু; মেরি তাঁর লেখা ছোট উপন্যাস 'মাটিল্ডা' সম্পূর্ণ করেন; মেরির পরবর্তী পুত্র সন্তান পার্সি ফ্লোরেন্সের জন্ম হয়।
১৮২০	হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড তড়িৎশক্তির সঙ্গে চৌম্বকশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন।

১৮২২	আকস্মিক গর্ভস্রাবের ফলে মেরির প্রায় মৃত্যুর উপক্রম হয়; পার্সি শেলি জলে ডুবে মারা যান তাঁর বয়স তিরিশ হবার একমাস আগেই।
১৮২৩	ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
১৮২৪	নিকোলাস লেনার্ডস ডি কার্ণো তাঁর আবিষ্কৃত 'কার্ণোচক্র'-এর ব্যাখ্যা দেন, যা থেকে তাপইঞ্জিনের প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়।
১৮২৭	জর্জ ওহম তড়িৎ বিদ্যায় রোধ সংক্রান্ত তাঁর সূত্র প্রণয়ন করেন।
১৮২৮	ফ্রিডরিখ ভোলার প্রথম কৃত্রিম ইউরিয়া তৈরি করেন গবেষণাগারে। এর ফলে শতাব্দী প্রাচীন 'প্রাণশক্তি মতবাদ' এর অবসান হয়ে জৈব রসায়ন শাস্ত্রের সূচনা হয়।
১৮৩০	নিকোলাই লোবাচেভস্কি অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূচনা করেন।
১৮৩১	মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ-চৌম্বকীয় আবেশের ব্যাখ্যা দেন; মেরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের এক সংশোধিত রূপ প্রকাশ করেন যে সংস্করণে এক নতুন উপক্রমণিকা ছিল যাতে মেরি এই উপন্যাস রচনার প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেন।
১৮৫১	তিপান্ন বছর বয়সে লন্ডনে মেরি শেলির মৃত্যু হয়।

লেখক পরিচিতি

ব্রায়ান মুনি (Brian Mooney): প্রচুর গল্প না লিখলেও শক্তিশালী লেখনীর জন্য বিশেষ করে হরর-ফ্যান্টাসি ধারায় তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গল্প 'দি আরবিয়ান বটল' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে লন্ডন মিস্ট্রি সিলেকশনে। তাঁর গল্প বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে 'দি ২১ প্যান বুক অব হরর স্টোরিস', 'ডার্ক ভয়েসেস ৫', 'দি অ্যান্থলজি অফ ফ্যান্টাসি অ্যান্ড দ্য সুপার- ন্যাচারাল', 'দ্য ম্যামথ বুক অব ওয়ারউলভস', 'শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ', 'ফ্যান্টাসি টেলস', 'ফাইনাল শ্যাডো', 'কাডার্থ', 'ডার্ক হরাইজন্স' এবং 'ফিয়েস্তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

র‍্যামসে ক্যাম্পবেল (Ramsey Campbell): ব্রিটিশ হরর লেখকদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। তিনি বিখ্যাত 'দি অ্যানুয়েল বেস্ট নিউ হরর' সিরিজের সহ-সম্পাদক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দ্য ডল হু এট হিজ মাদার', 'দ্য ফেস দ্যাট মাস্ট ডাই', 'দ্য প্যারাসাইট', 'দ্য নেমলেস', 'দ্য ক্লু', 'ইনকারনেট', 'অবসেশন', 'দ্য হাংরি মুন', 'দি ইনফ্লুয়েন্স', 'ইমেজেস', 'মিডনাইট সান', 'দি কাউন্ট অব ইলেভেন', 'দি লং লস্ট' এবং 'দি ওয়ান সেফ প্লেস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রোবার্তা ল্যানেস (Roberta Lannes): প্রায় ২০ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রোবার্তা ল্যানেসের লেখালিখির সূত্রপাত সত্তরের দশকের গোড়ায়। তাঁর প্রথম হরর গল্প 'গুডবাই ডার্ক লাভ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে 'কাটিং এজ' সংকলনে। তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'লর্ড জন টেন', 'ফ্যান্টাসি টেলস', 'স্প্ল্যাটারপাঙ্ক', 'স্প্ল্যাটারপাঙ্ক-২', 'এলিয়েন সেক্স', 'দ্য ব্র্যাডবেরি ক্রনিকেলস', 'স্টিল ডেড', 'ডার্ক ভয়েস ৫', 'ডেথপোর্ট', 'দ্য ম্যামথ বুক অব ওয়ারউলভস', 'বেস্ট নিউ হরর-৩' এবং 'দ্য ইয়ার্স বেস্ট ফ্যান্টাসি এন্ড হরর সেভেন্থ অ্যানুয়েল কালেকশন' প্রভৃতি বইতে।

ক্রিস্টি ফার্ন (Christy Fearn): লর্ড বায়রনের ছোটবেলার শহর সাউথওয়েলে বড়ো হয়ে ওঠা ক্রিস্টি ছোট থেকেই বায়রনের কবিতার অন্ধ ভক্ত। পরবর্তীকালে ক্ল্যারেন্ডন কলেজ এবং ইয়র্ক সেন্ট জন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য এবং নাটক নিয়ে পড়াশোনা। তিনি 'দ্য ওয়েদারকক' নাটকে

অভিনয় করেছিলেন যে নাটকে এককালে বায়রন নিজেই অভিনয় করতেন। বায়রন, শেলি এবং কোলরিজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিখ্যাত লোডহ্যাম বই উৎসবে প্রশংসিত হয়। পাশাপাশি তিনি বায়রন সোসাইটির আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'ফ্রেমড' এর এক চরিত্র বায়রন নিজেই, যিনি সেসময় স্থানীয় লাডাইট শ্রমিকদের সাহায্য করেন এবং হাউস অফ লর্ডসে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন রাজনৈতিক জীবনের সূচনায়।

সত্যজিৎ রায়: বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের জন্ম উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে ২ মে ১৯২১ সালে। সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়ের একমাত্র সন্তান। স্কুলের শিক্ষা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক (১৯৪০)। ওই বছরই শান্তিনিকেতন কলাভবনে ভরতি হন। কিন্তু '৪২-এ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসেন। চাকরিজীবনের শুরু (১৯৪৩) বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার-এ। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে জীবন শুরু করার আগে বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ এবং চিত্রাঙ্কনের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৫৫-তে তাঁর পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী' পায় অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। এর অনেক আগেই অবশ্য 'অ্যাবস্ট্রাকশন' নামে একটি ইংরেজি গল্প দিয়ে লেখার জগতে সত্যজিতের আত্মপ্রকাশ (১৯৪১)। পরবর্তীকালে 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ (১৯৬১) উপলক্ষ্যে বাংলা লেখালেখি শুরু করেন। প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রোফেসর শঙ্কু' (১৯৬৫)। বইটি ১৯৬৭-তে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য গ্রন্থরূপে অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করে। 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' (১৯৬৫) ফেলুদা সিরিজের সূচনা-গল্প। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃজনশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সত্যজিৎ বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতরত্ন, লিজিয়ন অফ অনার (ফ্রান্স), গোল্ডেন লায়ন (ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব) এবং 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর জন্য বিশেষ অস্কার। এছাড়া সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য আনন্দ, বিদ্যাসাগর সহ নানা পুরস্কারের স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিত্রনাট্য, সম্পাদিত, সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে সত্যজিতের বইয়ের সংখ্যা ষাটের বেশি। মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৯৯২।

রণেন ঘোষ: বাংলা সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগের অন্যতম নাম। লেখার পাশাপাশি সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন 'বিস্ময়!' এবং 'ফ্যানট্যাসটিক' এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে প্রতিশ্রুতি প্রকাশনের কর্ণধার।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়: আশ্চর্য! পত্রিকায় বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এঁর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রিমি বি চ্যাটার্জি: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা তিন। এ ছাড়াও অসংখ্য অনুবাদ এবং ছোট গল্প লিখেছেন। অ্যাকাডেমিক হিস্ট্রি নিয়ে লেখা 'এমপ্যায়ারস অব দ্য মাইন্ড' ২০০৭ সালে পায় শার্প ডিলং প্রাইজ। দুবার ভোদাফোন ক্রসওয়ার্ড বুক অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তাঁর গল্প এবং অনুবাদের জন্য।

অঙ্কিতা: বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম কারুশিল্পে, মূলত কাগজকারুশিল্পে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে। এসবের পাশাপাশি লেখালিখিও তাঁর একটা নেশা। নানান ওয়েব ম্যাগাজিন আর লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি গল্প সংকলনেও স্থান পেয়েছে তাঁর কয়েকটি লেখা।

সন্তু বাগ: স্নাতক স্তরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্নাতকোত্তরে পাওয়ার ইলেট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এখন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত। বিভিন্ন পুরানো ছোটদের পত্রিকা সংগ্রহে এবং কল্পবিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহী।

সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়: বিশ্বসাহিত্য, মার্গ সংগীত আর সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন অণুপত্রিকায় লেখালেখিতে হাত পাকানো। মূলত গদ্যসাহিত্যেই বেশি স্বচ্ছন্দ। প্রথাগত শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যায় (স্নাতকোত্তর) আর বর্তমানে সেই বিষয়েরই শিক্ষকতায় যুক্ত। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর সঙ্কটে এক কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সৎ-সাহিত্য।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়: কেমিস্ট্রিতে স্নাতক, সোশ্যাল সায়েন্স এবং

ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর। পেশায় চাকরিজীবী। কিন্তু নেশা গোগ্রাসে বই পড়া এবং লেখালেখি করা। ভালোবাসেন বিভিন্ন বিষয়ে আড্ডা দিতে, গান শুনতে, গান গাইতে। এবং হ্যাঁ, মনের মতো শ্রোতা পেলে গল্প পড়ে শোনাতে। ঘনিষ্ঠমহলে 'খুড়ো' নামে পরিচিত। কালে দিনে 'তারিণী' হয়ে উঠবেন, এই আশা রাখেন!

দীপ ঘোষ: কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর এবং বর্তমানে গবেষণায় রত। ভালোবাসেন দেশ ঘুরতে ও বই পড়তে। কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রেম ছোটবেলা থেকেই। বিশ্বাস রাখেন যে, কল্পবিজ্ঞান আর কমিক্সের মতো বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত ধারাগুলি একদিন নিশ্চয় যোগ্য সম্মান পাবে।

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত: জন্ম ও পড়াশোনা কলকাতায়। কাজ করেন বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। কোনওমতে অফিসটুকু সেরেই বাড়ি ফিরে গল্পের বই নিয়ে বসে পড়েন। কল্পবিজ্ঞানে বিশেষ উৎসাহী। ভালোবাসেন ট্রেকিং করতে আর গিটার বাজাতে।

বিশ্বদীপ দে: পেশায় সাংবাদিক। নেশায় গদ্যকার। এ যাবৎ ছোটগল্পের দু'টি সংকলন প্রকাশিত। কল্পবিজ্ঞান ও হরর সাহিত্যের প্রতি বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। ভালোবাসেন সমুদ্রে যেতে, কাছের মানুষদের সঙ্গে পুরানো দিনের গল্প করতে।

দেবজ্যোতি গুহ: পেশায় আইটি কর্মী, নেশা পপ-কালচার চর্চা। পচ্ছন্দের বিষয় সিনেমার আদি যুগ, কমিক্স-কার্টুন চর্চা, বিজ্ঞাপন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সত্যজিৎ রায় এবং কল্পবিজ্ঞান পড়া। ভালোবাসেন পুরানো বই-পত্রিকা ঘাঁটতে। যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন 'সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম খণ্ড'।

সুদীপ দেব: রসায়নের ছাত্র। পরে সাহিত্যে স্নাতক। বর্তমানে বেসরকারী সংস্থায় পলিমার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কর্মরত। অল্পস্বল্প লেখালেখি করলেও নিজেকে পাঠক হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেন। বই ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর একান্ত সঙ্গী।

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়: বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একজন গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখা ছোটগল্প, অণুগল্প, ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতা একাধিক সংবাদপত্র ও অণুপত্রিকায় বেরিয়েছে। বেতার-নাটক কলকাতার এফ. এম. চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে।

প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের নাম বি-৩৪৫৬। নিজের একাকিত্ব থেকে বাঁচতে তিনি সাহিত্যচর্চা করে থাকেন। চাকরিসূত্রে তিনি ব্যাঙ্গালোরের একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত।

প্রতিম দাস: মূলত চিত্র শিল্পী, ২০১৩ সাল থেকে ভারতের সমস্ত পাখি আঁকার লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছেন। ৭৭৫+ প্রজাতির ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে শুধু পাখি নয় অন্যান্য বিষয়েও ছবি আঁকা চলে একইসঙ্গে। সঙ্গেই দারুণ রকমের পাঠক, যা পান তাই পড়েন ধরনের। প্রিয় বিষয় রূপকথা, ফ্যান্টাসী, সায়েন্স ফিকশন, অলৌকিক। টুকটাক গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে আছে অনুবাদের শখ।

কল্পবিশ্ব আন্তর্জাল পত্রিকা



আপনি কি কল্পবিজ্ঞান গল্প পছন্দ করেন?
বাংলা কল্পবিজ্ঞানে অনেকদিন নতুন ধরনের গল্প পাচ্ছেন না?
তাহলে বলব, আপনি ‘কল্পবিশ্ব’ পড়েননি।
এই মুহূর্তে ভূ-ভারতে বিশুদ্ধভাবে কল্পবিজ্ঞান-ফ্যান্টাসি-হরর ধারায় আমরাই একমাত্র ইন্টারনেট পত্রিকা। নবীন-প্রবীণদের নতুন সব লেখা তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনন্য মণিমুক্তো, জমাটি অনুবাদের রূপে। রয়েছে ক্লাসিক রচনার পুনঃপ্রকাশ, সাবলীল গদ্যে লেখা অসামান্য, মননশীল নানা বিষয়ের ভাবনা উদ্রেককারী প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্যের এই ধারায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অসাধারণ সাক্ষাৎকার।
এ ছাড়াও অনেক কিছু...
একবার ক্লিক করেই দেখুন না! কল্পনার স্পেসশিপে ভেসে চলবে নক্ষত্রের রূপোলি আলোর ভেতর...

আন্তর্জাল ঠিকানা: http://kalpabiswa.com
ই-মেইল: kalpabiswa.kalpabignan@gmail.com



QR code স্ক্যান করুন

Notes

[←1]

[←2]

[←3]

[←4]

[←5]